সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

বাঙ্গলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ২৪ জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ ও অবহট্টে রচিত 'ডাকার্ণব', নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি অমূল্য প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ॥

মূল্য : ত্রিশ টাকা

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

দশম সংস্করণ

বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত

মূল্য : ত্রিশ টাকা

রামেন্দ্র রচনাবলী

[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র রচনার প্রামাণ্য সংকলন]

৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ

মোট মূল্য : একশত কুড়ি টাকা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

॥ সূচীপত্র ॥

সুসম্পাদিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

সম্পাদিত

রামমোহন গ্রন্থাবলী

[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী

[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ২২·০০

সম্পূর্ণ মধুসূদন গ্রন্থাবলী

[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৪০·০০

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী

[দুই খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৬৫·০০

রামেন্দ্র রচনাবলী

ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত

[সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় নূতন সংযোজন : সম্প্রতি প্রকাশিত শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোঃ শহীদুল্লাহ, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার

সমাজ স্থিতিশীল নহে। যুগে যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, দেশীয় ও আন্তর্দেশিক ঘটনার প্রভাবে ও অন্যান্য কারণে সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমে ধীরে ধীরে, সকলের অলক্ষ্যে, কিন্তু আলোচনার কালবৃদ্ধি করিলে পরিবর্তনের প্রভাব সহজেই প্রতিভাত হয়। তাই সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা কখনই অল্পসময়ের মধ্যে static বা নিশ্চল হওয়া উচিত নয়, হওয়া উচিত diachronic বা দীর্ঘকালব্যাপী, গতিশীল। এই সাধারণ অনুশাসনটি স্মরণ রাখিয়া আমি সংক্ষেপে 'মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু- মুসলমান সম্পর্ক' এই স্বল্পালোকিত ও বিতর্কমূলক বিষয়টির উপর সামান্য আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিব। এই প্রবন্ধে আধুনিক খণ্ডিত বাংলাকে নির্দেশ করা হয় নাই, করা হইয়াছে বঙ্গভাষা-ভাষী ভৌগোলিক বঙ্গদেশকেই।

কাল-নিরূপণ

এ কথা বলা বাহুল্য যে সামাজিক ইতিহাসে কোন নিশ্চিত তিথিক্রম ধার্য করা যায় না। তবে সুবিধার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে নদীয়ায় মুসলিম বিজয় হইতে পলাশীতে ইংরাজ বিজয় বা লক্ষণসেনের পরাজয় হইতে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আনুমানিক ৫৫০ বৎসর কালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচনা করিব। কিন্তু যেহেতু যুগান্তর ঘটিলেও সামাজিক বিবর্তনের গতি একেবারে রুদ্ধ হয় না সেজন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগকেও আমাদের আলোচনার পরিধির মধ্যে আনিতে হইবে।

সামাজিক ইতিহাস-চেতনার অভাব

আমাদের দেশে রাষ্ট্র সমাজ-ভিত্তিক কিন্তু সামাজিক ইতিহাস ধারণার (concept) উন্মেষ ঘটিয়াছে রাজনৈতিক ইতিহাসচিন্তার পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে। ইহা কঠিনতর বিষয়ও বটে। তাই দেখি রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে সামাজিক ইতিহাসের বহু পূর্বেই। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সুলতান, সম্রাট, উজীর ওমরাহদের বিজয়কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজনৈতিক ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে "...ইংরাজ রচিত বা ইংরাজলিখিত ইতিহাস বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর যথার্থ ইতিহাস নহে"... তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিব। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করি।"[১] তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি ইতিহাসকে জনপ্রিয় করিবার এক বিরাট

প্রচেষ্টা। কিন্তু ইতিহাস রচনা সহজ নহে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীও ব্রিটিশদের পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসের অভাব

মধ্যযুগে বাংলার কোন প্রামাণ্য ধারাবাহিক সমসাময়িক ইতিহাস ছিল না,—না রাজনৈতিক, না সামাজিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তৎকালীন দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বাংলার উল্লেখ ছিটেফোঁটা হিসাবে পাওয়া যায়। শুধু জাহাঙ্গীরের সময়ে মীর্জা নাথান নামে এক আমীর আত্মকথায় **'বাহারিস্তান ই গৈবী'**তে বাংলা, কামরূপ ও আসামে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের আলোচনা করিবার সময় স্থানীয় ইতিহাসের উল্লেখ করেন। স্যার যদুনাথ ইহাকে "ঐতিহাসিক অজ্ঞতার মরুভূমিতে মরুদ্বীপের" সহিত তুলনা করিয়াছেন।[২] পরবর্তী মুঘল যুগে রচিত বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের মধ্যে বাংলার উল্লেখ আমরা অল্পস্বল্প পাই। মাত্র তিনজন বিদেশী পর্যটক ইবন বতুতা ও আবদুল লতিফ (১৬০৮) ও মুল্লাতাকিয়া বাংলার নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন। সামাজিক ইতিহাসের ধারণার উন্মেষও তৎকালীন সরকারী ও বেসরকারী ঐতিহাসিকদের মধ্যে হয় নাই।[৩] ইংরাজ অধিকার স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ইংরাজ প্রশাসকগণ এ দেশ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আহরণের চেষ্টা করেন। কেননা দেশশাসনের জন্য তাহার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অবস্থা ও জনমানস প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব অবহিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।[৪] তারপর দুই শত বৎসরেরও অধিককাল গত হইয়াছে। দেশে যুগান্তর সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসে সংজ্ঞারও পরিবর্তন হইয়াছে। সলীমুল্লার 'তারিখ ই বাঙ্গালা' (১৭৬৪), গোলাম হুসেন সালিমের 'রিয়াজ উস্ সালাতিন' ও ষ্টুয়ার্টের History of Bengal হইতে আরম্ভ করিয়া স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal vol. 2 (১৯৪৮), ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৯৬২) ও শ্রীমতী সুশীলা মণ্ডল প্রণীত **বঙ্গদেশের ইতিহাস** মধ্যযুগ প্রথম পর্ব (১৯৬৩) পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিহাস। সুতরাং বর্তমানেও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

বর্তমানযুগে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে সকল মনীষী বিভিন্ন, বিক্ষিপ্ত পুস্তকে বা রচনায় নিজেদের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন বা এখনও যাঁহারা সেখানে অক্লান্ত সাধনানিরত তাঁহাদের নিকট আমি একান্তভাবে ঋণী।

মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত অর্থাৎ পাল ও সেন যুগ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠভূমিকা প্রয়াত মনীষী রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত History of Bengal vol. 1 (1943) ও বাংলা ভাষায় রচিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (১৯৪৬) এ আলোচিত হইয়াছে। তবে বর্তমান যুগে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রথম ও দৃঢ় পদক্ষেপ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' আদিপর্ব (১৩৫৭/১৯৫০)। কারণ ইহা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বাঙ্গালীর সমাজ ও সমাজ-ভিত্তিক রাষ্ট্রের রূপ ও রেখা চিত্র।[৫] শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা' (১১০০-১৯০০ খ্রী) একটি সহজ ও চিত্তাকর্ষক, সাধারণের উপযোগী পুস্তক। আজ পর্যন্ত

সম্ভবতঃ আবদুল করিমের বইখানি (যাহা আকবর-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সীমিত) ব্যতীত মধ্য-যুগীয় বাংলার কোন প্রামাণ্য সামাজিক ইতিহাস রচিত হয় নাই। লেখা সহজ-সাধ্যও নহে। বাংলার কোন কলহনও নাই, ইবন খলদুনও নাই। মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা আহরিত উপাদানের ভিত্তিতে রচিত আমার এই প্রচেষ্টাও, ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া উঠে নাই বলিয়া, সম্পূর্ণ হ, বড় জোর ভূমিকা মাত্র, এক দৃষ্টিভঙ্গীর উত্থাপন মাত্র।

সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

এইবার মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান অনেকাংশে একই ধাঁচের। অনুরূপ আকর উপাদানগুলি এই প্রকারের—(১) সংস্কৃত, ফরাসী, আরবী, বাংলা, কোচ, অসমীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ (chronicles)। তবে ইহাদের মধ্যে সামাজিক তথ্য অত্যন্ত কম ও তাহা উদ্ধার করা বহু পরিশ্রমসাধ্য। (২) সাধারণ ইতিহাস ও বিশ্বকোষ জাতীয় রচনায় উল্লেখ, যথা পারস্য ভাষায় লিখিত 'সুর ই সাদিক' ও 'রৌজৎ উল' তাহিরিণ'। (৩) বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সরকারী আদেশপত্র ও পত্রগুচ্ছ। (৪ মুসলমান, বৌদ্ধ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণী। (৫) প্রত্নতাত্ত্বিক (Archaeological) উপাদান। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের জন্য একান্ত প্রয়োজন মন্দির, মসজিদ, কবর ও দরগা গুলির ইতিহাস, রূপ ও রেখা বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ। মুসলিম অধিকার ও বিস্তারের বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ ইহাদের মধ্যে নিহিত। আবার মন্দির, বিগ্রহ, মসজিদ, কবর ও দরগায় উৎকীর্ণ অভিলেখ (inscriptions)গুলিও সামাজিক ইতিহাস বুঝিতে সাহায্য করে। তদ্ব্যতীত আছে মুদ্রা (coins) ও তাহার উপর উৎকীর্ণ লিপি।* (৬) সাহিত্য রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মুখ্য উপাদান কিন্তু সামাজিক ইতিহাস রচনায় ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রকৃত সামাজিক চিত্রের হদিস পাইতে হইলে ঐতিহাসিকের পক্ষে ঐতিহাসিক কাহিনীর ধূলি-ধূসর প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যের সিন্ধুনীরে অবগাহন এমন কি নিমজ্জনও অত্যাবশ্যক। আর এই সাহিত্য শুধু কাব্যসম্বলিত লোকায়তিক (secular) সাহিত্য নয়, ইহা ধর্ম-বিষয়ক সাহিত্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম, সুফীবাদ, সুফী-যোগ-নাথপন্থ, বৈষ্ণব ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মসাহিত্য ব্যতীত বহু দেব দেবীর ও মুসলমান পীর ও গাজীর কীর্তি কাহিনী সমন্বিত মঙ্গলকাব্যও (মনসা, চণ্ডী, গঙ্গা, ধর্ম, রায়, গাজী ইত্যাদি) সামাজিক ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান। আবার হিন্দুদের রচনা ছাড়াও ইসলামী বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবির রচনা সামাজিক বিবর্তনের এক নতুন দ্বার উদ্ঘাটন করে। এই যুগের পুঁথিপত্র, কেচ্ছাকাহিনী ও পাঁচালী দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আদানপ্রদানের সাক্ষ্য বহন করে; যদিও ইহা স্বীকার্য যে ইহারা অধিকাংশেই উপকথাপূর্ণ ও ইহাতে রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ আছে। দুঃখের বিষয় ইহা এখনও সম্পূর্ণ অধীত হয় নাই। (৭) কিংবদন্তী (Traditions), লোকসাহিত্য (folk-ore) ইত্যাদি রাজনৈতিক ইতিহাসে সাধারণভাবে বর্জনীয় হইলেও সামাজিক ইতিহাসে প্রচুর উপকরণ সরবরাহ করে। (৮) সামাজিক বিকাশ সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে স্থানীয় বিবরণ (Topographical) সংগ্রহ করাও বিশেষ আবশ্যক। গ্রাম্য পীঠস্থান বা সাধু-

সন্ত-পীর অধ্যুষিত স্থানগুলির পিছনে বাংলার ধর্মীয় তথা সামাজিক ইতিহাস বহুলাংশে প্রচ্ছন্ন আছে। এই গুলির উদ্ধার প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক গোষ্ঠী

সম্যক্ উপকরণ ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাবে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নাই। সুতরাং ইহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে, বিশেষতঃহিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ ও মত বিরোধ আছে। মতানুসারে তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) হিন্দু-গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে মুসলমান শাসনের ইতিহাস পুরোপুরি, অর্থাৎ মুসলিম বিজয় হইতে অধিকার বিলোপ পর্যন্ত অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, রক্তপাত ও আতঙ্কের ইতিহাস। (২) ইসলামীগোষ্ঠীর লেখকরা ইসলামী শাসনপ্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন কিন্তু তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দু-মুসলমান কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিলনার্থ পরস্পরের নিকটে আসিয়াছিল বটে কিন্তু মিলন অসম্ভব। (৩) জাতীয়তাবাদী (Nationalist) ঐতিহাসিকগণের মতে এই দুই সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে শুধু এক সাধারণ কৃষ্টির নয় এক মিলিত জাতিরও উদ্ভব হইয়াছিল।'

উপরোক্ত অভিমতগুলি আংশিক সত্য। প্রথমতঃ মুসলমান বিজয়ের প্রথমযুগের ইতিহাসে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, লুঠ, হত্যা, রক্তপাত অবশ্যই ছিল। সুতরাং বিজিতগণের মধ্যেও সঙ্গত কারণেই নৈষ্ঠিকতার প্রসার ও ঘোর আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক সেজন্য ধরিয়া লইয়াছেন যে সমগ্র মধ্যযুগেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস এই প্রাথমিক অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি ও রক্তপাতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক কারণ বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দিয়া ব্যবধান প্রসারিত করিতে আগ্রহী হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য-বোধ এত প্রবল ছিল যে সিদ্ধান্ত হিসাবে ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য সম্ভব ছিল না। তথাপি দীর্ঘদিন ধরিয়া একত্রে বাসের ফলে বাস্তব জীবনে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে এক আশ্চর্যজনক সম্মিলিত কৃষ্টির উদ্ভব ও আদানপ্রদান সহজ হইয়া আসিতেছিল। 'রাজা কালস্য কারণম্'। সুতরাং রাজনীতির উপরই এই সামাজিক ধারার গতি নির্ভর করিত। কখনও কখনও গতি স্বচ্ছন্দ ছিল, আবার কখনও কখনও ইহা অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহার কেবল একটা দিকের উপরই আলোকপাত হয়। কিন্তু তাহার অন্তরালে, রাজদরবারের বহির্জগতে জনসাধারণের মধ্যে যে মিলন প্রচেষ্টা প্রতিকূল রাজনীতি সত্ত্বেও অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারার মত প্রবাহিত হইত তাহার আভাস শুধুমাত্র সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সাক্ষ্য যথোপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করেন নাই তাঁহার বিচারও পক্ষপাতিত্বদুষ্ট হইতে বাধ্য। আকবরের সময় রাজানুগ্রহের অনুকূল আবহাওয়ায় পুষ্ট এই প্রচেষ্টায় যে সুফল ও ঔরঙ্গজেবের সময়ে প্রতিকূল অবস্থায় যে কুফল হইয়াছিল, তাহা সকলেরই নিকট সুবিদিত। সংঘর্ষ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধর্মান্তরীকরণ ও অত্যাচার সত্ত্বেও যে সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে, কলায় কৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। রাজ-

নীতিতে সম্মিলিত জাতির উদ্ভবের প্রচেষ্টাও হইয়াছিল কিন্তু পরিণতির পথে বহু প্রতিবন্ধক আসে। তথাপি দুই সম্প্রদায় ক্রমশঃ যে ঘনিষ্ঠতর হইতেছিল তাহার উল্লেখ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। পরে অন্যান্য কারণে এই সাম্প্রদায়িক মিশ্রণের বিরুদ্ধে বহুবিধ প্রতিবন্ধক শক্তিশালী হইয়া উঠে।

বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব ঐতিহাসিকের কর্তব্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক, উৎকট, উদ্ধত দেশপ্রেম বা জাত্যাভিমানের চিন্তা দ্বারা ব্যাহত না হওয়া। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার যদুনাথ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ভারতের জাতীয় ইতিহাস রচনা পদ্ধতির জন্য এই প্রকার বিচারধারার কথা বলেন। ৺রমেশচন্দ্র মজুমদারও যদুনাথের সত্যনিষ্ঠাকে আদর্শ হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সব প্রখ্যাত লেখকগণই সত্যসন্ধিৎসু। কিন্তু দেখা যায় যে একই উপাদান ব্যবহার করিয়াও তাঁহারা ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। (১) সমসাময়িক ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসগুলির স্বরূপ। ইহাদের রচয়িতারা হয় রাজাদের বা মন্ত্রীদের বা আমীরদের আদেশে লিখিতেন বা তাঁহাদের গুণকীর্তন করিতেন, নয় গর্ব ও সংস্কার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইসলাম ধর্ম ও শরিয়ৎ এর গরিমা প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। শত্রু হত্যা ও নিপীড়নের চিত্র যে অনুপাতে ভীষণ ও লোমহর্ষক হইবে, সেই অনুপাতেই বিজিত কাফেরদের দৈন্য, হীনতা, যন্ত্রনা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও বিজয়ী মুসলমানগণের গৌরব ও ইসলামের জয় বৃদ্ধি পাইবে। সত্যসন্ধ ও যথার্থ ইতিহাস লিখিতে হইলে বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিককে এই প্রকার সমসাময়িক 'তারিখে' ও তন্নিহিত তথ্যের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। কিন্তু তবুও সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য বা সত্যনিষ্ঠ নাও হইতে পারে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে তীক্ষ্ণ সমালোচক হইতে হইবে। ঐ প্রকার প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিশ্লেষণ না করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিলে সেই সিদ্ধান্তও হইবে ভ্রান্ত। সমসাময়িক সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত তথ্যে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র পাওয়া যায়। (২) ঐতিহাসিক বাস্তববাদী হইবেন বলা খুবই সহজ কিন্তু কার্যতঃ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাঁহার মনস্তত্ত্ব,—তিনি হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন,—তথ্য বাছাই করার রীতি বা পূর্ব-কল্পিত মতের প্রতি আনুগত্য, সবই তাঁহার মানসিক সংযমকে প্রভাবিত করে।[৮]

যুগান্তকারী তুর্কী-বিজয়

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমেই তুর্কী-বিজয় বাংলার ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়া দেয়, শুধু রাজনৈতিক জীবনেই নহে, সামাজিক জীবনেও।[৯] বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দুই ধারা গুপ্তযুগ হইতে বাংলায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে তাহাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে তাহা প্রশমিত হয় পালযুগে। বৌদ্ধ পাল রাজন্যবর্গের চারিশত বৎসরব্যাপী যুগ ছিল বাংলার সামাজিক জীবনে এক অপূর্ব মহিমাময় সমন্বয়ের যুগ। বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর ও মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে। সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু দাক্ষিণ ভারত হইতে আগত রক্ষণশীল ও পরিবর্তন-বিমুখ সেন ও বর্মণ বংশীয় নৃপতিবর্গ ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষার সংকল্পে তাহারই পোষকতা করেন। সামাজিক জীবনে এইরূপে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্রের যে অভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই ছিল তুর্কী-

বিজয়ের অন্যতম কারণ। তুর্কী বিজয়ীরা প্রথমে বৌদ্ধ বিহার ও ব্রাহ্মণ্যমন্দিরগুলি ধ্বংস করে দুই উদ্দেশ্য লইয়া। প্রথম, আর্থিক অর্থাৎ ইহাতে রক্ষিত ধনসম্পদ লুটপাঠ; দ্বিতীয় মনস্তাত্ত্বিক অর্থাৎ জাতির মর্মস্থান দেবদেউলগুলি ধ্বংস করিয়া জনসাধারণের মনে ত্রাস সৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে বিহ্বল ও নিশ্চেষ্ট করা। বহু বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রত্যন্ত রাজ্যে,—নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা, কামরূপ ও ঝাড়িখণ্ডে—পলাইয়া গেলেন। অনেকে যত্রতত্র লুকাইয়া প্রাণ, জাতি ও ধর্ম রক্ষা করিলেন। বাকী সবাই সবই বিসর্জন দিলেন। ইহার ইঙ্গিতই বহন করিতেছে 'ধর্ম-কথার' 'ঘর ভাঙ্গার' ছড়া—

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন,
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়,
হাতে পুথি কর‍্যা কত দেয়াসি পলায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল,
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল-দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই,
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।[১০]

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধানের কারণ

ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে মুসলিম আক্রমণ প্রাচীন ভারতের সমস্ত বিদেশী আক্রমণ যথা পারসিক, গ্রীক, শক-পহ্লব, হূণ হইতে পৃথক। পূর্বে বিদেশীরা ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়া ভারতীয় জনসমুদ্রে বিলীন হইয়া যান। কিন্তু মুসলমানগণ ভারতীয়দের সহিত পরিপূর্ণভাবে মিশিয়া যান নাই। হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে কেন এই ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল ?

একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ও প্রথম ভারত-বিদ্যা-বিশারদ (Indologist) অল বিরুণী হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে দুস্তর পারাবার শুধু লক্ষ্যই করেন নাই, এই ব্যবধানের কারণও বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "The Hindus entirely differ from us in every respect." অর্থাৎ "হিন্দুরা সর্বাংশে আমাদের থেকে বিসদৃশ।" ভাষাগত পার্থক্যের উল্লেখ করার পর তিনি ধর্মীয় বৈলক্ষণ্য ও শিষ্টাচার ও রীতিনীতিতে অনৈক্যের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের সাধারণ মনোভাব সংক্ষেপে বলিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহাদের অন্ধ গোঁড়ামি এত প্রবল যে সকল বিদেশীরাই ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র এবং তাহাদের সহিত বিবাহ বা অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ যেমন একত্রে উপবেশন, পানভোজন ইত্যাদি নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে তাহারা কলুষিত হইয়া যাইবে। ইহাই তাহাদের সহিত কোন সংযোগ রাখিতে দেয় না ও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকতম ব্যবধান।[১১] ফলতঃ অল বিরুণীর মতে এই প্রতিবন্ধকের কারণ ভাষাগত ও জাতিগত ব্যবধান, বিজেতাদিগের প্রতিমা-ভঙ্গের উন্মাদনা ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় কুসংস্কার, দর্প ও আত্মশ্লাঘা জনিত স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি। অল বিরুণী মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ত' বটেই, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিরও সমভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনা ও বিশ্লেষণ দুইই সত্য। কারণ তিনি একজন সমদর্শী সাক্ষী এবং

তাঁহার আপন পৃষ্ঠপোষকেরই তিক্ত সমালোচক ; তা ছাড়া হিন্দুদের প্রতিও তিনি প্রকৃত সহানুভূতিশীল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাংলা সাহিত্যে পূর্বভারতে হিন্দুমুসলমান সম্বন্ধের এই প্রকার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'র বর্ণনা হইতে কিছু অনুমেয়। ইহা বাস্তবানুগ।

হিন্দু তুরুকে মিলল বাস, / একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ বাঙ্গ কতহুঁ বেদ, / কতহুঁ মিলিমিস কতহুঁ ছেদ।
কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা, / কতহুঁ নকত কতহুঁ রোজা।
কতহুঁ তম্বারু কতহুঁ কুজা, / কতহুঁ নীমাজ কতহুঁ পুজা।
কতহুঁ তুরক বর কর, / বাট জাইতে' বেগার ধর।
ধরি আনএ বাভন বড়ুআ, / মথা চড়াব এ গাইক চুড়ুয়া।
ফোট চাট জনউ তোড়, / উপর চড়াব এ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ, / দেউল ভাগি মসীদ বাঁধ।
গোরি-গোমঠ পুরিল মহী, / পঞরহু দেবাক ঠাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরে হি নিকার, / ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।[১১]

পার্থক্যের কারণের তীক্ষ্ণতায় পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা ?

অল বিরুণীর একাদশ শতাব্দীর বিশ্লেষণ নির্ব্যক্তিক ও বাস্তবানুগ। বিদ্যাপতির পঞ্চদশ শতকের চিত্রও কি ঠিক তাই ? কিন্তু প্রশ্ন মনে জাগে যে এই পার্থক্যের কারণে কি পরবর্তীকালে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই ? অথবা কারণের তীক্ষ্নতা হ্রাস পায় নাই ? কেহ কেহ বলেন, 'না', অন্যেরা বলেন 'হাঁ'। তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার্য যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বাস্তব কি সিদ্ধান্তের অনুরূপ ছিল ? এই প্রশ্নের সমাধানে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমে তুর্ক-আফগান যুগে, পরে মুগল যুগে।

(১) বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মপ্রচার ও হিন্দুধর্মের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া ;
(২) মুসলমান আমলে হিন্দুগণের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদা ;
(৩) হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য ;
(৪) রাজনৈতিক সম্বন্ধ ;
(৫) অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচারের মাত্রা ও গুরুত্ব।

(১) ইসলাম ধর্ম প্রচার ও তাহার প্রতিক্রিয়া

সমাজ সংগঠনের সহিত ধর্মীয় অবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই বাংলায় মুসলিম বিজয়, অধিকার স্থাপন ও বিস্তার এবং ইসলামের প্রচার সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। কারণ এই বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সংযুক্ত। বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান সমূহের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে মধ্য-যুগের বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই।

ইসলাম ধর্ম পরধর্মাবলম্বীদের দীক্ষাগ্রহী কিন্তু এ সম্বন্ধে কোরাণের পরিষ্কার

নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে—La ikraha fiddin, ধর্মে কোন জবরদস্তি চলিবে না। কিন্তু বাস্তবে বলপ্রয়োগও করা হইত।

বাংলায় ইসলামধর্ম প্রধানতঃ দুই উপায়ে প্রবর্তিত হয়,—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।[১৩] তবে উপায় ও হেতুগুলি অনেক সময়ে একত্রিত হইয়া থাকিত। প্রত্যক্ষ উপায়ের মধ্যে চারিটি ধারা উল্লেখনীয়। (ক) সামরিক অর্থাৎ বলপূর্বক ধর্মান্তরণ; (খ) স্বেচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ; (গ) ধর্মীয় অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে পীর, ফকির বা কাজী ইত্যাদি দ্বারা ধর্মান্তর গ্রহণে আগ্রহী করা; (ঘ) বহিরাগত উপনিবেশিক অভিবাসন ও মুসলমান জন-সংখ্যা বৃদ্ধি। পরোক্ষ উপায়েও ইসলাম প্রচারিত হইত—মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপনে, ও পীর ফকীরদের জনহিতকর বা অলৌকিক কার্যাবলীতে।

(ক) বলপূর্বক ধর্মান্তরণ[১৪]—প্রচলিত বিশ্বাস এই যে বিজেতা এক হস্তে তরবারিও অন্য হস্তে কোরাণ লইয়া ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটাইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। বাংলায় মুসলিমগণ ছিলেন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, হিন্দুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। কেবল তরবারি দ্বারা হিন্দুদের ধর্মান্তরণ সহজ ছিল না। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে মুসলমান শাসন স্থাপিত হইবার পরবর্তীযুগেই বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম-প্রসারে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সন্দেহ নাই অনেক ক্ষেত্রেই বলপূর্বক ধর্মান্তরণ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই,—রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধার্মিক কারণে,—বঙ্গদেশে ইসলামের প্রসার সম্ভব হইয়াছিল। ইহাতে ও মুসলমান সমাজের বিকাশে শাসকবর্গ, অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (খ) স্বেচ্ছা-পূর্বক—ধর্মান্তর—ধর্মান্তরণ ছিল ইসলাম প্রচারের এক প্রত্যক্ষ ও প্রশস্ত পন্থা। ঐতি-হাসিক গ্রন্থ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমাজের বিভিন্নস্তরের ব্যক্তিরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেও প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাই ধর্মান্তরিত হ'ন। আর নিম্নবর্গের হিন্দুগণ কর্তৃক ব্যাপকহারে ইসলামধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ইহার প্রসারের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। নানাবিধ সামাজিক কারণেই এই সামূহিক ধর্মান্তর-করণ সম্ভব হইয়াছিল। পূর্বভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোন দিনই সকল স্তরের উপর সমান দৃঢ়ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ন্যায় সেখানে হিন্দুধর্ম সুসংঘটিত ও সংবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা পরিপূর্ণরূপে হিন্দু-ধর্মানুগ ছিল না। বরং মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে উহারা ভ্রষ্টাচারে পূর্ণ বৌদ্ধধর্মের এক বিকৃতরূপের অনুগামী ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সর্বজনবিদিত। পালযুগের বৌদ্ধরা সেন-আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে নিগৃহীত হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম হয় স্তিমিত। সমাজে তন্ত্রমতের প্রসার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও হইল। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মাত্রই রাজানুগ্রহলাভ হইতে বঞ্চিত হইল। পালযুগে সমাজের কোন শ্রেণীই—বণিক, শিল্পী, কৃষক, চণ্ডাল, কেহই অবজ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু এখন কৃষক-কুল ও তথাকথিত নিম্নস্তরীয় জনসাধারণ অবহেলিত হইল। তারানাথের বিবরণী হইতে ইহা অনুমেয় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ব্রাহ্মণশাসকদের প্রতি সহজাত ক্রোধপরায়ণ হইয়া মহম্মদ ইখ্তিয়ারউদ্দীন ইবন্ বখ্তিয়ার খলজীর গুপ্তচরের কার্য করিয়াছিলেন। 'সেকশুভোদয়া'য় কিছু মাত্র সত্য নিহিত থাকিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে তুর্কী বিজয়ের পূর্বেই লক্ষণ সেনের দরবারে এক ইসলামী প্রচারক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজয়ীদের পথ পরিষ্কার করিয়া

যে শুধু বহির্বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন তাহাই নহে, শিক্ষা ও ধর্মচর্চায় কতকগুলি নতুন কেন্দ্রও স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষা, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে ধীরে ধীরে যে শহরগুলি গড়িয়া উঠে যেমন বিহার শরীফ, সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও শ্রীহট্ট সেগুলি সাধুসন্তদের আবাসস্থলে পরিণত হয়।

বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের স্বর্ণযুগ হিসাবে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতককে চিহ্নিত করা যায়। সুফীসন্তগণের দ্বারাই এই প্রচার কার্য সম্পন্ন হইত। বস্তুতঃ মধ্যযুগের প্রথম পর্বে বঙ্গদেশ সুফী সম্প্রদায়ের এক শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইঁহাদের কেহ কেহ বহিরাগত, কেহ কেহ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইঁহাদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র খানকাগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষাদান ও সুগঠিত প্রচারকার্যের মাধ্যমে এই সন্তগণ জনসাধারণ, শাসকশ্রেণী, এমন কি সম্পূর্ণ সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। বঙ্গদেশের ধর্মীয় চিন্তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে ও বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইঁহাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সুফীগণ বহু দরগা ও তাকিয়া (আশ্রম) নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ইঁহাদের শিষ্যবর্গও এই কার্য সাধন করেন। বাংলার দুই প্রখ্যাত সুফী আলাওল হক্ ও তাঁহার পুত্র নূর কুতুব আলমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত পাণ্ডুয়াস্থিত দরগাই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক হিসাবে শেখ জালালুদ্দীন তব্রেজীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১২৪৪ খৃ. তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত তিনি নিয়মিত ধর্মান্তরকরণের কার্য চালাইয়া যান। জনশ্রুতি এই যে কোন কোন সুফী সন্ত,—যথা শ্রীহট্ট অঞ্চলের মুখ্য প্রচারক শাহ জালাল,—প্রয়োজনবোধে বিজয় অভিযানও সংগঠন করেন।[১১]

ইহা ব্যতীত আরও অনেক অত্যুৎসাহী মুসলমানও ছিলেন। সকলেই নানারূপে ইসলাম প্রচার করিতেন। কোরাণ অনুসারে আল্লার বাণী বিশ্বে প্রচার করাই প্রত্যেক বিশ্বাসীর পুণ্যকর্ম। সকলেই হিন্দুদের রক্ষণশীল ও অস্পৃশ্যতা-দুষ্ট সমাজ ব্যবস্থাকে তাঁহাদের স্বার্থ সাধনের উপায়রূপে ব্যবহারের চেষ্টা করিতেন। এই ভাবে ধর্মান্তরণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(ঘ) বহিরাগত ঔপনিবেশিক অভিবাসন

কিন্তু ধর্মান্তরণই বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ বলা যায় না। বহুসংখ্যক বিদেশী মুসলমানদের অভিবাসনও (immigration) যে ইহার অন্যতম প্রধান কারণ তাহা বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বিদেশী মুসলমান, আরব, ফার্সী, তুর্ক, মোগল,—বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বহিরাগতদের আগমন সামাজিক পরিবর্তনও সূচিত করে। তাহারা অনেকেই হিন্দুনারী বিবাহ করে এবং এই মিশ্র বিবাহের ফলস্বরূপ সন্তানসন্ততি (অর্থাৎ মিশ্র মুসলিম, যাহাদের পিতা মুসলিম মাতা হিন্দু) বৃদ্ধিলাভ করে। এই ভাবে বাংলায় চারি শ্রেণীর মুসলমানের উদ্ভব হয়—(ক) বহিরাগত ঔপনিবেশিক যাঁহারা স্ত্রী সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; (খ) বহিরাগত ঔপনিবেশিক যাঁহারা বাংলায় আসিয়া বিবাহ করেন ; (গ) স্থানীয় মিশ্র মুসলিম ; (৪) স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান।[১২]

ইসলাম প্রচারের প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীতও পরোক্ষ নীরব পন্থা ছিল। বিজয়ের পরই

বিজেতাগণ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপন করিতেন যেখানে ধর্মচর্চা ও শিক্ষার বিকাশ অব্যাহত থাকিত। মসজিদের পরিচালক 'ইমাম' ও মাদ্রাসার শিক্ষক আলীম ও মৌলবী সমাজে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং ইঁহাদের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। সংলগ্ন পীর ফকিরদের কবরে যে উৎসব হইত হিন্দুরাও ধর্মনির্বিশেষে তাহাতে যোগদান করিত। অনেক সময় মসজিদের সংলগ্ন ইয়াতিমখানা (অনাথালয়) ও মেহমানখানায় (অতিথিশালা) দরিদ্র, আশ্রিত বালকবালিকাগণ ও চিকিৎসাধীন রুগ্ন ব্যক্তিগণও বিধর্মীর খাদ্য-ভোজনে ধর্মান্তরিত হইত। পীর ফকীরগণের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠান করিতেন। খুলনা বাগেরহাট অঞ্চলে বিখ্যাত পীর খান জাহান আলি জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার বহু গুণমুগ্ধ হিন্দু ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন। আবার পীর ফকীরদের সম্বন্ধে যে নানা অলৌকিক কার্যাবলীর কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহাতে অশিক্ষিত কুসংস্কারপূর্ণ অনেক হিন্দু প্রভাবিত হইয়া মুসলমান হইয়াছিল।[২৩]

পীর ফকীর ব্যতীত শাসকবর্গ, অভিজাতশ্রেণী ও কর্মচারিগণও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামধর্মের প্রচারে সাহায্য করেন। ঐশ্লামিক মানসের (spirit) বিকাশে; মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাসমূহ নির্মাণে; শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্প্রসারণে ইঁহাদের বিশেষ আনুকূল্য ছিল। মুসলমান সাধুসন্ত ও বিদগ্ধজনেরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। জনকল্যাণমূলক বহু কার্যও তাঁহারা করিতেন। এইভাবে বঙ্গদেশে ইসলামের জোরদার প্রচার অতীব সাফল্যজনক হয়, বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরাঞ্চল জেলাসমূহে।[২৪]

প্রতিক্রিয়া

উল্লিখিত কারণগুলির সম্মিলিত পরিণামে এদেশে ইসলামের প্রসার ঘটিতেছিল। কিন্তু ইহাকে প্রতিরোধ করিতেও একটি বিরুদ্ধ শক্তির উদয় হয় যাহা অন্ততঃ কিছুকাল কার্যকরী ছিল। শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক মহত্বপূর্ণ ঘটনা। ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়িয়া বাঙালী এক অখণ্ডজাতিতে পরিণত হয়। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার এবং 'সপ্ত-গোস্বামী'-কৃত এক বিশেষ ধর্মতত্ত্বের বিকাশের ফলে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান প্রবল আকারে দেখা দেয়। ইহার ফলে বাংলা, উড়িষ্যা এমন কি আসামেরও হিন্দুসমাজের নবজাগরণ ও নবরূপায়ণ ঘটে, বিশেষতঃ অধ্যাত্মচর্চা, সাহিত্যানুশীলনে ও সংগীতবিকাশের ক্ষেত্রে (কীর্তন গানে)। বৈষ্ণবধর্ম যে শুধু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নৈতিক উন্নতিসাধন করে তাহা নহে, মনুষ্যমাত্রকেই মর্যাদা প্রদর্শন করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের সহায়ক হয়। নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে ইহা সমাজের নিম্নশ্রেণীর ও নিরক্ষর মানুষকেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। আসাম ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগামীরা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে বিশেষতঃ শহরাঞ্চল হইতে দূরবর্তী স্থানে, ইসলামের অগ্রগতি রোধ করিতে সমর্থ হয় এবং মধ্যযুগের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে। বৈষ্ণবরা অবহেলিত উপজাতিসমূহকে স্বধর্মের অনুগামী করিয়া তোলেন এবং ভাববিভোর নৃত্য ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের দ্বারা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটান।

দিয়াছিলেন।[১৫] স্বাভাবিক কারণেই এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মুসলমান বিজেতাদের মুক্তির দূতে হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল (দ্রষ্টব্য 'ধর্মপূজা বিধান')। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে আজও ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন রহিয়াছে। তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের রীতিনীতির সহিত ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের ফলে ধর্মঠাকুর সৎধর্মীদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হিন্দু দেবদেবীগণের রূপান্তর ঘটিল। যেমন, ধর্ম যবনরূপী হইলেন, বিষ্ণু পয়গম্বর, ব্রহ্মা পাকাম্বর, শূলপাণি (শিব) আদম, গণেশ গাজী, কার্তিক কাজী, মুনি ফকির, চণ্ডিকা দেবী হান্না বিবি, (আরবী, Hawwa, হওওয়া Eve, আদিনারী), পদ্মাবতী বিবি নূর (জ্যোতি) প্রভৃতি। এইরূপে হিন্দুদেবদেবীগণ ইসলামের বেশ পরিয়া যাজপুরে প্রবেশ করার পর একাধিক মন্দির ধ্বংসের কারণ হইয়া তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছেন।[১৬]

এইরূপে সামাজিক উৎপীড়ন এড়াইতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইসলামকে স্বাগত জানান। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের মৎস্যজীবি, কৃষক, ব্যাধ জলচারী দস্যু প্রভৃতি উপজাতিসমূহকে জাত্যাভিমানী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অপবিত্র ও অস্পৃশ্যরূপে গণ্য করিতেন। এই অবজ্ঞাত ও অবহেলিত মানুষের কাছে ইসলাম তাহার সাম্য ও একেশ্বরবাদের বাণী লইয়া সামাজিক বাধানিষেধ ও তাড়না হইতে মুক্তির উপায় নির্দেশ করে এবং এক উন্নততর জীবনের সন্ধান দেয়। প্রধানতঃ এই কারণেই তাহারা মোল্লা, মৌলবীদের প্ররোচনা অথবা প্রচার কার্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, যদিও বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মান্তরণের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।[১৭]

ইহা ব্যতীত সামাজিক মর্যাদালাভের ও বৈষয়িক যথা অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক সুবিধাপ্রাপ্তির প্রলোভনে বা আশায় অনেকে ধর্মান্তরিত হইতেন। মুসলমান হইলে রাজনৈতিক বৈষম্য অবলুপ্ত হইত ও ঘৃণিত জিজিয়া কর ও অপরাপর কর যেমন তীর্থকর, মুন্ডন কর, স্নান কর হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত। স্বসমাজে যে সকল হিন্দু সামাজিক মর্যাদা পাইতেন না ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের আশায় সাগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেন, অনেক সময় অবশ্য সুলতান ও কর্মচারিগণ বলপ্রয়োগ দ্বারা ধর্মান্তর করাইতেন ও ধর্মান্তরিতদের রাজপদ বিশেষতঃ রাজস্ববিভাগে দিতেন এবং ধর্মান্তর নিবিড় করার জন্য মুসলিম নারীর সহিত বিবাহ দিতেন।

সময় বিশেষে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণও ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেন। বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, 'কদাচিৎ উচ্চবর্ণের কোন হিন্দু লাভলোভ বশে অথবা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করত'। ইহাতে বড় কেহ বাধা দিত না। তৎকালীন হিন্দুসমাজের এই ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম,
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।[১৮]

লাভলোভবশে অবহেলিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত লোকের ধর্মান্তরগ্রহণ সহজবোধ্য হইলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্বধর্মত্যাগ বোঝা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ইহাদের আনুপাতিক সংখ্যানির্ণয়ও সম্ভব নহে। তবে ইহাও সম্ভব যে এই স্বেচ্ছা হিন্দুসমাজের জন্যই। অনেক সময় অতি সহজে বা কল্পিত দোষে হিন্দুকে ধর্মান্তরিত হইতে হইত, যথা দৃষ্টিদোষ, স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, ঘ্রাণদোষ ইত্যাদি। হিন্দু সমাজের অনুশাসন অমান্য

করিবার ফলে যাঁহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কার করা হইত তাঁহারা অনেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেন। অমেধ্য খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ, অস্পৃশ্যদের সহিত ঘনিষ্ঠতা, বিবাহের রীতিনীতি লঙ্ঘন অথবা অবৈধ প্রণয়ের কারণে অনেকেই সমাজ কর্তৃক একঘরে হইতেন অর্থাৎ স্বজাতির সংগে একত্রে বসিয়া ধূমপান বা জলগ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন। মুসলমানরা ইহা জানিত যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিনাশের উপায় ছিল নিষিদ্ধ খাদ্য বা পানীয় ব্যবহার। সুতরাং অনেক সময়ে তাহারা ছলের বা চাতুরীর আশ্রয় লইত। বিড়ম্বিত হিন্দুদের মধ্যে কেহ দেহত্যাগ, কেহ গৃহত্যাগ করিত। অন্যেরা যবনাচার মানিয়া লইত। 'চৈতন্য চরিতামৃত' হইতে আমরা জানিতে পারি যে গৌড়অধিকারী বা গৌড় শহরের চৌধুরী বা কোতোয়াল সুবুদ্ধি রায়কে সুলতান হুসেন শাহ 'করোয়ার পানি' দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও পরে শ্রীচৈতন্যের উপদেশানুসারে বৃন্দাবনবাসী হ'ন। জাতিনাশ যে হিন্দুর পক্ষে চরম শাস্তি ছিল তাহার উদাহরণ স্বরূপ খুলনা জেলার পীরালী ব্রাহ্মণদের প্রসংগ স্মরণ করা যাইতে পারে।[১৯] ইঁহাদের পক্ষে ইসলামধর্ম গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

(গ) **ধর্মীয় বা শান্তিপূর্ণ উপায়**

সামরিক উপায়, বলপ্রয়োগ বা কৌশল ব্যবহার ব্যতীতও ধর্মীয় বা শান্তিমূলক উপায়েও ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বংগদেশ অধিকৃত হইবার বহু পূর্বেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগে এই অঞ্চলের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল,—বিশেষতঃ বণিক ও অভারতীয় আরব, তুর্ক, আফগান মুসলিম ঔপনিবেশক ও ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে। সঠিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এইরূপ ধারণা রহিয়াছে যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ ইসলামের অভ্যুত্থানের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল। বাবা আদম শহীদ (রামপালের), শাহ সুলতান রুমী প্রভৃতি সুফী সন্ত ও পণ্ডিতগণ তুর্ক কর্তৃক বংগ-বিজয়ের পূর্বেই আসিয়াছিলেন অনুমিত হয়। সৈনবাহিনী পেঁছাইবার পূর্বেই ধর্মপ্রচারকদের আগমন ঘটে এবং ইসলামের প্রচারে তাঁহাদের কৃতিত্ব অসিশক্তির অপেক্ষা কোন অংশেই কম মহত্বপূর্ণ নহে। বস্তুতঃ ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রচার (Proselytisation) বলপূর্বক ও রক্তপাতের দ্বারা হয় নাই, মুসলমান সাধুসন্ত দ্বারাই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। এই শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের ফলে বংগদেশে ইসলামের প্রসারের সহিত উত্তরভারতে ইহার প্রচারে প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতে ইসলামের প্রসার প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে ও প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে সীমিত ছিল। কিন্তু পূর্ববংগে ইসলাম প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলেই প্রচারিত হয়। Risley সাহেব বহুপূর্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে প্রধানতঃ উপজাতিদের মধ্য হইতে ধর্মান্তরণ হইয়া থাকিবে।[২০]

ধর্মপ্রচারের জন্য অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামে কোন যাজক বা পুরোহিত নাই। বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রই প্রচারক। পীর, ফকির, গাজী, কাজী ও মোল্লা পুরোহিতের অভাব পূরণ করিতেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ফকির, পীর দরবেশ ও সুফী সন্তগণের অনাড়ম্বর জীবন ও জ্ঞানগর্ভ প্রবচনের দ্বারাও অনেকেই প্রভাবিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি, বিদ্বান ও ধর্মতত্বজ্ঞ পণ্ডিত যাঁহারা বংগদেশে বহিরাগত। তাঁহারা

মৃতদেহ সৎকার, মদ্যবিক্রয়, কচ্ছপ ও শূকরের মাংস ভোজন।[২৭]

(৪) রাজনৈতিক সম্বন্ধ

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধেও তিক্ত শত্রুতা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক ব্যবধানকে উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। একের গৌরব,—যথা বিজয়কাহিনী, হিন্দুদের হত্যা ও দাসত্ব-শৃংখলে বন্ধন,—অন্যের লজ্জা ও অপমানের কারণ ছিল। একের নিকট যে মূর্তিভঙ্গ ও মন্দির-ধ্বংস ন্যায্য ও গৌরবজনক ছিল তাহাই অপরের নিকট ঘৃণার্হ, দেবস্বাপহরণ বা দেবস্থান অপবিত্রীকরণ গণ্য হইত। স্বভাবতই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই প্রকার ভয়াবহ, লোমহর্ষক, কীর্তিকলাপের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন কারণ ইহা 'ইসলামের নিমিত্ত' জেহাদের মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। বিজেতাগণের এই সব কীর্তি হিন্দুদের নিকট উৎকট, অত্যাচার-পূর্ণ ও বীভৎস অপবিত্রীকরণরূপে প্রতিভাত হইত এবং তাঁহারা ইহার প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টা করিতেন। মহারাণা কুম্ভ মুস্লিম নারীদের বন্দী করিতেন বা একটি মসজিদ ধ্বংস করেন; মালবদেশের মেদিনী রায় মুস্লিম ও সৈয়দ নারীদের ক্রীতদাসী করেন; শের শাহও গোয়ালিয়রে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। বিজয়-নগরের রাজারা মুসলমানদের হত্যা ও লুণ্ঠন করিতেন। অবশ্য এইরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের লিপিবন্ধ দৃষ্টান্ত অল্পই পাওয়া যায়।[২৮]

(৫) অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচারের মাত্রা ও গুরুত্ব—আলোচনা

পূর্ব মধ্যযুগে মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের মাত্রা সম্বন্ধে সমসাময়িক উপাদানে আমরা যে তথ্য পাই তাহা দুই প্রকারের। সুতরাং অত্যাচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে দুই দিকই লক্ষ্য করা অবশ্য প্রয়োজন। নচেৎ সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হইবে না।

বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ, একত্রে জনসাধারণকে ক্রীতদাসে পরিণত করণ ও হিন্দুদের জিম্মি (zimmi) হিসাবে হীন মর্যাদা প্রদান ইত্যাদি অত্যাচারের ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কলহের বিবরণ সাধারণতঃ আমরা পাই ইবন বতুতার চতুর্দশ শতকের ভ্রমণবৃত্তান্তে।[২৯] সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যেও মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা কাশ্মীরে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশে ও বাংলায়। এখানে বাংলার বিষয় উল্লেখ করিব।

মধ্যযুগের বাংলার ধর্মীয় সাহিত্যের অংশবিশেষে হিন্দুদের উপর মুসলিমদের অত্যাচার এবং তাঁহাদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার বিবরণ আছে। জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্য মঙ্গলে' (১৪৮৫ খ্রীঃ পূর্বে) ভগ্ন গৃহ ও মন্দির মেরামতী সত্ত্বেও সুলতান কর্তৃক নদীয়ার ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের, যবন ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে চিরস্থায়ী কলহের ও ব্রাহ্মণদের জাতি-ভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩০] বিজয়গুপ্তও তাঁহার 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণে' আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময় (১৪৯৩-১৫১৯) হিন্দুদের উপর হাসান ও হুসেন নামক দুই কাজীর অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন। হিন্দুদের জাতি অপবিত্র করা হইত; পৈতা ছিন্ন ও মুখের মধ্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা হইত। হিন্দু বালকদের জাতিচ্যুতির উল্লেখ আছে। তুলসী-সহ ব্যক্তিগণ প্রহৃত হইতে।[৩১] হুসেন শাহের সমসাময়িক ঈশাননাগরও

তাঁহার 'অদ্বৈত প্রকাশে' তৎকালীন হিন্দুদের অপবিত্রীকরণ, বিগ্রহভঙ্গ, তুলসীর উপর প্রস্রাব ও মন্দির অপবিত্রকরণের বিবরণ দিয়াছেন।[৩২] বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত', চৈতন্যদেবের এই দুইটি জীবনীতেও মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কাজী পথে চৈতন্যদেবের কীর্তন নিষিদ্ধ করিলে তিনিও এই নিষেধ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার সহগামী বিরাট জমায়েৎ দেখিয়া ভয়ে কাজী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত আলোচনার পরই নিবৃত্ত হ'ন। অবশেষে সুলতানও কাজীকে চৈতন্যদেবের কোন ক্ষতি করিতে নিষেধ করেন।[৩৩]

বর্তমান যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক হিন্দুদের উপর হুসেনশাহের সময়ে অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার ধার্মিক নীতিকে গোঁড়ামি-দুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রয়াত মনীষী রমেশচন্দ্র মজুমদার সুলতানের যে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি এমনও মনে করেন যে এইরূপ সুলতানের যে প্রশস্তি,—'নৃপতিতিলক', 'কৃষ্ণ-অবতার', 'জগৎ-ভূষণ' ইত্যাদি—বাঙালী কবিগণ করিয়াছেন তাহা হিন্দুদের এক [illegible] মনোভাব ও নৈতিক অধঃপতন সূচিত করে।[৩৪] দৃষ্টান্তগুলি আপাতদৃষ্টিতে, [illegible] ঘটনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে অত্যাচারের ইঙ্গিত বহন করিতেছে ঠিকই, কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইবে। (১) সুবুদ্ধি রায়ের বিরুদ্ধে সুলতানকে প্ররোচিত করিতে তাঁহার বেগমের চেষ্টার অন্ত ছিল না। বারবার সুলতান পত্নীর অনুরোধ যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুলতান সুবুদ্ধির ধর্মনাশ করেন, কিন্তু কাহিনী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে সুলতানের ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও স্থিরবুদ্ধি স্ত্রীর প্রবল প্রতিশোধস্পৃহার নিকট নতিস্বীকার করে। (২) হুসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানে মন্দির ধ্বংস হইয়াছিল ঠিকই, উড়িষ্যার আকর উপাদানেও ইহার উল্লেখ আছে। হিন্দুর নিকট নিশ্চয়ই ইহা 'আঁতে ঘা দেওয়ার' সামিল কার্য। তবে হুসেন শাহের পক্ষে ইহা বলা চলে যে যুদ্ধকালীন ডামাডোল অবস্থায় শত্রুর মন্দির ধ্বংস সহজেই হইতে পারে বা করিতে পারা যায়। সুলতানের বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারী সনাতন তাঁহার সহিত মন্দির ও মূর্তি ভাঙ্গিতে উড়িষ্যা যাইতে অসম্মত হইলে কারারুদ্ধ হ'ন। এই ঘটনার ধর্মীয় দিক ছাড়াও রাজকীয় সেবার দিকও আছে। সনাতন অবাধ্যতার জন্যও কারারুদ্ধ হইতে পারেন। পরে সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতা রূপ উভয়েই সুলতানের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া চৈতন্যদেবের অনুগামী হ'ন।[৩৫] (৩) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে সুলতান নদীয়ার হিন্দুগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই প্রকারের। সুলতানের অনুচরবর্গ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে নদীয়ার ব্রাহ্মণগণ গৌড়ের সিংহাসন বলপূর্বক অধিকার করিবে। গৌড় সিংহাসনে ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন এই ধারণা তাঁহারা নিজেরাও পোষণ করিতেন বলিয়া বৃন্দাবনদাসও বলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণদের এই রাজদ্রোহিতার চিন্তা দমন করা সুলতানের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল রাজনৈতিক কারণে। ক্রুদ্ধ সুলতান নদীয়া ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। সেখানে এই সময়ে অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক হয়, হিন্দুদের ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি ব্যাহত হয় ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা স্তব্ধ হইয়া যায়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বারাণসী চলিয়া যান, তাঁহার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে রহিলেন। তবে সুলতানের পক্ষে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই অত্যাচার কেবল ব্রাহ্মণদের উপর, অন্যসম্প্রদায়ের উপর নয়।[৩৫ক] সুতরাং এই দমননীতি কোন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি প্রণোদিত নহে।

উপরন্তু, রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণ একটি নূতন জনপ্রিয় ও প্রাণবন্ত বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করেন। কখন কখন মুসলমান সুলতানগণও এই কার্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই বৈষ্ণব সাহিত্য মুসলিম সমাজকেও প্রভাবিত করে; অন্ততঃ ১২১ জন মুসলমান কবি বৈষ্ণবধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

অন্যদিকে ইসলামের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে বহিরাগত সুফীসন্ত ও ধর্মপ্রচারকদের সংখ্যা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছিল। বৈষ্ণবধর্মের দুর্বার গতিরোধ করিতে পারেন এরূপ সুফীসন্তের সংখ্যা অধিক ছিল না। ইসলাম ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল তত্ত্ব সমূহকে বাঙ্গালী জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। কেন তাহা পরে আলোচনা করিব।

(২) মুসলমান আমলে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদা

মুসলিম বিজেতাগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। বঙ্গদেশ ছিল ঐস্লামিক রাষ্ট্র বা তাহার অঙ্গ। সুতরাং সেখানেও দিল্লীর মত তত্ত্বগতভাবে হিন্দুদের কোন রাজনৈতিক মর্যাদা (status) ছিল না। কোন অমুসলমান পূর্ণ নাগরিকের অধিকার ভোগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু যাঁহারা আশ্রয়ের বিনিময়ে কতিপয় কর্মসাধন ও জিজিয়া করপ্রদানের চুক্তি করিতেন তাঁহাদের জিম্মি (zimme) বলা হইত ও তাঁহাদিগকে বরদাস্ত (tolerate) করা হইত। হিন্দুদের উপর কিছু সামাজিক ও আইনগত বাধানিষেধও প্রয়োগ করা হইত, যেমন তাঁহাদের বিশেষ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইত; অশ্বপৃষ্ঠে চড়া বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল; কাজীর আদালতে সাক্ষ্যদানের অধিকার থাকিত না এবং প্রকাশ্যে কোন প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে হইত। শেখ হামদানী প্রণীত Zakhirat ul Muluk হইতে জানা যায় যে জিম্মিদের (zimmi) প্রাণ ও সম্পত্তি কুড়ি প্রকার নিয়ম পালনের উপর নির্ভর করিত। নিয়মভঙ্গকারী জিম্মি (zimmi)র প্রতি যুদ্ধকালীন অমুসলমানোচিত ব্যবস্থা লওয়া হইত।

ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্রে (fiqh) ৪টি বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কেবলমাত্র আবু হানিফাই হিন্দুদের জিজিয়া করপ্রদানের বিনিময়ে ধর্মানুষ্ঠানের অনুমতি দিয়াছিলেন। অন্য সকলেই ভিন্নমত পোষণ করিতেন ও 'ইসলাম অথবা মৃত্যু' এই দুই পন্থার মধ্যে অন্য কোন বিকল্পের উল্লেখ করেন নাই। সুলতানদের মধ্যে মামুদ ব্যতীত অন্য সকলেই হানাফী মতই সরকারী বিধি নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলিমগণ এই আদর্শের বিপক্ষে ছিলেন, যেমন মহম্মদ তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলকের সমসাময়িক জিয়াউদ্দিন বরণী, ফিরুজের রাজত্বকালের আফিফ, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইয়াহিয়া (yahya) ও সপ্তদশ শতাব্দীর কারিস্তা।

রাষ্ট্র ছিল ইসলামিক কিন্তু সমাজ ছিল মিশ্র। বাংলায় হিন্দুগণ প্রায় প্রথম দুইশত বৎসর উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত ছিলেন সুতরাং তাঁহারা মুসলমানদের প্রতি রুষ্ট ও বিরূপভাব পোষণ করিতেন। স্বাধীনতা হারাইয়া বিক্ষুব্ধ মনে তাঁহারা ম্লেচ্ছ নিধনের প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করেন। এইভাবে কাফের ও ম্লেচ্ছদের মধ্যে এক প্রকার সরাসরি মেরু বৈপরীত্য (polarisation) ও সামাজিক দ্বিভাজন (social dichotomy) রাষ্ট্র ও সমাজে সৃষ্ট হয়।

(৩) সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য

হিন্দুদের অবনমিত রাজনৈতিক মর্যাদা যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্যের দ্বারা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সে যুগে হিন্দু মুসলমান উভয়েই স্বীয় সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান-গত বৈশিষ্ট্যগুলি সযত্নে পোষণ করিতেন। অধিকাংশ পূর্ব আক্রমণ-কারীরা সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দুদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ছিলেন ও সেজন্য হিন্দু সভ্যতায় সহজেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলাম ছিল এক নবীন বিশ্বজনীন ধর্ম যাহার বিকাশ হয় মধ্যপ্রাচ্যের পরিণত সভ্যতার পৃষ্ঠভূমিকায় এবং ইহুদিধর্ম, খৃষ্টধর্ম, জরোথুস্ট্রিয়ানিজম, নিও-প্লেটোনিজম, বৌদ্ধধর্ম ও বেদুইন কৃষ্টির সমন্বয়ে। এক আল্লা, এক পয়গম্বর, এক ধর্ম, এক ধর্মপুস্তক ও এক সাম্রাজ্যের বাণী লইয়া ইসলাম এক সহজ তথাপি আত্মবিশ্বাসী, মৌলিক, শক্তিশালী ধর্ম হিসাবে গড়িয়া উঠে। ব্রহ্মবিদ্যাকল্পনা, দার্শনিক ধারণা, ধর্মীয় সাহিত্য ও পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি বুনিয়াদী ব্যাপারে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রখর বৈষম্য বিদ্যমান। ইসলাম জ্ঞানাতীত (transcendental), আল্লার আদেশ-ভিত্তিক। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন অন্তর্নিহিত পরমার্থে (divine immanence)। ঈশ্বরের বহির্প্রকাশ অন্তর্বাসী ঐশীশক্তিরই দ্যোতক। 'তৎ ত্বমসি' এই উপলব্ধির ফল ঈশ্বরের অবতাররূপে আবির্ভাব। হিন্দুরা বিভিন্নরূপে তাঁহার পূজা করেন। হিন্দু ধর্মে বহু-ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা ইসলামে দূষণীয়। বিদ্যাপতির ভাষায় 'একক ধম্মে অওকো উপহাস'। ফলে হিন্দুদের পরম পবিত্র মূর্তি ও মন্দির মুসলমানদের বিদ্বেষ উৎপন্ন করে।

সামাজিকক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য উভয় সমাজের সংগঠনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ও উভয়কেই অন্তস্থল পর্যন্ত গভীরভাবে নাড়া দেয়। সমাজ-ব্যবস্থায় দেখি শ্রেণীগত, জাতিগত, বংশ ও বর্ণভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য বাতিল করিয়া ইসলাম এমন এক ধর্মীয় সম্প্রদায় স্থাপিত করে যেখানে আপামর মুসলমানদের মধ্যে সাম্য বিরাজমান। অপরদিকে হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক ও ক্রমানুসারে সংগঠিত ছিল। ব্যবধান ও অস্পৃশ্যতাই এখানে এক পবিত্র ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত। বিদ্যাপতির ভাষায় 'কতহুঁ মিলমিস, কতহুঁ ছেদ'। দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনেও তীব্র বৈষম্য ছিল। বিবাহ ব্যাপারে হিন্দুরা অসবর্ণবিবাহ, সগোত্রবিবাহ, বিধবাবিবাহের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করিতেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে সবই প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের নিকট বিবাহ বন্ধন চিরস্থায়ী। মুসলমানেরা বিবাহবন্ধন ছেদ, নারীর পুনর্বিবাহও মানিয়া লইতেন। ভোজন ব্যাপারে ও খাদ্যবিচারে হিন্দুদের মধ্যে জাতিধর্মনির্বিশেষে একত্র ভোজনের ও গোমাংস ভক্ষণের উপর বাধানিষেধ ছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে দুইয়েরই প্রচলন ছিল। ইহা ব্যতীত অভিবাদন পদ্ধতি, পরিচ্ছদ, মৃতের সৎকার, উত্তরাধিকারের আইন, কালগণনার পদ্ধতি, মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত ইত্যাদি ব্যাপারেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পার্থক্য ছিল।

বাস্তবে অবশ্য মুসলমান সুলতানগণ বহু হিন্দু বিধিব্যবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার, সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদির অনুমোদন করিতেন। ইসলামীয় আচারের বিরুদ্ধ হইলেও সুলতানগণ কয়েকটি হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন নাই। যেমন মন্দিরে প্রকাশ্যে পূজার্চনা ও বলি, বিগ্রহ ও মূর্তির শোভাযাত্রা, রাজপথে কীর্তন, প্রকাশ্যে

এই পরিপ্রেক্ষিতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের অসামান্য প্রভাবে স্থানীয় শাসনকর্তারা ভীত হইয়া পড়েন। কীর্তন বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার অনুগামী ব্যক্তিদের রাজশক্তির ভয় দেখাইত।

কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ,
শ্রীবাসের তরে হৈল দেশের উচ্ছাদ।
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা,
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ,
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ।...
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে
রাজনৌকা আসে বৈষ্ণব ধরিবারে।[৩৬]

আচার্য মজুমদারের অভিমতের বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য-সেবিগণের পক্ষে শাসনরত রাজার স্তুতিগান সেকালে রেওয়াজ ছিল এবং ইহা অপরিহার্যরূপে নৈতিক স্খলনও প্রমাণিত করে না। প্রাচীনকালের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার বহু নজির আছে। মধ্যযুগেও অন্য অনেক দৃষ্টান্তও আছে। তর্কের খাতিরে ন্যায়সংগতরূপেই বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলিম শাসকদের সম্বন্ধে সমসাময়িক হিন্দু কবিগণের অবাধ প্রশংসা তখন যে এক চিরন্তন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষ ছিল এই অভিমতের বিরুদ্ধে যাইবে। উত্তেজনা বা সংঘর্ষ যে ছিল না তাহা নহে, ছিল, কিন্তু ইহা বাস্তবে চিরন্তন ব্যাপার ছিল না। স্মরণীয় যে, ব্রাহ্মণ-মুসলিম সংঘর্ষ ও সাময়িক ধর্মীয় দাংগা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার কারণ কখনও কখনও কিছু মুসলিম কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত মর্জি ও ধর্মীয় অত্যুৎসাহ ও অন্য সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক হেতু। 'মনসামঙ্গলে' বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন যে হুসেনহাটি গ্রামের সহানুভূতিশীল কাজী হিন্দুদের সর্পদেবী মনসার হাঁড়ির পূজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম বিস্তারে অত্যুৎসাহী মোল্লা সেইজন্য তাঁহাকে তিরস্কৃত করেন। এই জন্য ব্রাহ্মণগণ মুসলমানদের নিকট হইতে দূরে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বিপ্রদাসও তাঁহার 'মনসাবিজয়ে' এই ধরনেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।[৩৬ক]

সাহিত্য ব্যতীত মুদ্রা ও অন্তর্লেখ হইতেও যে তথ্য পাওয়া যায় তাহাও হুসেন শাহের আনুকূল্যেই যায়। তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানগণ মুদ্রায় 'ইসলামের ও মুসলমানদের সহায়ক' উপাধি উৎকীর্ণ করিতেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পরবর্তী সুলতানগণ এই প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও কলিমা (কলমা) প্রাচীন রীতি হিসাবে খোদাই থাকিত। হুসেনশাহী বাংলায় জিজিয়া কর লওয়া হইত না। যে বৈষ্ণব সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষের কথা আছে তাহাতেও ইহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ মুসলমানদের উপর জাকাতও (zakat) ধার্য হইত না। সুতরাং বলা যায় যে হুসেন শাহী সুলতানগণ বহুলাংশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।[৩৭]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মধ্যযুগের বাংলায় সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্রের আর একটি দিকও রহিয়াছে। অত্যাচার, ধর্মান্তরণ, মন্দির-ধ্বংস ও বিগ্রহভঙ্গ হইল একদিক। শুধু একদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইবে না।

বস্তুত সমসাময়িক সাহিত্যে আনুষঙ্গিক উল্লেখ (incidental references) হইতে জানা যায় যে হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধের ইতিহাস শুধু অসহিষ্ণুতা ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমির বিবরণ নহে। বৈষ্ণব সাহিত্যেও মধ্যে মধ্যে আমরা এই সম্বন্ধের উজ্জ্বল চিত্র ও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাবের উল্লেখ পাই।[৮] ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে অন্ধ গোঁড়ামির কাণ্ড হয়ত সচরাচর ঘটিত না এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতে সদ্ভাবের অনুকূল আবহাওয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। এই ধারার প্রভাবও হয়ত সুলতান, মন্ত্রী বা সাধুসন্তদের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করিত। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, রাজা গণেশ, জালালুদ্দীন, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ও আরও অন্য কয়েকজন সুলতান হিন্দুদের প্রতি 'অম্ল-মধুর' অর্থাৎ সাধারণভাবে উদার ও সহানুভূতিশীল না হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না।

অতএব এই প্রশ্নই মনে উদয় হয় যে মধ্যে মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষ হইত, তাহার ফল সর্বতোভাবে বিষময় ও অনর্থকারক হইলেও,—তাহার মাত্রা বা গুরুত্বের প্রভাব কত সুদূর-প্রসারী ছিল? এর ফলে কি সামাজিক বিকাশের ধারা ব্যাহত হইয়াছিল?

হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ে সুফীদের অবদান অনস্বীকার্য। তবুও ইহা বলা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইবে যে সুফীদের ঔদার্যের ফলে হিন্দুদের অদ্বৈতবাদের প্রতি মুসলমানদের প্রতিকূলতা প্রশমিত হইয়াছিল, কারণ ইহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু আপতিক বাধা বিড়ম্বনা সত্ত্বেও সাধারণ জীবনস্রোত সাম্প্রদায়িক দুই ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া বহমান ছিল। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ, নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুরা ছিলেন সংখ্যা-গরিষ্ঠ। শেষোক্তদিগের সহিত একই গ্রামে বা নগরে বসবাসকারী হিন্দু-মাতার গর্ভ-জাত মুসলমানদের বা তাঁহাদের বংশধরদের সামাজিক সম্বন্ধ সদ্ভাবাত্মক, আন্তরিক, প্রতিবেশীসুলভ ও সহযোগিতা-পূর্ণ থাকাই সম্ভব। কয়েকটি উদাহরণ হইতে ইহা জানা যায় যে ছিলও তাই।

সুলতানী আমলে হিন্দুদের স্থান

প্রথমেই আলোচনা করা যাক সুলতানী আমলে হিন্দুদের স্থান। ইসলামী রাষ্ট্রে বিধানগত ভাবে হিন্দুদের মর্যাদা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছি। এখন বাস্তবে তাহা কি প্রকার ছিল পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(ক) হিন্দুগণের রাজ কার্যে নিযুক্তি

সুলতানী রাজসভায় হিন্দুগণের রাজপদে নিযুক্তি সম্বন্ধে ৺আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার কোনই গুরুত্ব পোষণ করেন নাই। তিনি মনে করেন ইহা বিরল বা আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু গভীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা যে ভ্রান্ত ধারণা তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথম প্রথম হিন্দুদের নিযুক্তি বিপজ্জনক হইতে পারে আশঙ্কায় তাহাদের রাজপদ হইতে দূরে রাখাই যুক্তিসংগত বলিয়া স্বাভাবিক কারণেই সুলতানগণ মনে করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস হ্রাস পায়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। কারণ প্রথম যুগের সধর্মী আমীর জায়গীরদারগণ প্রায়ই বিদ্রোহ করিতেন, নিয়মিত রাজস্বও প্রদান করিতেন না। আমীর খুসরুর সাক্ষ্যমতে হিন্দুসৈন্য গৌড়ীয় সুলতানের পক্ষে উড়িষ্যা অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। এই সব কারণে মধ্য বঙ্গে রাজস্ব আদায়ের জন্য বহু হিন্দু জমিদার নিযুক্ত হয়। আভ্যন্তরীণ শাসনেও সুলতানগণ হস্তক্ষেপ না করার ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন শাসনব্যবস্থা প্রায় অক্ষুণ্ণই

ছিল। শামসুদ্দীন ইলিয়াস ভুঁইয়া (ভৌমিক) বলিয়া খ্যাত জমিদারশ্রেণীর উপর নির্ভর করিতেন ও রাজ্যলাভের পর উত্তর বঙ্গের ভুঁইয়াদের অধীনে এক রাজকীয় সৈন্যদলও গঠন করেন। এইভাবে ইঁহারা শাসনে ও সৈন্যসংগঠনে সুলতানদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইঁহারা স্ব স্ব সৈন্যদলও পোষণ করিতেন। পরগণা ভাদুরিয়ায় (ভাতুরিয়া) জায়গীরদার জগদানন্দ ভাদুড়ী শামসুদ্দীনের প্রধান উজীর ছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ 'একটাকিয়া ভাদুরী' বলিয়া পরে খ্যাত হ'ন।[৩৯]

হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস হ্রাস না পাইলে গণেশ (১৪১০-১৮)-জালালুদ্দীনের (১৪১৮-৩৩) রাজত্বকালেই গৌড় দরবারে হিন্দু পন্ডিত-শাসকের যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী সুলতানদের সময়েও যথাসম্ভব বজায় থাকিত না, বা সুলতানকে মন্ত্রণাদানে, রাজ্যশাসনে, বিশেষতঃ রাজস্ববিভাগে, এমনকি সেনাপতিপদেও হিন্দু নিযুক্ত হইত না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণও রাজানুগ্রহ লাভ করেন। হিন্দু কর্মচারীদের মুসলমানী পদবী প্রদান করা হয়।[৪০]

ব্রাহ্মণ ঃ মহিমান্বিত আচার্য গাই (Gnai) বৃহস্পতি মিশ্র পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ হিসাবে গণেশ ও জালালুদ্দীনের সময় হইতেই বিখ্যাত। একাধিক গৌড়াধিপতির মন্ত্রী হইয়া তিনি মন্ত্রণাদান করিতেন ও অনেক উপাধি পাইয়াছিলেন।[৪১] বিশ্রাম ও রাম প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণও রাজমন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে সুলতান জালালুদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তাঁহার এক হিন্দু মহামন্ত্রী সেনাপতি। সুলতান তাঁহাকে 'রায় রাজ্যধর' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।[৪২]

রাজনীতিক ক্ষেত্রে হুসেনশাহী সুলতানদের আমলে অনেক ব্রাহ্মণ উচ্চ রাজকীয় পদলাভ করেন। সুলতান হুসেন শাহের শাসনকালে রাজ্যের দুই স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন যশোহরনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত ও মহাকবি, সনাতন (মৃত্যু আনুঃ ১৫৫৮) ও তাঁহার ভ্রাতা রূপ। সনাতন ছিলেন 'দবীর-খাস' (খাশ মুন্সী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী) ও রূপ ছিলেন 'সাকর মল্লিক'।[৪৩] তাঁহাদের ভ্রাতা অনুপ (অনুপম, নামান্তর বল্লভ) ছিলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ (মুদীর ই জবর, master of the mint)। ইঁহাদের অন্য আত্মীয়স্বজনও উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন যেমন সনাতনের শ্যালক।[৪৪] জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের সাক্ষ্য মানিয়া লইলে ইহা মনে হইবে যে হয়ত হুসেন শাহের হিন্দুপ্রীতি কেবলমাত্র রাজনৈতিক কৌশল, প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও গোপনীয় কার্যে হিন্দু-নিযুক্তি শুধু কৌশল নয়।[৪৫]

কায়স্থ ঃ ব্রাহ্মণদের পর কায়স্থদের অধিকার ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজকার্যে, সৈন্য-নিয়ন্ত্রণে ও দেশ-শাসনে; তবে সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল উচ্চ ও নিম্ন রাজকার্যে বিশেষতঃ রাজস্ব-বিভাগে ও জমিদারী পরিচালনায়। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-প্রায় ৭৪) তাঁহার প্রধান কর্মচারী কুলীনগ্রামের মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণও বহুকাল পর্যন্ত গৌড়দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সভায় কুলীনগ্রামের বসুবর্ণ বক্‌শীদের সম্বন্ধে রূপরাম তাঁহার 'ধর্মমংগলে' লিখিয়াছেন, কায়স্থ কারকুন যত করে লেখাপড়া'। কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন যে সনাতন বৈরাগ্যের জন্য রাজকার্য প্রায় ছাড়িয়া দেওয়ায় 'লেভ কায়স্থগণ রাজকার্য করে'।[৪৬] 'রাজমালা' হইতে জানা যায় যে গৌর মল্লিক ছিলেন হুসেন শাহের 'ত্রিপুরা অভিযানের' এক সেনাপতি।

আর এক সেনাপতি (লস্কর ? সরলস্কর) কায়স্থ রামচন্দ্র খান ছিলেন রাজ্যের দক্ষিণাংশের অধিকর্তা। সুলতান ও উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের সংঘর্ষের বিপজ্জনক সময়ে রামচন্দ্রেরই সাহায্যে শ্রীচৈতন্য ছত্রভোগ দিয়া সীমান্ত সহজে পার হইয়া নীলাচল গিয়াছিলেন। হুসেনশাহের উজীর ছিলেন বর্ধমানবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশীয় গোপীনাথ বসু 'পুরন্দর খান'।[১১]

কায়স্থগণ তাঁহাদের কূটবুদ্ধি ও প্রতাপের জন্য এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে দোষ সত্ত্বেও শাসকেরা তাহাদিগকে সহজে পীড়ন করিত না।

"বিশেষে কায়স্থ বৃত্তি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জগর্জ করে মারিতে সভয় অন্তর॥"[৪৮]

অন্য সম্প্রদায়ঃ রাজপদে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিও সুযোগ পাইত। গৌড়ীয় দরবারে যে সম্প্রদায় স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বরাবর বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা হইল বৈদ্য। প্রাসাদ ও অন্তঃপুরে ষড়যন্ত্রের ভয়ে সুলতানগণ একমাত্র বিশ্বস্ত বৈদ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও রাজ চিকিৎসক (খাস চিকিৎসক) হিসাবে নিযুক্ত করিতেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন পাল ও সেন যুগের রাজবৈদ্যবংশজাত। পূর্বের ন্যায় ইঁহাদের উপাধি হইত 'অন্তরঙ্গ'। হুসেন শাহের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাস। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড অঞ্চলের অনেক বৈদ্য গৌড় সরকারে নিযুক্ত ছিল, যথা মহাকবি দামোদর 'যশোরাজ খান' ও তাঁহারই দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ।

ছত্রীদের মধ্যে হুসেন শাহের দেহরক্ষী কেশব ছত্রীর নাম উল্লেখনীয়।

বণিকদের মধ্যে সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৫-৮১ তাঁহার দরবারের কর্মচারী বরেন্দ্রবিষয়ের বণিক কুলধরকে প্রথমে 'সত্যখান' ও পরে 'শুভরাজখান' উপাধি দেন।[১৯]

(খ) রাজ সভাশ্রিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বঙ্গ বিজয়ের প্রায় প্রথম দুইশত বৎসর ছিল অরাজকতা ও অশান্তির যুগ। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াস শাহী সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠার পর শান্তি স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্ট হয়। সুলতানী আমলে বাংলা ইসলামী সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফার্সী ভাষা রাজভাষা হইলেও ইহা পারস্য বা উত্তর ভারত হইতে আগত কোন ধারার দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নাই। অনেক সুলতান ও শাসনকর্তা সভাপণ্ডিতের মুখে পৌরাণিক কাহিনীর আবৃত্তি শুনিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং বাংলাদেশে সংস্কৃত, লৌকিক পুরাণ ও সাধারণ সাহিত্যের চর্চা শাসকবর্গের অর্থাৎ সুলতান ও কর্মচারিদের পোষকতা লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে 'মধ্যযুগের পৌরাণিক বাংলাসাহিত্য প্রধানত রাজসভাশ্রিত বললে অত্যুক্তি হয় না।' 'কৃষ্ণলীলা' কাহিনীর আকর সংস্কৃত পুরাণ হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি) ব্যতীত দেশীয় লৌকিক (রাধাকৃষ্ণপ্রণয়লীলাবিষয়ক) কাহিনী। সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ বাংলায় চতুর্দশ শতকের পূর্বে প্রচলিত ছিল না ও ঐ শতকের মধ্যভাগে মাধবেন্দ্রপুরীই ভাগবতের প্রসার করেন (সেন)। সর্বপ্রথম গৌড় দরবারের কর্মচারীদের মধ্যেই প্রথম ভাগবতের আদর হয়। মালাধর বসু প্রধানত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। সনাতনের জন্যও ভাগবত লেখা হইয়াছিল।[৫০]

পঞ্চদশ শতকে যদু জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহের (১৪১৮-৩৩) হিন্দু মহামন্ত্রী সেনাপতির অনুরোধে আচার্য কবি চক্রবর্তী বৃহস্পতি মিশ্র 'স্মৃতি রত্নহার' রচনা করেন। কবির মনীষাকে সুলতান বিশেষভাবে সম্মানিত করেন।[৫১] বিশ্রাম ও রাম প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও কবীন্দ্র হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাত হ'ন।[৫২]

কোন কোন গৌড়ীয় সুলতান যে কবি/পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা রাজকর্তব্য হিসাবে গণ্য করিতেন তাহা সম্ভবতঃ হিন্দু রাজকর্মচারীদের প্রভাবে। সুলতান কবি/পণ্ডিতকে সাধারণতঃ 'শুভরাজখান,' 'গুণরাজখান,' 'যশোরাজখান,' ইত্যাদি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিতেন। 'খান' বা খাঁ' শব্দের অর্থ ঠাকুর বা মহাশয়। পরে ইহা 'রায় খাঁ' পদবীতে পরিণত হয়। উপাধির জন্য কবি/পণ্ডিতরা সুলতানের গুণকীর্তন দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।[৫৩]

সুলতান বরবক শাহ ইলিয়াসী (১৪৫৯-৭৪), শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের বঙ্গানুবাদক ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ১৩৯৫-১৪০২, ১৪৭৩-৮০) কুলীনগ্রামের মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। তাঁহার পুত্র 'সত্যরাজ'ও 'খান' উপাধি ভূষিত হ'ন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসও তাঁহার পোষকতা লাভ করেন।

সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ইলিয়াসী (১৪৭৪-৮২) তাঁহার কর্মচারী কুলধরকে 'সত্যখান' ও পরে 'শুভরাজখান' উপাধি প্রদান করেন। ইনি গোবর্ধন পাঠকের সহায়তায় 'পুরাণ সর্বস্ব' নামক একটি পুরাণ-স্মৃতি-সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। (১৩৯৬ শক/ ১৪৭৪-৭৫)

সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) অনেক কর্মচারীই কবিপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সনাতন, রূপ, কেশবখান ছত্রী, রামচন্দ্র খান উল্লেখযোগ্য। দামোদর 'যশোধর খান' তাঁহার 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে হুসেন শাহের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারই দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ পদকর্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।[৫৪] কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি।[৫৫] ব্রাহ্মণ বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের (১৪১৭/১৪৯৫) পুষ্পিকায় হুসেন শাহের নাম উল্লিখিত।[৫৬] ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ফুল্লশ্রী গ্রামের বিজয় গুপ্ত 'মনসামঙ্গল' লিখিয়াছিলেন (১৪০৬/১৪৮৪)।

হুসেন শাহের পুত্র সুলতান নসীরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩৩) কবিশেখর-উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহের পোষক ছিলেন।[৫৭] নসরতের পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ (১৫৩২-৩৩) শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখাইয়াছিলেন। ইহার বিষয়বস্তু হইল চণ্ডী বা কালী পূজার মহিমা প্রচার। এইরূপে সুলতানগণ হিন্দুসংস্কৃতির পোষকতা করেন।

চাটিগাঁয়ে (চট্টগ্রামে) হুসেন শাহের সেনাপতি প্রতিরাজ) লস্কর পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র নসরৎ ('ছুটী') খানও গৌড়ের অনুরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন প্রচেষ্টায় বাঙালী কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরাগল খানের পোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব হইতে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন।[৫৮] হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সময়ে পরাগলের পুত্র 'ছুটী' খানের আদেশক্রমে শ্রীকর নন্দী জৈমিনী সংহিতার দীর্ঘতর আখ্যান হইতে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন।[৫৯] কারণ 'ছুটী পরমেশ্বরের সংক্ষিপ্ত বিবরণে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু পিতাপুত্রের এই প্রচেষ্টা যোগ্য কবিপণ্ডিতের অভাবে ফলপ্রসূ হয় নাই। অনুবাদ ব্যতীত কোন স্বাধীন রচনা লিখিত হয় নাই।

রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনটি পবিত্র সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মাতৃভাষায় চিত্রিত লৌকিক সংস্কৃতির প্রাধান্যের প্রতীকস্বরূপ। ইহা জনসাধারণের, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানসিক চাহিদা পূরণ করে। পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারতের প্রভাব তৎকালীন বাংলার হিন্দু ত' বটেই, মুসলমান সমাজেও এত গভীর ছিল যে সমসাময়িক প্রখ্যাত লেখক সৈয়দ সুলতান লিখিয়াছেন যে (হিন্দু এবং) মুসলমান ঘরে ঘরে ইহা পাঠ করিত এবং কেহই ঈশ্বর ও তাঁহার পয়গম্বরকে মনে রাখিত না। আম মুসলিম জনতা শুধু বাংলাই জানিত। আরবী ও ফার্সীতে একেবারেই অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের ঐশ্লামিক ধর্মগ্রন্থের কোন জ্ঞানই ছিল না। তাহাদের মানসিক পটভূমি মুসলিম অপেক্ষা অধিকতর হিন্দু ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সন্দেহ নাই তৎকালীন বাংলার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে ঐশ্লামিক বিষয়ে রচনা অধিক হয় নাই। অথচ প্রথম যুগের মুসলিমদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও মানসিক অভাব পূরণ করিতে হইবে।[৬০] ধীরে ধীরে বহিরাগত মুসলমানগণ বঙ্গায়িত হইয়া (Bengalicised) পুস্তক বা কাব্য রচনা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের অবদান রাখিতে থাকেন। ইহার ফলাফল পরে আলোচ্য।

সুলতানী আমল শেষ হইবার পর বাংলার বিভিন্ন সীমান্তের স্থানে স্থানে হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য সভায় [৬১] ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পৌরাণিক ও রোমান্টিক কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল। যেন গৌড়সভার নির্বাপিত সাহিত্য-দীপশিখার প্রতিচ্ছবি। মুসলমান নৃপতিদের সভাতেও হিন্দুদের ন্যায় কবিপণ্ডিত থাকিতেন। সুলেমান খান কররাণির পৌত্র, ঈশাখানের পুত্র মুসাখান 'মসনদ-ই-আলির' সভাপণ্ডিত ছিলেন মথুরেশ। তিনি তাঁহার রচিত অভিধান শব্দরত্নাবলীর উপক্রমণিকায় ও উপসংহারে মুসাখানের ও তাঁহার ভ্রাতাগণের (মহম্মদ খান, আবদুল্লা খান ইত্যাদি) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজসভায় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে অনেক বাঙ্গালী গুণী আশ্রয় লাভ করেন। বিশেষতঃ দুইজন প্রখ্যাত মুসলমান কবি, দৌলৎ কাজী ও সৈয়দ আলাওল, সভার গৌরববৃদ্ধি ও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন।[৬২] তাঁহাদের পূর্ববর্তী (সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষভাগের) সাবিরিদ খান নামক অন্য একজন মুসলমান কবির রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই মুসলমান কবিরাই বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের প্রচলন করেন।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র: সুলতানী আমলে পঞ্চদশ শতকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। মুসলমানগণ অনেক সময়ে হিন্দুবিরোধী হইলেও এই কেন্দ্রগুলির কোন ক্ষতি করে নাই।

(১) রামকেলী গ্রাম [৬৩]—ইহা গৌড়ের নিকট ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। কৃষ্ণভক্তি ধর্মচর্চার প্রধান স্থান, রূপসনাতন ও অন্য উচ্চ রাজকর্মচারিগণের এবং শ্রীচৈতন্যভক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি, কবি চতুর্ভুজ ও অন্যান্য কবির আবাসস্থল। সনাতন বিদ্যাবাচস্পতিকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। সুলতান হুসেন শাহও যে তাঁহাকে মান্য করিতেন তাহা তাঁহার পৌত্র রুদ্র ন্যায় বাচস্পতির 'ভ্রমরদূত' কাব্য হইতে জানা যায় ("গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঘ্রিরেণু")।

(২) নবদ্বীপ-শান্তিপুর[৬৪]—অনেক পণ্ডিত রাজসভার সংস্পর্শে সম্মানিত হইতেন ঠিকই কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাদের নিকট আসিত না। সেজন্য সারা বাংলার পণ্ডিতবর্গ

নবদ্বীপে বা শান্তিপুরে বসবাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধনী জমিদারের আশ্রিত, কেহ ধার্মিক ধনীর দ্বারা পুষ্ট, কেহ বা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সন্ধিস্থলে বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের ঐশ্বর্য ও মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন।

দারিদ্র্যের নিষ্কলুষ আবহাওয়ায় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে নবদ্বীপ-শান্তিপুর নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। মুঘল শাসন সুদৃঢ় হইবার পর প্রান্তীয় রাজন্য ও স্থানীয় জমিদারগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। সংস্কৃত বিদ্যা নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে গঙ্গাতীর ধরিয়া প্রসারিত হয়। এমন নয় যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বড় পণ্ডিত ছিল না। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্তী পাঠ সাঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার গুরু কর্তৃক নবদ্বীপ, শান্তিপুর বা জোগ্রামে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন (আত্মকথা)। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সংস্কৃতবিদ্যার কেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপ-শান্তিপুর ব্যতীত দিনাজপুর, বিক্রমপুর, সোনারগ্রাম, বাহাদুরপুর নাসিগ্রাম ইত্যাদিও খ্যাতিলাভ করে।[৬৫]

(গ) মুসলমান রাজসভায় হিন্দু ঠাট

মুসলমান সুলতানদের রাজসভায় হিন্দু আমলের ঠাট কিছু কিছু বজায় ছিল। রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন দুই প্রকারের পদবী প্রচলিত ছিল। প্রাচীনের মধ্যে ছিল নিয়োগী, চৌধুরী। মুকুন্দরামের ভাষায় "নিয়োগী চৌধুরী নহি না করি তালুক"। নবীনের মধ্যে ছিল শিকদার, ডিহিদার, মজুমদার, বক্শী ইত্যাদি।

পরিচ্ছদে মুসলমানপ্রভাব লক্ষিত হয়। রাজদরবারে হিন্দুরাজারা ও (পশ্চিম) সেনাপতিরা মুসলমান পোষাক পরিতে আরম্ভ করেন। যুদ্ধে পাগড়ী, ইজার ও কাবাই ছিল পরিধেয়। রণোন্মুখ লাউসেনের বিবরণে রূপরাম লিখিয়াছেন—

পরিল ইজার খাসা নাম মেঘমালা,
কাবাই পরিল দশ দিগ করে আলা।
পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোমর বন্ধ…[৬৬]

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,—শহরে ও গ্রামে

সমসাময়িক সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত উল্লেখে মনে এই কথাই রণিত হইয়া উঠে যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে শহরে ও গ্রামে কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। সাধারণতঃ গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণভাবে কালাতিপাত করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অবশ্য ম্লেচ্ছ আচার পরিহার করিতেন কিন্তু গ্রামস্থ মুসলমানদের সহিত সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। ক্রুদ্ধ শ্রীচৈতন্য সদলে নদীয়ায় কাজীর গৃহে চড়াও হইলে কাজী তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে নিজের প্রীতির সম্বন্ধের উল্লেখ করেন।

গ্রাম-সম্পর্কে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা,
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ স াঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা,
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।[৬৭]

অর্থাৎ গ্রামসুবাদে শ্রীচৈতন্য কাজীর ভাগিনেয়, কেননা চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁহার 'চাচা' এবং রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষাও গ্রামীণ সম্পর্ক আরও 'সাচ্চা' অর্থাৎ সত্য,

পবিত্র। ৺আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার কাজীর উক্তিকে শ্লেষ করিয়াছেন।[৬৮] অবশ্য ইহা সত্য যে কাজী আত্মরক্ষার জন্যই এই গ্রাম্য সম্বন্ধের উল্লেখ করেন কিন্তু ইহাও সত্য যে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধান সত্ত্বেও গ্রাম-সম্বাদের সম্পর্ক শ্লেষাত্মক অবজ্ঞার বিষয় নহে।

এই ঘটনার আরও একটি দিক লক্ষণীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তন-নিষেধের আজ্ঞা কি কাজী সুলতানের আদেশক্রমে জারী করেন? না কাজী নিজেই জারী করেন? যদি সুলতানই আদেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে কাজীকে তিনি চৈতন্যদেবের অহিংস প্রতিরোধ (Passive resistance) এর বিরুদ্ধে রক্ষা করেন নাই কেন? অর্থাৎ সুলতান আদেশ দেন নাই। বস্তুত অত্যুৎসাহী, অত্যাচারী মুসলমান রাজকর্মচারীর অভাব কোনসময়েই ছিল না, — না সুলতানী আমলে, না ঔরংগজেবের আমলে। এই সকল রাজপুরুষেরা ধর্মান্ধ হইয়া সকল দিক বিবেচনা না করিয়া কার্যে লিপ্ত হইত। বিচক্ষণ সুলতান তাই কাজীকে সমর্থন করেন নাই। আর অনেক সময় সুলতানের অগোচরেই অত্যাচার ঘটিত। চৈতন্য ভাগবতে এক অত্যাচারী কর্মচারীর সংক্ষিপ্ত চিত্র আছে, যার কার্যকলাপের ফলে গংগাদাস পণ্ডিতকে ম্লেচ্ছভয়ে সপরিবারে পলাইয়া যাইতে হয়।[৬৯]

গ্রামের সম্পর্ক যে শহরের তুলনায় সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল তাহার ইংগিত পাওয়া যায় কয়েকটি বিষয়ে। (১) অনেক মুসলমান হিন্দু নাম ধর্মান্তরণের পরও বজায় রাখিতেন। বিবি মালতী নামে এক মুসলিম নারী মসজিদ ও জলপানের জন্য একটি চালা নির্মাণ করেন।[৭০] এক মুসলিম তন্তুবায়ের নাম ছিল শুভোধন।[৭১] ধর্মান্তরিত হইলেও ইঁহারা পূর্বনাম পরিবর্তন করেন নাই। (২) হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ যোগদান করিতেন। এমন কি ধনী হিন্দুদিগের বিবাহে শোভাযাত্রায় মুসলমান উপস্থিত না থাকিলে তাহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত না।[৭২] (৩) কাজীগণ অনেক সময় বৈষ্ণব সংকীর্তন নিষিদ্ধ করিলেও মুসলমানেরা ইহা উপভোগ করিতেন।[৭৩] (৪) কোন কোন বৃত্তি মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল বলিয়া সকলকেই এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইত। শ্রীচৈতন্যের কীর্তন-উৎসব শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহার পরিজন দাসদাসী সংগে "যবন দরজী"ও (মুসলমান) তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করে। ৫) ফৌজে বা স্থানীয় দেওয়ানে নিযুক্ত হিন্দুগণ শিকদার বা কোটালরূপে প্রায়ই মুসলমানী শিক্ষা ও আচরণ গ্রহণ করিত। জয়ানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী তৎকালীন বহু হিন্দুরই সত্য পরিচয়।

> ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে,
> মোজা পাএ (পায়ে) নড়ি হাথে কামান ধরিবে।
> মসনবি আবৃত্তি করিবে কোন জন…

নবদ্বীপের কোটাল দুই ভাই জগাই মাধাই ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও তাহাদের আচার ছিল জঘন্য। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, "মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।" বৃন্দাবন দাসও লিখিয়াছেন —

> দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায় কোটাল,
> মদ্যমাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।
> ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জন দেখিয়া,
> মদ্যপের সংগে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া।
> এই দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়,
> পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়।[৭৪]

(গ) প্রশাসনের সাক্ষ্য

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রকৃত পক্ষে কি প্রকার ছিল তাহা জানিবার অন্যতম প্রশস্ত উপায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ। ইসলামী কানুন যাহাই বলুক না কেন, বাস্তবে অবস্থা অন্য প্রকার ছিল। সিন্ধু প্রদেশে আরবদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা 'Toleration' বা সহিষ্ণুতার ভিত্তির উপর গঠিত ছিল।[৭৫] তুর্ক-আফগান শাসন-প্রণালীতে 'উলেমা' বা মোল্লাতন্ত্রের অর্থাৎ গোঁড়ামির প্রভাব ছিল প্রবল। তবে আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ তুঘলক উলেমার প্রভাব নস্যাৎ করিতেন। বাঙলায় মুসলমান বিজয়ের প্রথম যুগের সংঘর্ষ ও বিরোধের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। সুশাসক সুলতান মুঘিসুদ্দীন তুঘরিল (তুঘরল) (১২৬৮-৮১) সর্বপ্রথম একটি জাতীয় বাহিনী সংগঠন করেন। দেশের হিন্দু-মুসলিম জাতিধর্ম নির্বিশেষে আক্রমণকারী দিল্লীর সুলতান বলবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিল।[৭৬] মুসলিম রাষ্ট্র-নিয়ম অনুসারে তুঘরিল জাজনগর লুণ্ঠন করেন ঠিকই কিন্তু ত্রিপুরা অভিযানে লুণ্ঠনের বিবরণ নাই, হয়ত ইহা বন্ধু ত্রিপুরারাজ-বংশ প্রতিষ্ঠাতা রতন-ফার রাজ্য বলিয়াই। রতনফার 'মাণিক্য উপহারের বদলে সুলতান তাঁহাকেই 'মাণিক্য' উপাধি দান করেন।[৭৭] পূর্বেই বলিয়াছি যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রজত্বকালে (১৩৪২-৫৭) তিনি শাসনকার্যে ও সৈন্য-বিভাগে হিন্দুদের নিযুক্ত করেন। এমন কি তাঁহার প্রধান উজীরও ছিলেন ভাদুরিয়া (ভাতুরিয়া) পরগনার জায়গীরদার জগদানন্দ ভাদুড়ী। হুসেন শাহও এই উদারনীতি বহাল রাখিয়া বহু গোপনীয় ও বিশ্বস্ত রাজকার্যে হিন্দুদের নিযুক্তি দিয়াছিলেন। ইহা শরিয়তী কানুন বিরোধী।[৭৮] এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রয়াত মনীষী রমেশচন্দ্র মজুমদার রাজা গণেশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে (১) দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্ব কেবলমাত্র একজন হিন্দু রাজাই গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বাংলার মুসলমানগণ বিশেষতঃ সুফী দরবেশ-প্রধান জৌনপুরের মুস্লিম সুলতানকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন; (২) গণেশ সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার পুত্র ধর্মান্তরণের জন্যই পুনরায় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।[৭৯] এই অভিমতের বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে (১) গণেশের প্রকৃত ইতিহাস এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে রাজ্য যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নহে অর্থাৎ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিম রাজ্য, সেখানে হিন্দু গণেশের রাজা হওয়াটাই ত'একটা বিরাট ব্যাতিক্রম ও হিন্দুদের পক্ষে তৎকালীন রাষ্ট্র ও সমাজে গৌরবের বিষয়। দুইশত বর্ষ ব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ব্রিটিশ রাজ্যে কই একজন ভারতীয়ও ত' 'ভাইসরয়'—'গবর্ণর জেনারল' নিযুক্ত হ'ন নাই। আর সব সুফীই যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমর্থক হইবেন তাহাও নহে। গণেশ যে গোঁড়া সুফী, শেখ, মোল্লাদের (ulama) বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন তাহার কারণ কেবল ধর্মীয় পার্থক্য নাও হইতে পারে, প্রধান কারণ তাহাদের স্বার্থ। শেখ ও মোল্লাদের অর্থ ও অত্যধিক ক্ষমতা রাজকীয় শক্তিকে রাহুগ্রস্থ করার উপক্রম করায় গণেশ তাহাদের ক্ষমতাহ্রাস করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য পাণ্ডুয়া ও মালদহের গোঁড়া মোল্লাগণ গণেশের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর, মুসলিম-দ্বেষী বলিয়া কল্পিত বিষোদগার করিয়াছেন। (২

জৌনপুর-বাংলার যুদ্ধ অনিশ্চিত হওয়ায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে সন্ধি হয় সেই অনুসারে গণেশের পুত্রের ধর্মান্তর ও সিংহাসন প্রাপ্তি গণেশের মাধ্যমেই হয়, তবে গণেশই প্রকৃত শাসনকার্য চালাইতেন ও তাঁহার শাসনে মুসলিমগণ এত সন্তুষ্ট ছিল যে ফিরিস্তা বলেন যে তাহারা গণেশের মৃতদেহ ইসলামী রীতি অনুসারে সমাধিস্থ করিতে চাহিয়াছিল।[৮০]

আচার্য মজুমদার আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে একজন হিন্দুরও রাজসিংহাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনায় সুলতানগণ উদ্বেগবোধ করিতেন। কিন্তু তিনি দৃষ্টান্ত একটিই দিয়াছেন। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের রাজা হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে উত্তেজিত সুলতান হুসেন শাহের আদেশে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে।[৮১] কিন্তু ইহার অন্য দিকও আছে। বিদ্রোহের আশঙ্কায় যে কোন শাসকই জাতিধর্মনির্বিশেষে কঠোর পন্থা অবলম্বন করিবে।

কোন কোন ঐতিহাসিক যথা ইশতিয়াক হুসেন কুরেশী ও আগা মেহদী হুসেন মনে করেন যে হিন্দুরা হিন্দু আমলের অপেক্ষাও তুর্কী শাসনকালে অধিক সুখী ছিল।[৮২] অবশ এই অভিমতেরও কোন ভিত্তি নাই। রাজস্ব-অধিকারী হিসাবে হিন্দু খুট, চৌধুরী ও মুকদ্দম (মুখিয়া, মোড়ল) উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইহাদের সহযোগ ব্যতীত প্রশাসন অচল হইয়া যাইত। বাংলায় সুলতানী আমলে হিন্দুদের যে সকল নিযুক্তি হইয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে প্রশাসকীয় মুসলিম Oligarchy কর্তৃক সিন্ধু প্রদেশের রাজস্বপদাধিকারী মহম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক রতনের ন্যায় কোন ষড়যন্ত্র হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।[৮৩] তবে ইহা নিশ্চিত যে দিল্লী অপেক্ষা বাংলায় হিন্দু-নিযুক্তি শুধু গুরুত্বপূর্ণ পদেই নহে, সংখ্যাতেও অধিক হইয়াছিল।

মুঘলযুগে আকবরের উদার রাজনীতির কথা ও হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের ইতিহাস ত' সর্বজন-বিদিত, যথা তাঁহার ঝরোখা-ই-দর্শন, দীন-ই-ইলাহী। তাঁহার প্রপৌত্র দারা শুকোও তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চেষ্টা করেন, যে জন্য সিংহাসন ত বটেই, জীবনমূল্যেও দিতে হইয়াছিল। কিন্তু বাউলদের ভাষায় 'মন্ত্র ভাষে সাধন-আকাশে।'[৮৪]

প্রশাসনিক সাক্ষ্যের আর একটি দিক রাজস্ববিভাগ গুলির নামকরণ। আইন-ই-আকবরীতে তুর্ক-আফগান যুগের শেষ পাদে বিদ্যমান ১৯টি রাজস্ব বিভাগে সরকার গুলির যে নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১০টি হিন্দুনামে ও ৯টি মুসলমান নামে অভিহিত।[৮৫] সর্বশুদ্ধ ৬৫২ মহল ছিল যাহার অধিকাংশরই হিন্দু নাম ছিল। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজস্ব বিভাগ, যেমন পরগনা, কসবা, ইহাদের হিন্দুনাম প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল। সরকার মহলগুলির হিন্দুনামের গুরুত্ব এই যে ইহা হইতে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্পর্শের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কখনও কখনও হিন্দু বা মুসলমান নামের সঙ্গে মুসলমান বা হিন্দু নাম বা শব্দ যুক্ত থাকিত যেমন রাম+গঞ্জ, রাজ+শাহী, মহম্মদ+পুর। কখনও সম্পূর্ণ মুসলিম নামও ব্যবহৃত হইত, যথা ফতেহাবাদ, ফিরুজাবাদ, নসরৎশাহী।

(খ) সমাজের সাক্ষ্য

(১) হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার ঃ সামাজিক জীবনে প্রত্যেক জাতীর ন্যায় হিন্দুরাও নারীর চারিত্রিক পবিত্রতা বা সতীত্বের উপর সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করিত। কিন্তু মুসলমান দ্বারা

হিন্দুনারীর উপর বলাৎকার, অপহরণ, অত্যাচারের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।[৮৩]

(২) **মুসলমান-হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধ ঃ** ভারত আক্রমণেরপ্রথম যুগে স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম যোদ্ধারা নারী সঙ্গে আনে নাই। বাংলাতেও নারী প্রথমে বিবর্জিতা ছিল। ইসলামে একসঙ্গে চারিটির অধিক বিবাহ অনুমোদিত নাই। তবে সমাজে দাসী-কন্যার (slave-girls) স্থান প্রশস্তই ছিল। যুদ্ধোত্তর সন্ধির একটি প্রধান শর্ত থাকিত নারীকে লইয়া। বিজিত শত্রুর সকল নারী-আত্মীয়া ছিল বিজয়ীর প্রাপ্যাংশ (ঘণিমা)। দৈহিক প্রয়োজন ব্যতীতও মুসলমানগণ হিন্দুনারীর প্রতি আকৃষ্ট হইত, বোধ হয় তাহার মানসিক সংস্কারের জন্য যে বিবাহ বিচ্ছেদ পাপ। ইহা ব্যতীত হিন্দু নারী-বিবাহ ইসলামের জয়ের ও হিন্দুদের চরম অবমাননার প্রতীক। আবার কখনও কখনও ধর্মান্তরকে বাস্তবায়িত করা হইত ধর্মান্তরিত হিন্দুর সহিত মুসলমান নারীর বিবাহ দিয়া।

তুর্ক-আফগান যুগে বাংলায় কয়েকটি উল্লেখনীয় মুসলমান হিন্দু বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, যথা,—

(ক) ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) ও বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা ফুলমতি।

সুলতান সিকন্দরের এক হিন্দু পত্নীও ছিল। ইঁহার গর্ভজাত পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ভবিষ্যতে সুলতান হ'ন।

(খ) রাজা গণেশ ও সুলতান আজম শাহের বিধবা পত্নী ফুলজানি ;

(গ) যদু জয়মল্ল (সুলতান জালালুদ্দীন) ও আজম শাহের কন্যা আশমানতারা ;

(ঘ) হুসেন শাহের কন্যা ও ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ মদন ভাদুড়ীর পুত্র কন্দর্পদেব ;

(ঙ) হুসেন শাহের একাদশ কন্যা ও মদন ভাদুড়ীর একাদশ পুত্র ;

(চ) হুসেন শাহের উজীর চতুরঙ্গ খান স্বীয় ধর্মান্তর সম্পূর্ণ করিতে মুসলিম রমণী বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র সুবি খান ও সুচি খান খুলনা জেলার সেনের বাজারে কাজী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কাজী পরিবার হিন্দুবংশোদ্ভূত বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেন।

(ছ) পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে এক ব্রাহ্মণ পীর খান জাহান আলি দ্বারা ধর্মান্তরিত হইয়া তাহের আলি নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার হিন্দু স্ত্রীর পুত্রগণ পীরালী ব্রাহ্মণ ও মুসলিম স্ত্রীর পুত্রগণ তাহেরিয়া নামে খ্যাত।

(জ) পীর খান জাহান আলি ও সোনামনি (ধর্মান্তরের পর সোনাবিবি)। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঘোড়াদীঘিতে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মুসলিম পত্নী বাঘী বিবি ঐ দীঘির পশ্চিমদিকে সমাহিত।

(ঝ) এক ফকীর সাতক্ষীরা অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে আসিয়া স্থানীয় রাজা মুকুট রায়কে যুদ্ধে নিহত করেন। রাজকন্যা চম্পাবতী (মাইচম্পা) ফকিরকে বিবাহ করিতে

বাধ্য হইলেন। সাতক্ষীরার সাতমাইল দূরে চম্পাবতীর কবর হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট তীর্থরূপে গণ্য হয়।

(ঞ) ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১) মীরা নামক হিন্দু নর্তকীকে বিবাহ করেন (মুসলিম নাম লোটন বিবি)। গৌড়ে এক মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করায় ইহা লোটন মসজিদ নামে অভিহিত হয় ও সংলগ্ন দীঘির নাম হয় লোটন দীঘি।

(ট) মুর্শিদাবাদের মুর্তজা খান বিবাহ করেন পরম বৈষ্ণব আনন্দময়ীকে। উভয়ের কবর পাশাপাশি অবস্থিত। আনন্দময়ীর পতিভক্তির উল্লেখ বহু ছড়াগানে পাওয়া যায়।

(ঠ) সুন্দরবন অঞ্চলে (মাসুদ সালার) 'গাজী মিঞার বিয়া' উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই অতীব জনপ্রিয় উৎসব। 'কালুগাজী ও চম্পাবতীর বিয়া' কিস্সায় বহু ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে।

জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিবাহ ব্যাপকহারে সংঘটিত হইত। এইসব ঘটনার পশ্চাতে বিজেতাদিগের ভূমিকাই ছিল উল্লেখযোগ্য। হিন্দু নারীদের প্রাথমিক হৃদয়-বিদারক হাহাকার হয়ত ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং এইরূপ আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহে সামাজিক ঐক্যসাধন কতদূর হইয়াছিল বলা কঠিন। হিন্দু নারী মুসলমান-বিবাহের পরও সনাতন আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে পারিত না। অনেক ধর্মান্তরিত হিন্দুও ধর্মীয় সংস্কার ও আচার-ব্যবহার বহুলাংশে সংরক্ষিত করিয়া আসিয়াছে।[৮৭]

(৩) **ধর্ম ও সমাজ ঃ** মধ্যযুগে এসিয়া বা ইউরোপে ধর্ম ওসমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত থাকিত। ভারতেও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকটেই ধর্ম ও সমাজ নিগূঢ়ভাবে বিজড়িত ছিল বলিয়া একের আলোচনায় অন্যটির প্রসঙ্গও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিকঅ নুষ্ঠানগুলির মধ্যে পার্থক্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দুরা মন্দিরে স্থাপিত মূর্তি-পূজা ও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। অন্যদিকে মুসলমানগণ মন্দির ও মূর্তি ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়া ও হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া বা তাহাতে বাধাসৃষ্টি করিয়া মনে করিতেন যে তাঁহারা পরম পবিত্র কাজ করিতেছেন। বহু দৃষ্টান্তসহ প্রয়াত আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে মুসলমান শাসনকালে হিন্দুগণ এইপ্রকার সামাজিক নির্যাতনজনিত গভীর বেদনা ভোগ করিয়াছেন ও স্বভাবতই মুসলমানদের প্রতি দ্বেষ পোষণ করিয়াছেন।[৮৮] মুসলিম শাসনের ইহা বাস্তবিকপক্ষে এক গ্লানিময় কুফল।

(৪) **মসজিদ ও দরগা ঃ** কিন্তু ইহার অন্য একটি দিক আছে। ইসলাম ধর্মে মসজিদ, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল, যেন ত্রিবেণী সঙ্গম। জয়ের পর মসজিদ নির্মাণ জয়ের জন্য আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট উপায়। বিধর্মীর মন্দির, চৈত্য, বিহার অপবিত্র বা চূর্ণ করিয়া তাহারই উপর স্বধর্মীয় মসজিদ উত্তোলন বা তাহারই গর্ভগৃহ পীর, গাজী, সুলতানদের কবর ও দরগা স্থানে পরিবর্তন উভয়ই বিশ্বাসীর পক্ষে সাধু বা পুণ্য কার্য। সুতরাং এইগুলি ইসলাম প্রসারের প্রতীক। এ হেন স্থানগুলিতেও আমরা অনেক সময় হিন্দু

সংস্পর্শের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ অনেকসময় হিন্দুবংশজাত বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন[৮৯] ও প্রাচীন আচার-ব্যবহারও সংরক্ষণ করিতেন।[৯০] কখনও কখনও মসজিদ বা দরগা পুরাতন হিন্দু নাম বহন করে। মালদহে সুলতান সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-৮৯) বিশাল আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন (১৩৬৯)। কেহ কেহ বলেন যে ইহা আদিনাথের বা শিবমন্দির ছিল।[৯১] এখানে যে বাংলায় ইসলাম প্রচারের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজা গণেশের সমসাময়িক নূর কুতুব আলমের মসজিদ ও দরগা (ছোট দরগা) একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত, তাহা ভালেশ্বরী নামে পরিচিত, কারণ তিনিই পূর্বতন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। ঐ নামে একটি তালুকও আছে যাহার আয় দরগার জন্য ব্যয়িত হয়। পার্শ্বস্থিত কুম্ভীর মূর্তিটি হারাম বা অস্পৃশ্য বলিয়া রক্ষা পাইয়াছে। ভাগীরথীর তীরে ইলিয়াসী বংশের অন্তিম সুলতান জালালুদ্দীন ফতে শাহ (১৪৮১-৮৭) গৌড়ে যে মসজিদ নির্মাণ করেন তাহা গুণবন্ত মসজিদ নামে বিখ্যাত কারণ পূর্বে উহা গুণবন্ত নামক এক ব্রাহ্মণ দ্বারা নির্মিত মন্দির ছিল। রাজশাহীতে নিমাই শাহের দরগার নামকরণ হইয়াছে ধর্মান্তরিত হিন্দু সন্ন্যাসী নিমাই হইতে। ইহা বৌদ্ধ স্তূপের উপর নির্মিত। রংপুর জেলার ডোমর গ্রামের পাঙ্গাপীর পূর্বে পঞ্চাঙ্গ নামে হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন।[৯২] চব্বিশ পরগণায় হাড়োয়া গ্রামে ধর্মান্তরিত হিন্দু বৈষ্ণব গোরাচাঁদের নামে যে মসজিদ বা আস্তানা আছে তাহা হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের তীর্থস্থান। ঘুটিয়ারী শরীফে পীরগাজী মুবারক আলির দরগা ও মসজিদও হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্থস্থান। মঙ্গলকপুরের নিকটে মহীনগরে (মাইনগরে) হুসেন শাহের উজীর পুরন্দর খানের নামে প্রতিষ্ঠিত পুরন্দর খান অথবা গোপীনাথ বসুর মসজিদ এখনও বর্তমান।[৯৩] সুন্দর বনের 'ব্যাঘ্রদেবতা' দক্ষিণ রায় ছিলেন এক হিন্দু সেনাপতি। তাঁহার কীর্তিকলাপ মুন্সী জৈনুদ্দীনের পুঁথিতেও 'বনবিবির জহুরানামা' কহানীতে চিরন্তন হইয়া আছে। এই কহানীতে তাঁহাকে 'গাজী' উপাধি দেওয়া হইয়াছে; 'বরখান গাজীর' দরগাও আছে। ধবধবি গ্রামে বেদীর উপর সামরিক পরিচ্ছদ-পরিধৃত তাঁহার মূর্তির সম্মুখে প্রতি শুক্রবার মুসলমানগণ নমাজ পড়ে। হিন্দুরাও তাঁহাকে পূজা করে গণেশের মন্ত্রে, কারণ ইহা ব্যতীত পূজার অন্য কোন পদ্ধতি নাই।[৯৪] গত চারিশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের এই যুগ্ম দেবতা-গাজীর সম্মানে উভয় সম্প্রদায়ের এক সমবেত পবিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মীকান্তপুরে মণিবিবির নামে একটি কবর ও ছোট মসজিদ আছে। সম্ভবতঃ পূর্বে তিনি হিন্দু ছিলেন ও মন্দির নির্মাণ করেন যাহা পরে মসজিদে পরিণত হয়। গোবরডাঙ্গায় পীরঠাকুরবরের আস্তানা অবস্থিত।[৯৫] জনশ্রুতি এই যে মুকুটরায় বরখান গাজীর নিকট পরাজিত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রামদেব গোবরডাঙ্গায় আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছিলেন ও ধর্মান্তরের পর পীর ঠাকুরবর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নামের প্রথম শব্দটি মুসলিম, দ্বিতীয়টি হিন্দু। পীরের মৃত্যুর পর মসজিদ ও কবরের মুতওয়াল্লী ফলফুল বিল্বপত্রের দ্বারা প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার অর্চনা করিত ও দ্বিপ্রহরে সংলগ্ন মসজিদে নমাজ পাঠ করিত। গোবরডাঙ্গায় 'ওলাবিবির স্থান'ও এক বিখ্যাত পীঠস্থান। ওলা দেবী মারাত্মক বিসূচিকা রোগের দেবী বলিয়া ভীত মুসলমানগণ তাঁহাকে 'ওলাবিবি' রূপে পূজা করিতে থাকে। 'ওলা' শব্দও বিশুদ্ধ হিন্দু শব্দ।

কখনও কখনও মসজিদের গাত্রে হিন্দু দেবতার মূর্তি প্রোথিত থাকিত। মালদহে

আদিনা মসজিদের চতুর্দিকে দেবদেবীর বিগ্রহের ভগ্ন ও অভগ্ন অংশ বিক্ষিপ্ত ও প্রোথিত, বা বাটখারা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাবনা জেলার চাটমহর মসজিদের গাত্রে বহু হিন্দু দেবতার মূর্তি সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাকশাল বংশীয় এক পাঠান আমীর ইহা নির্মাণ করেন।

আবার কখনও কখনও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই কবরে ফলফুল শিরণি প্রভৃতি অর্ঘ্য দেয়। যথা কালনা কাছারীর নিকট প্রাচীন দুর্গাবশেষের পাশে বদর সাহেব ও মজলিম সাহেবের যে দুইটি কবর আছে সেখানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে লোক আসিয়া ফলফুল, শিরণি ও খেলনা ঘোড়া প্রভৃতি অর্ঘ্যদান করে। যশোহরের ১০ মাইল দূরে সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফরখানের পুত্র বড় খান গাজী একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে গাজীর সম্মানে মুসলমান ব্যতীত হিন্দুরাও অনেক সময় শিরণি প্রদান করে।[৯৬]

(৫) **মহরম ঃ** মহরমের উৎসব মুসলমান জনমানসে গভীর আবেগের সৃষ্টি করিত। পুঁথিসাহিত্যে, কারবালার করুণ কাহিনী বিজড়িত জারি গান ও আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহরমের সময় বাংলা ও বিহারের মুসলমান প্রধান গ্রামগুলিতে তাজিয়ার শোভাযাত্রা বিশেষ জাঁকজমক, আড়ম্বরও শোকের সঙ্গে পরিচালিত হইত। অষ্টাদশ-উনিশ শতকের মুসলমান সংস্কারকেরা ইহাকে পৌত্তলিকতার প্রভাবাধীন ও ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহারা ইহার মধ্যে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন ও রথযাত্রার প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইমামবাড়াগুলিতে যে মূকাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত তাহার সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। পাটনা ও বিহার শরীফ অঞ্চলের ১৪০০ তাজিয়ার শোভাযাত্রার মধ্যে ৬০০টি হিন্দুগণের দ্বারাই পরিচালিত হইত।[৯৭]

(৬) **স্থানীয় লোকাচার ও কুসংস্কারের উদ্বর্তন (Survival) ঃ** সাধারণ হিন্দু অথবা মুসলমান নাগরিকের জীবন—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত-স্থানীয় বাধিনিষেধ, লোকাচার ও সংস্কারের দ্বারা পরিবৃত ছিল। ভারতীয় মুসলমানেরা হিন্দুদের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। নাজুমী অর্থাৎ জ্যোতিষীর গুরুত্ব সমাজে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে ছিল। সর্বস্তরের মানুষ যে কোন উপলক্ষ্যে নাজুমীর পরামর্শ গ্রহণ করিত। মীরকাশিম জ্যোতিষীদের দ্বারা তাঁহার পুত্রের ঠিকুজী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। জ্যোতিষীর পরামর্শেই বিবাহসংক্রান্ত আলোচনার চূড়ান্তরূপ দেওয়া হইত।[৯৮]

জাফর শরীফ লিখিয়াছেন ভারতীয় মুসলমানগণ অনিষ্টকারী ভূতপ্রেতের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকিত। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই এই জাতীয় কুসংস্কারে অধিক বিশ্বাসী ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অথবা শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কালে হিন্দুনারীদের ন্যায় মুসলমান রমণীগণও নানাবিধ কুসংস্কারগ্রস্ত অনুষ্ঠান পালন করিত। অজ্ঞ মুসলমানগণ অনেক সময় কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় মৃত হিন্দুর ভগ্নাবশেষ ব্যবহার করিত। মানুষের ভাগ্য নির্ণয়ে চন্দ্রের যে বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিত।[৯৯]

পাঞ্জাব, বিহার, বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরাও শীতলা দেবীর পূজা করিত। ওলাউঠা রোগের আক্রমণ এড়াইতে হিন্দুগণ ওলা দেবী ও মুসলমানগণ ওলা বিবির অর্চনা করিত। জয়নগর এলাকার রক্তখান অঞ্চলে ঐ দেবীর পূজার বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। মাতৃ অথবা উম্-ই-সিরিয়ান নামক হূরীকে (spirit) হিন্দু ও মুসল-

মান মাত্রেই ভয় করিত। ইহারই কারণে দেড় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের তড়কা হইত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। শিশু জন্মলাভের পর ছুটিঘরে বা অশুচিঘরে বা সূতিকাগৃহে ; সুন্নতের উৎসবে ; কন্যার ঋতুকালে ও বিবাহের সময় বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান পালন করা হইত যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে স্থানীয় লোকাচার ও দেশাচার বাঙালী মুসলমান সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণ অথবা স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও কবরস্থ করার ঘটনা ; শিশুকন্যাকে হত্যা এবং হিন্দু ও মুসলমান ভক্তগণ ১৮৩৬ সালেও মনোহরনাথের মন্দিরে পূজা দিয়াছে।[১০০]

ঐস্লামিক বিবাহের অনাড়ম্বরতা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া তাহার স্থলে জাঁকজমক, গীতবাদ্য, নৃত্য, পানাহার প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম কর্তৃক বিশেষরূপে নিন্দিত পণপ্রথারও মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে। পাত্রপক্ষেরা যে অতিরিক্ত পরিমাণে পণ প্রদান করিতেন চতুর্দশ শতকে বিহারের সন্ত তাহার সমালোচনা করেন। সিপাহসালার উসমান তাঁহার কন্যার বিবাহে ৪০,০০০ টঙ্কা দাবী করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতিতে কিছু কিছু পার্থক্যও ছিল। কন্যার জন্ম হিন্দু ও মুসলমান কোন পরিবারেই সুনজরে দেখা হইত না অনেক মুসলমান পরিবারে লালন-পালনের হাঙ্গামা ও খরচ এড়াইতে কন্যাকে মারিয়া ফেলা হইত। ইসলামের সমর্থন সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের প্রভাবে বহু ভারতীয় মুসলমানগণ বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতেন না। শ্রীমতী হাসান আলি ১২ বৎসর এদেশে বসবাস করিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন যে তিনি একটিও বিধবা বিবাহের ঘটনা শুনেন নাই ; বরং বহু মুসলমান রমণীর বাগদত্ত পুরুষের মৃত্যুর পরে একাকী জীবন অতিবাহিত করার কাহিনী শুনিয়াছেন।[১০১]

(৭) **মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ প্রথা (Castcism) ঃ** ঐস্লামিক দর্শন ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সাম্যের শিক্ষা দেয়। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রাহ্মণদের জাতিভেদ প্রথা ও রাজপুতদের ন্যায় পদমর্যাদাবোধ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ ফিরজ তুঘলকের আমলে লিখিত 'ইনশা-ই-মাহরু'তে উধৃত এক ঘোষণাপত্রে (১৩৫৩) পাওয়া যায়। (ক) সাদাৎ, মশেখ প্রভৃতি, উলেমা ; (খ) খাঁ, মালিক, উমারা, সদর, আকাবির, মা'রিফ ; (গ) 'খ' এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনুচর ; (ঘ) জমিদার, মুকদ্দম, মফেরুজমান (মাফরুজিয়ান ?), মদকান (মালকান ?' প্রভৃতি ; (ঙ) সাধু, সন্ত ও 'গবর' (বোধহয় অগ্নি-উপাসক অথবা বিধর্মী)।

এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ ইসলামী কানুনে সমর্থন লাভ না করিলেও ইহা প্রতীয়মান হয় যে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করে এবং কোন কোন এলাকায় শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একত্রে ভোজন ও অসবর্ণ বিবাহ ও আইনতঃ নিষিদ্ধ না হলেও বাস্তবে বাধা উপস্থাপিত হইত। সৈয়দ, শেখ, মোগল, ও পাঠানগণ যে আশরফ অর্থাৎ অভিজাতরূপে গণ্য হইত তাহা হিন্দু প্রভাবের জন্যই। এই চারি বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ খুবই অস্বাভাবিক ছিল ; এমন কি একই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন শাখার মধ্যেও বিবাহ বড় একটা হইত না। পূর্ণিয়াবাসী মোগলদের চার পাঁচটি "ফৌমে"র মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহের চল ছিল না।

সামাজিক কারণ ছাড়াও হিন্দুদের ন্যায় বৃত্তিগত কারণেও বর্ণ বৈষম্যের সৃষ্টি

হইয়াছিল। কোন একটি পেশায় বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ একটি বিশেষ বর্ণ বা জাতের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। বিহার ও পাটনা অঞ্চলে বুকানন (Buchanan) পেশাগত কারণে সৃষ্ট ৩৮ টি জাতের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—তাঁতি, দর্জি, জরির নির্মাতা প্রভৃতি। কিন্তু এই নিম্নবর্গের লোকেরা উচ্চশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করিতনা। বিহার ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বর্ণভেদ প্রথা এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে অসংখ্য বৃত্তি বা পেশার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাহার আধিপত্য শিথিল হয় নাই।[১০২]

উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনুধাবন করিতে হইলে মসজিদ, কবর, দরগা, ও স্থানীয় কথা ও কাহিনী-গুলির ইতিহাস লইয়া গবেষণা প্রয়োজন। রাজনীতির কুটিল চক্রের বাহিরে, শরীয়তী-বিহিত জটিলতার উর্ধ্বে, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ধারায় যে গভীর একটি সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার কিছুটা আভাষ আমরা এই সকল বিক্ষিপ্ত, টুকরা টুকরা ঘটনা হইতে পাই। এই গবেষণা গভীর হইলেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপরও সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করা সম্ভব হইবে।

(ঙ) ধর্মের সাক্ষ্য

এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, অনুধাবনের জন্য তৎকালীন বেদ-উপনিষদ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণেতর ধর্ম ও ইসলামের স্বতন্ত্ররূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে ধর্মের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ নিগূঢ় এবং সাহিত্যের সাক্ষ্য বুঝিতে হইলে ধর্মীয় অবস্থার উল্লেখ আবশ্যক হয়।[১০৩]

(১) **হিন্দুধর্ম ঃ** বৈদিক যাগযজ্ঞে ও কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস পূর্বেই শিথিল হইয়াছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তবে কেহ কেহ সাধারণের ধর্মঠাকুর পূজায় বৌদ্ধ-ধর্মেরই প্রভাব বা শেষ দেখিতে পান। বাংলায় জৈনধর্মেরও ভবিষ্যৎ প্রায়ান্ধকার। আপামর জনসাধারণের মধ্যে শৈব-শাক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বেশীরভাগ পূজ্য দেব-দেবী পঞ্চদশ শতক শেষ হইবার পূর্বেই জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। তান্ত্রিক ধর্মমতও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তান্ত্রিক গুহ্য উপাসনা প্রচলিত ছিল।[১০৪] স্মৃতিগ্রন্থেও তান্ত্রিক সহজমতের দেবদেবীর পূজা স্বীকৃত হয়। সমাজের নিম্নস্তরের উপাস্যা হইলেন মনসাদেবী (বিষহরি, বিষধরিকা)।[১০৫] দুর্গা বা চন্ডীপূজা বহু প্রাচীন[১০৬] হইলেও তান্ত্রিক প্রভাবে দুর্গা[১০৭] ও কালী পূজা বাঙালীদের মধ্যে প্রধান উৎসবে পরিণত হয়। তান্ত্রিক মতেই গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হইত,—যথা বাসুলী, চণ্ডিকা, ক্ষেত্রপাল, মঙ্গলচণ্ডী, বনদুর্গা ইত্যাদি।[১০৮]

শিলামূর্তি ও দশাবতারের মূর্তিতে বিষ্ণুপূজাও প্রাচীন। গোপালমূর্তির পূজা প্রচলিত করেন পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্যগণ। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ হইতে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তির উপাসনার প্রবর্তন করেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা। এই সময়েই গৌর-নিতাই মূর্তির পূজা প্রচলিত করেন শ্রীখন্ডের নরহরি সরকার ও আম্বুয়াকালানের (অম্বিকা কালান বা কালনার) গৌরীদাস পন্ডিত।[১০৯]

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শক্তি-পূজার ভক্তিরস সঞ্চারিত হইল। তান্ত্রিকতা

লুপ্ত হইল না বটে তবে রূপান্তরিত হইয়া গেল। উপাস্যের প্রতি উপাসকের ভক্তি ভীতির উপর নয়, বাৎসল্য-প্রীতির উপর স্থাপিত হইল।[১১০]

প্রাচীন গ্রাম্য পীঠস্থান গুলির মাহাত্ম্য বাংলায় বরাবরই স্বীকৃত। গ্রামীণ দেব দেবী-দের বন্দনা না করিয়া মনসা ও চণ্ডী মঙ্গলের পাঁচালী কাব্যের গায়কেরা পালা আরম্ভই করিতেন না। ধর্মমঙ্গলের কবিগণও ইঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন, কাব্যের দিগ্‌বন্দনায় গ্রাম্যপীঠগুলির পরিচয় দিয়াছেন।[১১১]

(২) সুফীবাদ ও তাহার অবদান ঃ

মধ্যযুগে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুফীগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। সুফীবাদ মধ্য ও পশ্চিম এসিয়া হইতে এদেশের শহরে ও গ্রামে আসিয়াছিল। ইহার মূল কথা এই যে ভগবদন্বেষক হইলেন এক পথিক (সালিক); সুফীগণ তাহাকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান দান করেন এবং এক পথে (তরীকায়) বিভিন্ন আসরের (মকামাৎ) ও বিভিন্ন দশার (আহ্‌ওয়ালের) মাধ্যমে ঈশ্বরের সহিত সংযোগলাভের উদ্দেশ্যে (fana, বিলুপ্তি) পরিচালিত করেন। ইহারই পরের ধাপ হ'চ্ছে নিত্যতা (baqa)। কোন কোন সুফী স্থানীয় রাজাদের বিরুদ্ধে মুসলিম শক্তিবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন বা সুলতানদের রাজনীতি প্রভাবিত করিয়াছিলেন ও রাজনৈতিক ঘটনার সহিত যুক্ত ছিলেন। সেজন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে হিন্দুদের শত্রু বলিয়া মনে করেন। অনেক সুফীসন্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করিতেন। বাস্তবে সেই সময়ে ধর্মশিক্ষাও ছিল শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। মৌলানা তকীউদ্দীন ও মৌলানা সফুদ্দীন আবু তওমা (ত্রয়োদশ শতাব্দী) খানকাগুলিতে জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিতেন। কাজী রুকনুদ্দীন মহম্মদ সমরকন্দীর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করিয়া ভোজর ব্রাহ্মণ নামে এক যোগী ইসলামী বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টের মতে বিখ্যাত সন্ত নূর কুতুব আলম একটি মাদ্রাসা (বা কলেজ) ও হাসপাতাল স্থাপিত করেন কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

তাঁহাদের নিরুপম চরিত্র, সরলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আড়ম্বর-হীন জীবন মানুষকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিত। সাধারণে বিশ্বাস করিত ইঁহারা অলৌকিক শক্তি-ধারী। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারিতেন, ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন এমন কি মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান বা ঈপ্সিত ব্যক্তির প্রাণনাশও করিতে পারিতেন। ইহা ব্যতীত এই সকল সুফী সন্তগণ লোকহিতকর কার্যও করিতেন। তাঁহারা গরীব, অসুস্থ ও সহায়হীনদের সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের খানকাগুলি (hospices) ও অতিথিশালাগুলি বিত্তহীন, বন্ধুহীন, সন্ন্যাসী ও পর্যটককে আশ্রয় দান ও খাদ্য বিতরণের জন্য সদা সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। জীবদ্দশায় যাঁহারা এইরূপ জনহিতকর কার্যের জন্য প্রণম্য হইয়াছিলেন মৃত্যুর পর তাঁহাদের দরগাগুলিও সমভাবে জনসাধারণের ভক্তি আকৃষ্ট করে ও তীর্থস্থানে পরিগণিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের রচনা বলিয়া খ্যাত (ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত) 'সেক শুভোদয়' শেখ জালালুদ্দীন তব্রেজীর জীবনী। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে অনেকেই শেখের অনুগামী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সুস্থ করিলে সে তার স্ত্রী মাধবীর সহিত তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। রাজার ৪ জন অধিকারী শেখের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য অন্ধত্বের ভান করিয়া চিকিৎসার জন্য গিয়াছিল। তাহারা সত্য সত্যই অন্ধ হইয়া গেলে তাঁহার নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পায় ও সপরিবারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। এইরূপে শেখের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজা লক্ষ্মণ সেনও তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

অন্য একটি কারণেও মুসলিম সন্তগণ জনসাধারণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন। অধিকাংশ দরগাগুলিই পুরাতন পবিত্র ভবনগুলির উপর নির্মিত ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানে সৈয়দ সুলতান মাহীসওয়ারের দরগা এক শিবমন্দিরের উপর স্থাপিত। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে বৌদ্ধ মঠের উপর সত্যপীরের ভিটা প্রতিষ্ঠিত। 'সেখ শুভোদয়ে'

উল্লিখিত আছে যে মুসলিম সন্তগণের সহিত বিতর্কে স্থানীয় সাধুগণ যাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন তান্ত্রিক গুরু,—পরাজিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বিজিতদের টিলার উপর নির্মিত আশ্রমগুলির উপর বিজয়ী সন্তের দরগা স্থাপিত হইয়াছিল। আশু বিশ্বাসকারী জনসাধারণের উপর এই সকল গুরুদের এক নিগূঢ় অধিকার বা দখল ছিল। গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের কাছে যাইত মোক্ষলাভের আশায়, দুঃখকষ্ট প্রতিকারের আশায় ও সান্তনার আশায়। তাঁহাদের ধর্মান্তরণের পরও তাঁহাদের আশ্রয়-স্থানগুলি, মুসলমান সন্ত দ্বারা অধিকৃত হইলেও, তীর্থস্থান রহিয়া গেল। জনসাধারণ শুধু নামেই ধর্মান্তরিত হইল, ইসলামের জ্ঞান সামান্যই হইল, কিন্তু তাহাদের পূর্বের ভাষা রহিয়া গেল ও স্থানীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাস এবং জীবনধারা পুরাতনের মতই চলিতে লাগিল। এইরূপে বাংলায় ইসলামের সহিত স্থানীয় মূল সূত্রগুলি মিশিয়াই রহিয়া গেল।

(২) বাংলায় ইসলামের রূপান্তর—লোকপ্রিয় ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলামের পূর্বে এদেশে বিজেতারূপে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম আপন ক্ষমতার বলে তাঁহাদের স্বসমাজে গ্রহণ করিয়া নিজ সংস্কৃতির সহিত মিলাইয়া লইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তথাপি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই দুই সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করে ও পরস্পরের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা ও বিহারে একটি জনপ্রিয় ধর্মমতের বিকাশ হয়। এই দুই প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যাও অন্যান্য অনেক অঞ্চল অপেক্ষা অধিক ছিল। এই অঞ্চলে মুসলমান-দের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন হিন্দুধর্মের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়। হিন্দুদের লোকাচার, দেশাচার ও পালপার্বণের রীতিনীতি কোরাণের মতবাদের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে। পরস্পরকে গ্রাস করিতে সক্ষম না হইলেও নিঃসন্দেহ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় হইয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় এত দূর ঘটিয়াছিল যে উনিশ শতকের গোড়ায় লিখিত আহমদীয় সম্প্রদায়ের "হিদায়ৎ-উল-মোসিনিন" গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে হিন্দুস্থানে ইসলাম ও কাফের যেন খিচুড়ির ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে। অন্য কোন মুসলমান প্রধান দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।[১২]

ভারতীয় মুসলমান সমাজের এই রূপান্তর বহুবিধ কারণেই সম্ভব হইয়াছিল। ইসলাম ধর্মের অনাড়ম্বরতা ও একেশ্বরবাদ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সহজবোধ্য ছিল না। ইহারা এতদিন পৌত্তলিকতা ও বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত ছিল। বঙ্গদেশের মুসল-মানগণ ইসলামের কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল; এবং মুসলমান বিজেতারা এই অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতিসমূহের সম্মুখীন হ'ন। বহিরাগত ও বিজেতা মুসলমানেরা বঙ্গদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন ও শত্রুভাবাপন্ন জনসাধারণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের বৈরী মনোভাব দূর করিতে ধর্মান্তরণ অথবা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই স্থানীয় লোকাচার ও দেশাচারের সহিত একটি আপোসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বঙ্গদেশে ধর্মান্তরণ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই, এবং অতীতের ধর্মবিশ্বাস-কেও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, পূর্ব ধর্মবিশ্বাস, দেশাচার ও লোকাচার দ্বারাই পরিচালিত হইত। ১৯১১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে এক ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে যাহারা "হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে, বরং দুই সম্প্রদায়ের এক সংমিশ্রণ॥" কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী ঔলেচাঁদ (মৃত্যু ১৭৬৯) নদীয়া জেলায় "সত্যধর্মের" প্রচার করিতেন এবং হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমান অধ্যুষিত এক গ্রামের মুকদ্দম একজন খৃষ্টান পাদ্রীকে বলিয়াছিলেন যে পয়গম্বর মহম্মদ এক বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসবর্ণ

বিবাহের ফলে অথবা হিন্দু দাসী-কন্যার প্রভাবে "মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদেশী ও স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানের মিশ্রণ ঘটিতেছিল।" একাধিক শাসকের উদারনীতির ফলেও দুই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। Garcin de Tassy র মতে স্থানীয় পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়াই ইসলাম এই মিশ্রণ অনুমোদন করিতে বাধ্য হয়।[১১৩]

কারণ যাহাই হউক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে যে ইসলাম ধর্মের প্রচলন দেখিতে পাই তাহা বহুলাংশে স্থানীয় দেশাচারের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে নৈষ্ঠিক ইসলামও এদেশে পালিত হইত, বিশেষতঃ মাদ্রাসা ও মসজিদ-গুলিতে। হাদিস (hadis) ও ফিক্‌হ্‌ (fiqh) উপর পুস্তক রচিত হইয়াছিল। অনেকেই রমজানের উপবাস উদযাপন করিতেন।[১১৪]

(ক) পীর পূজা ঃ

মধ্যযুগীয় ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার যে সকল দৃষ্টান্ত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে পীর পূজা অন্যতম। ভারতীয় মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ইহা এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও বঙ্গদেশে প্রচলিত লোক প্রিয় ইসলামের সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ উদাহরণ। প্রতি শহরে বা গ্রামে পীরের পূজার প্রচলন ছিল। 'পীর' কথার অর্থ 'প্রাচীন'। পীর বলিতে এক 'অতীন্দ্রিয় পথপ্রদর্শক' (শাহ, শেখ, মুরশীদ অথবা ওস্তাদ) অথবা সুফীকে বুঝায় যিনি শিষ্য (মুরীদ)দের দীক্ষা দেন ও গূঢ় ধর্মীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। পীরেরা প্রত্যেকেই সুফী ছিলেন যদিও সুফী মাত্রেই পীর হইতেন না। সন্তদের প্রতি এই গভীর বিশ্বাস ও তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত বেদীসমূহ (shrines) শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের যে প্রথা তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে হয় নাই। আফগানিস্তান, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে বহিরাগত মুসলমানদের আগমন হয় তাহারাই এই ধর্মীয় প্রথার আমদানী করে। ভারতবর্ষেও অবশ্য কতকগুলি প্রথা বর্তমান ছিল যে কারণে এদেশের মুসলমান সমাজে সন্তপূজার প্রচলন সহজসাধ্য হয়। হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সহিত বিদেশী মুসলমানগণ বহুকাল একত্রে বসবাস করার ফলে এই প্রথা সমাজের গভীরে প্রবেশলাভ করে। স্থানীয় দেবদেবীর পূজাও ইহার প্রসারে সহায়ক হয়। Garicn de Tassy (১৮৩১) এই মত পোষণ করেন যে এই সন্তগণ (হিন্দুস্থানে যাঁহারা 'পীর' বা 'ওয়ালী' নামে পরিচিত) অসংখ্য হিন্দুদেবতার পরিবর্তে নিজেদের মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন।···মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত এই সন্তদের মধ্যে একাধিক বৈদিক ধর্মের অনুগামীও ছিলেন। হিন্দুরাও মুসলমান সন্তদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন। মুঙ্গেরস্থিত শাহ লোহাউমির ও পশ্চিম পাটনার শাহ আরজানীর সমাধিস্থলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। 'পীর-মুরিদী' সম্পর্কের মধ্যেও পূর্বতন 'গুরু-চেলা' সম্বন্ধের নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ পীরের মধ্যে তান্ত্রিক গুরুর মিল খুঁজিয়া পায়, এবং তাঁহাদের সমাধি ও দর্গাসমূহের মধ্যে বৌদ্ধযুগের চৈত্য ও স্তূপের সাদৃশ্য দেখিতে পায়। মুসলমান সন্তগণ ইচ্ছা করিয়াই হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে দর্গা ও খানকা নির্মাণ করিতেন।[১১৫]

সাধু সন্তগণ ত' সব সময়েই সম্মানিত। প্রাচীন কালে মুসলমান সেনাপতিগণও যুদ্ধে নিহত হইলে গাজী-পীর রূপে পূজিত হইতেন। ক্রমশঃ এই সকল পীরস্থানের

মাহাত্ম্য হিন্দু জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত হইল। ধর্মমংগল, চণ্ডীমংগল, মনসামংগল প্রভৃতি কাব্যে রচিত দিগ্‌-বন্দনায় বাঙলার পুরাতন পীর ও পীরস্থানের উল্লেখ আছে।[১১৬] অর্থাৎ হিন্দু লৌকিক সাহিত্যকারগণ মুসলমান পীর ও তৎসংক্রান্ত স্থান গুলিকে মঙ্গল-কাব্যেও স্থান দিয়াছেন। ইহা কি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের এক অকাট্য নিদর্শন নহে? যে সকল ঐতিহাসিকগণ কেবল মাত্র অতিরঞ্জিত ইসলাম গৌরব-মণ্ডিত কাহিনীর যাথার্থ্য পরীক্ষা না করিয়া বা আইনগত সিদ্ধান্ত বাস্তবিক ক্ষেত্রে কার্যে পরিণত হইয়াছিল কিনা বিচার না করিয়া এই যুগে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহাদের অভিমত অন্ততঃ আংশিকভাবে ভ্রমাত্মক। কালের অমোঘ প্রভাবে মুসলিম-বিজয়ের প্রথম যুগের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়াছিল। তাহা না হইলে লৌকিক ধর্মকাব্যে এই প্রকার বন্দনার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত না।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সীতারাম দাসের বন্দনা উদ্ধৃতির যোগ্য, যথা—

বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারনে।
বাঘ মহিষ কাননে বাস পালে পাল,
মান্দারন গোড়েতে যাহার জাঙ্গাল।
গড় মাঝে বনাল্য আঠার গণ্ডা কোট,
তাহার চরণ বন্দো ভূমে হয়্যা লোট।
দারাবেগ ফকীর বন্দিব নিগাএে,
জোড়হাথে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সুফী খাএে।
বড় পঁতরায় বন্দ পীর কুতুব আলম,
তাহার দরগা দিয়া নাহি চলে যম।
রাইপুরের গোরাচান্দ নানপুরে নাল,
বন্দিব সাহেব-দুল্লা শিরে বান্ধ্যা শাল।

সংহতি বস্বানি বন্দো ভালকির পীর,
বদর আলম বন্দো সাগরে জাহির।
ত্রিপিনির পীর বন্দো দফর খাঁ গাজি,
হুগলীর হিংগা বন্দো দিল হয়্যা রাজি।
কোট শিমুলের পীর বন্দো হয়্যা সাবধান,
নদীর গায়ে বসিয়া দুনিয়া পানে চান।
বন্দিব................করি কৃতঞ্জলি,
হিজলির বন্দিব তাজখাঁ মছন্দলি।
পেকাম্বর মোকাম করিল যার হেটে,
ফর্জন্দ পয়দা লৈল কেউটালের পেটে।
নাম তার তাজখাঁ থুইল পেকাম্বর,
অধিকার দিল তারে দরিয়া ডফর।
জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল,
দশ যোজন দরিয়া হুকুমে পাছু হৈল।
পাতশাই পুত্ররে দিয়া গেল পেকাম্বর,

বিরাম শক্করা বন্দো বর্দ্ধমান ভিতর।
পেকাম্বর মদার আউল্যা, শাহাজির;
গতিমান হইয়া বন্দিব সত্যপীর।[১১৭]

জনগণ বিশ্বাস করিতেন যে সুফী ও পীরেরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় মুসলমান সমাজে এই বিশ্বাস ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা পীরগণের সহায়তা ও অনুগ্রহ কামনা করিতেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত কবচ ও মাদুলীর সাহায্যে বিপদ এড়াইবার প্রয়াস করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ব্যাঘ্র ও চিতাকে পীরগণের প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন। সুন্দরবনের মুসলমান ভক্তরা দাবী করিতেন যে ব্যাঘ্রের কোপ এড়াইবার যাদুমন্ত্র তাঁহাদের জানা আছে। তাঁহাদের কৃপালাভের আশায় হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ খাদ্যদ্রব্য ও কড়ি উপহার দিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট রাখিতেন।[১১৮] অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ যে পীরকে অথবা মৃত পীরের আত্মার প্রতি নৈবেদ্য ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিবেন ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছু নাই। মুসলমান জনসাধারণ অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির চাইতে সন্তপীর গণের পূজাতেই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন যাহার ফলে পীরদের দর্গাসমূহ ধীরে ধীরে তীর্থস্থানে পরিণত হয়। অনেকসময় প্রশাসকেরাও এই দর্গা সমূহ নির্মাণ করিয়া দিতেন এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেন।[১১৯] যে দর্গাগুলিতে সন্তদের দেহাবশেষ সংরক্ষিত রহিয়াছে (যেমন গোরখপুরের মনসুরগঞ্জে আবদুল কাদিরের দর্গা) সেগুলির প্রতি হিন্দু-মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। মসজিদ অপেক্ষা সন্তদিগের সমাধিস্থলেই অনেক সময় অধিক জনসমাগম হইত।[১২০] দর্গাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা স্থানীয় অভিজাতেরা মহৎ কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু প্রথার অনুকরণে বিভিন্ন আকারের দণ্ড বা বল্লমে প্রতীক হিসাবে পতাকা লাগাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তবৃন্দ দর্গায় আসিত, প্রার্থনা জানাইত ও নৈবেদ্য অর্পণ করিত। হিন্দুদের তীর্থস্থানগুলির ন্যায় দর্গায় অনুষ্ঠিত মেলাতেও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আগমন হইত। প্রকৃত ভক্তরা ছাড়াও গায়ক, বাদ্যকর, যাদুকর, বাইজী, নিষ্কর্মা, চরিত্রহীন, ধূর্ত ও প্রতারকেরাও ভিড় জমাইত। যে মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া হিন্দুরা পুরী ও বৃন্দাবনে যায়; মুসলমান তীর্থযাত্রীরাও সেই একই কারণে পবিত্র দর্গাসমূহে জমায়েৎ হইত, অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও কোন ইচ্ছা পূরণের অভিলাষে, অথবা নিতান্তই পার্থিব সুখের কামনায় যথা পুত্র লাভ, স্বাস্থ্যো-দ্ধার, ভাগ্যান্বেষণ, কিম্বা উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষায়।[১২১] জীবিত পীরের প্রতি মুসলমান ভক্তের শ্রদ্ধার সহিত গুরু ও গোসাইয়ের প্রতি হিন্দুশিষ্যের ভক্তি প্রদর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পীরের সম্মুখে মুরীদদের সিজদার সহিত গুরুর প্রতি হিন্দু শিষ্যের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের তুলনা করা চলে। গোঁড়া মুসলমানেরা ইহাকে অত্যন্ত গর্হিত আচরণ বলিয়া গণ্য করিতেন।[১২২]

(খ) পদ চিহ্ন ঃ

একাধিক মসজিদে পয়গম্বর মহম্মদের পদচিহ্ন (কদম রসুল) রক্ষিত আছে যেমন (ঢাকার পূর্বদিকে লখ্যা নদীর তীরে)। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির, বধমান জেলার 'ধর্মপাদুকা' এবং গয়ালী ব্রাহ্মণদের 'মুতাওয়ালী'র সঙ্গে এই প্রথার তুলনা করিতে পারা যায়। গৌড়ের কদম

রসুলের প্রাসাদ আজও বর্তমান। মুয়াজ্জমপুরের শাহ লঙ্গরের দর্গায় তাঁহার পদচিহ্ন দর্শন করিতে প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত। উত্তরবঙ্গের পীরগঞ্জে ইসমাইল গাজীর দেহাবশেষের উপর স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হয়।[১২৩]

(গ) গূঢ় ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (mystic cults) ঃ

কোন কোন পীর বা কাল্পনিক চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী ও উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকারের অতীন্দ্রিয় পূজা পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ইহা বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করে।

(১) খোয়াজা খিজির সম্পর্কে এই কাহিনী প্রচলিত ছিল যে তিনি জীবন স্রোতের উৎস সন্ধান করিতে সক্ষম হন। তিনি কুশলী ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন ও নাবিকগণকে নৌকাডুবি হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। ভাদ্রমাসে হিন্দু ও মুসলমান নাবিক ও মৎস্যজীবীরা নদী বা জলাশয়ে প্রদীপ ভাসাইয়া ইঁহার পূজা করিত (খওয়াজ, বেরা বা ভেরা প্রভৃতি নামে খ্যাত)। সিরাজ উদ্‌দৌলা এই অনুষ্ঠান পালন করিতেন জানা যায়। কয়েক বৎসর পরে (১৭৮০-৮৩) মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী বক্ষে উইলিয়ম হজেস (Hodges) এই উৎসব দেখিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[১২৪]

(২) পীর বদর নামে অন্য এক জলদেবতার কাহিনী প্রচলিত আছে। যাত্রার প্রাক্কালে অথবা প্রবল ঝঞ্ঝার সময় নাবিক ও মৎস্যজীবীরা এই দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে দর্গা নির্মাণ করিয়া তিনি 'চিল্লা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রতিবৎসর রমজানের ঊনত্রিংশত্তম দিবসে এই দরগায় অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। বিহার শরীফের ছোট দরগায় তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস চট্টগ্রামের বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম ও তিনি একই ব্যক্তি।[১২৫]

(৩) জীন্দা গাজী, গাজী মিয়াঁ (সালার মাসুদ) ও সত্যপীর সম্বন্ধে একই ধরণের একাধিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায় এবং ইঁহাদের সঠিক সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নহে। সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল ও নদীনালায় অসংখ্য ব্যাঘ্র ও কুমীরের বসবাস ছিল। ব্যাঘ্র ও কুমীর হইতে পরিত্রাণ পাইতে হিন্দু ও মুসলমান কাঠুরিয়াগণ নিম্নলিখিত কাল্পনিক দেবতাদের পূজা করিত—চব্বিশ পরগণা জিলার মাহুরা গাজী (মবরা অথবা মবারক); দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের লখ্যা নদীর উপকূলে জীন্দা গাজী; এবং হিন্দুদের দ্বারা পূজিত কালুরায় ও (ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আসীন) দক্ষিণ রায় চব্বিশ পরগণার প্রায় প্রতি গ্রামেই মাহুরা (মবরা) গাজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকার ঢিপির উপর এই বেদী নির্মিত হইত। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পূর্বে অথবা জলপথে যাত্রা করিবার প্রারম্ভে এখানে আসিয়া প্রার্থনা করা হইত। পূর্ববঙ্গের লখ্যা নদীর তীরে গাজী ও তাহার ভ্রাতা কালুর উদ্দেশ্যে নির্মিত এইরূপ দুইটি ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান ভক্তগণের প্রার্থনা-পদ্ধতি ও পূজার সামগ্রীতে কোন পার্থক্য ছিলনা।[১২৬]

(৪) মাকওয়ানপুরের শেখ মদারের (সৈয়দ বদীউদ্দীন মদার) অনুগামিগণ মদারীনামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। বাংলায় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে মদার ঝান্ডা উৎসব পালন করা হইত। পূর্ণিয়া ও রংপুর অঞ্চলে বুকানন (Buchanan) বহুসংখ্যক

মদারী ফকির পরিবার দেখিয়াছিলেন। অনেক মদারী ফকির হিন্দু সন্ন্যাসীদের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া, কখন বা নগ্নাবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত। হিন্দুদের ন্যায় তাহারা অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া আসিত।[১২৭]

(৫) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই, বিশেষতঃ বাংলা ও বিহারে, বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার আশায়, পঞ্চপীরের উপাসনা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। যাত্রা করিবার পূর্বে মুসলমান নাবিকগণ আল্লা, নবী, পঞ্চপীর, বদর প্রভৃতির নামোচ্চারণ করিত। এই পঞ্চপীরকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইঁহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলায় আমরা মাণিক পীর (? বদর পীর), ঘোড়া পীর, কুম্ভীর পীর, মদারী পীর প্রভৃতির নাম শুনিয়া থাকি, কিন্তু ইঁহাদের পূজা বা আরাধনায় কোন বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। James Wise সোনারগাঁওএ একটি পঞ্চপীরের পাঁচটি অসম্পূর্ণ সমাধি পান যাহা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পূজিত হইত। পঞ্চপীরের উপাসনাকে অনেকে ইসলাম ধর্মমত ও সর্বপ্রাণবাদের (animism) সংমিশ্রণের অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদের উপর মুসলমান সাধুসন্তদের জীবনকাহিনীর জোড়-কলমের উদাহরণ বলিয়া মনে করেন। পঞ্চপীরের উপাসকেরা 'পঞ্চপীরিয়া' নামে অভিহিত হইতেন। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব অথবা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে এই উপাসনা পদ্ধতির সূত্র আবিষ্কার করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় (যেমন মেদিনীপুর, বর্ধমান) আজও পঞ্চপীরের উপাসনার প্রচলন রহিয়াছে।[১২৮]

উনিশ শতকে বঙ্গদেশের মরমিয়াগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর সন্তেরা শরিয়তের অনুগামী ছিলেন বলিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহারা 'বশরা' বা 'সালিক' নামে অভিহিত হইতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তদের আচার আচরণ শরিয়তের নিয়মানুসারে না হওয়ায় তাঁহারা অনুরূপ মর্যাদা পাইতেন না ও 'বেশরা' বা মজ্জুব নামে অভিহিত হইতেন।[১২৯]

(ঘ) মুসলমান তাপস ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের অনেকেই হিন্দু তাপসদের আচার আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ফকিরেরা অসংখ্য দলে বিভক্ত ছিলেন। উনিশ শতকে বঙ্গদেশে ফকিরদের চারিটি মুখ্য সম্প্রদায় ছিল,—অজুনশাহী, জালালী, মদারী ও বেনওয়াজ। ইহাদের শাখা প্রশাখাও কম ছিল না। জাফর শরীফ এক শ্রেণীর সহজিয়া ফকিরের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা স্ত্রীবেশে মুর্শীদের সামনে নৃত্যগীত পরিবেশন করিত। অনেক ফকিরের আচরণ ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।[১৩০]

(ঙ) মোল্লাতন্ত্র ঃ

ইসলামে ধর্মযাজকদের (Priesthood) যে স্থান নাই তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ধর্মযাজকদের প্রভাব অর্থাৎ মোল্লাতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোল্লাগণ দৈনন্দিন জীবন যাপন বিষয়ে ঐশ্লামিক অনুশাসনের সহিত পরিচিত থাকায় মুসলমান সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেন। নসরৎ শাহের আমলের একটি শিলালিপি হইতে ইহা জানা যায়।[১৩১] ইহা হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিত বর্গের প্রভাবের অনুরূপ।

(চ) লৌকিক পূজা পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঃ

বহুকাল ধরিয়া দুই সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করিবার ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা একই দেবতা ও সন্তদের আরাধনা করিতে শিখিয়াছিল। নিজধর্মের দেবতা বা সন্তের পূজা করিয়া রোগ নিরাময় না হইলে তখন অন্য সম্প্রদায়ের সন্ত বা দেবতাগণের আরাধনা করা হইত। বুকানন (Buchanan) অনেক ব্রাহ্মণ, মোল্লা ও ফকিরকে উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। রংপুরে তিনি কাজী ও পণ্ডিতদের মধ্যে এই জাতীয় আচরণ লক্ষ্য করেন। গোরখপুর অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর বহিরাগত মুসলমানেরা বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পরিবারের মহিলারা, হিন্দু পূজাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যথাক্রমে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পূজার বিশেষ প্রচলন হয়। এই পূজায় কোন মূর্তি বা প্রতিমার প্রয়োজন হইত না। ইনি সৎপ্রকৃতির দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং অতি অল্পেতেই সদয় হইতেন। এখানে ইহা উল্লেখনীয় যে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গেই এই ঠাকুরের উদ্ভব হয় কারণ এই দুই অঞ্চলেই পীরস্থানের প্রাদুর্ভাব ছিল। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর কবিরা (যেমন রূপরাম) স্বীকার করেন যে তাঁহারা ফকিরবেশী ব্রাহ্মণ ধর্মঠাকুরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহেই কাব্যরচনা করেন। পাহাড়পুরের বৌদ্ধমঠ সত্যভিটা খনন করার সময় ইসলাম-ধর্ম সংশ্লিষ্ট ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৩২]

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে বাংলায় মুসলমানদের জীবনযাত্রা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

(ছ) সাহিত্যের সাক্ষ্য

(১) তুর্ক-আফগান যুগে হিন্দু জ্ঞানান্বেষণ

অনেকের ধারণা যে তুর্ক-আফগান যুগে বাঙালী মনীষা শুষ্ক ও স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় মুসলমান অত্যাচারে জর্জরিত বাঙালী মানস প্রথমে বিমূঢ়, আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং জ্ঞানানু-শীলনের উপযুক্ত মানসিক শান্তিও বিঘ্নিত হইয়া উঠে। কারণ প্রথমে প্রাণ তারপর জ্ঞান। তুর্ক আক্রমনের বেগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজা হইলেন পলাতক। আশ্রয়হীন, পৃষ্ঠ-পোষকহীন, ব্রাহ্মণগণও নিরাপত্তার সন্ধানে গৌড়, উড়িষ্যা বারাণসী, তিব্বত, নেপাল ইত্যাদি দূরদেশে পলাইয়া যান। প্রাণভয়ে ভীত বৌদ্ধগণ শুধু দেশত্যাগই করেন নাই, ধর্ম ও বেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাঙলায় রাজার অনুগ্রহপুষ্ট সংস্কৃত ভাষাই ছিল সমাজ ও সংস্কৃতির বাহন। কিন্তু এখন পুবর্তন রাজা উদ্বাস্তু সতরাং অনুগ্রহদানে অশক্ত। বর্তমান সুলতানের নিকট ইহা অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত ও বিধর্মীর দেবভাষা, সুতরাং পরিত্যাজ্য। বঙ্গ বিজয়ের প্রায় একশত বৎসর অর্থাৎ ১৩০০ খ্রীঃ পর্যন্ত কানা হরিদাসের 'মনসার ভাসান'[১৩৩] ব্যতীত উল্লেখনীয় সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহার মান উচ্চ নহে। ক্রমশঃ বাঙালী সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ইলিয়াসশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চতুর্দশ শতকে বাঙলায় এক নূতন প্রেরণা সুস্পষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতি (আনু ১৩৬০-১৪৮০) ছিলেন মৈথিল

কিন্তু তাঁহার পদাবলী বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।[১৩৪] উদয়নাচার্য ভাদুড়ী রচনা করেন কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ব, বিবেক, কনাদসূত্রটীকা ও মনুসংহিতাটীকা। নারায়ণদেব রচনা করেন পদ্মপুরাণ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয় (১৪৩৭-৯৩) ত্রিপুরার 'রাজমালা' (ইতিহাস) রচনা করেন। চণ্ডীদাস (১৪১৭-৭৭) তাঁহার ললিত কাব্যপদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাঙালীকে অপূর্ব রস-উৎসের পথ নির্দেশ করেন। তাঁহারই সমসাময়িক কবি কৃত্তিবাস (১৪৬০-৯০) বাল্মীকি-কৃত রামায়ণকে নূতন রূপ দিয়া বাঙালী মানুষের উপযুক্ত করেন। অযোধ্যা পরিবারের ঘটনায় আমরা বাঙালী গৃহস্থ জীবনের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই। তিনি শ্রীরামের যুদ্ধ, যোগদ্যার বন্দনা ও রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশীও রচনা করেন। এই শতকে শেখর রায়ের (১৪৪৯-১৫০৮) পদাবলী মালাধর বসুর (১৪৯৩-মৃত্যুকাল) শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও লক্ষ্মীচরিত্র এবং রঘুনাথশিরোমণি (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে) লীলাবতীর টীকা ও ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি উল্লেখ-যোগ্য।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ বাঙলা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁহার জীবনী বৈষ্ণবপদাবলী ও কড়চা সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নব রূপায়ণ হয়। তাঁহার সমসাময়িক বহু বাঙালী মনীষীর মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হইতেছে, যাহাতে বোঝা যায় যে ধীরে ধীরে বাঙালী মানস মুসলমান শাসনের প্রথম যুগের বাধাবিপত্তি অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যথা (১) চৈতন্যের শিক্ষক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ; (২) যবন হরিদাস (১৪৫০-১৫৩০) ; (৩) চৈতন্যের সহচর অদ্বৈত (১৪৬০-১৫৫৮) (৪) কড়চা রচয়িতা স্বরূপ দামোদর (১৪৬৫-১৫৪০) ; (৫) চৈতন্যের শিষ্য ও শীতলামংগল ও অদ্ভূত রামায়ণ রচয়িতা নিত্যানন্দ (১৪৭৭-১৫৮০) ; (৬) (৭) শ্রীচৈতন্যের শিষ্য সনাতন (জন্ম ১৪৮২) ও রূপ (জন্ম ১৪৮৪) ; (৮) ভক্ত অমৃতাষ্টক ও ভক্তিচন্দ্রিকা পটল প্রণেতা নরহরি সরকার (১৪৯৫-১৫৮০) ; (৯) শ্রীচৈতন্য শব্দকল্পবৃক্ষ, গুণলেশ শেখর ও মহাশিক্ষা প্রণেতা রঘুনাথ দাস (১৫৪৯৫-১৫৮৪) ; (১০) নব্যস্মৃতি-রচয়িতা স্মার্ত রঘুনন্দন (১৫০০-১৫৮০) ; (১১) হরিভক্তি বিলাস, বৃন্দাবনকৃষ্ণ কর্পূরামৃত রচয়িতা গোপাল ভট্ট (১৫০০-১৫৬৫) ; (১২) চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্য-চরণামৃত রচয়িতা পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুর (১৫১৮-৭৭) ; (১৩) শত সন্দর্ভ, ক্রম সন্দর্ভ মাধব মহোৎসব প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা জীব গোস্বামী (১৫১৮-১৬১০)।

ইহা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বহু চরণামৃত, জীবনী ও কড়চা রচিত হয় যাহা তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। উল্লেখনীয় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমংগল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের (১৫১৭-১৬১৬) চৈতন্যচরিতামৃত, মুরারি গুপ্তের (সংস্কৃতে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত (১৫৩৩ রচনা কাল) ইত্যাদি।[১৩৫]

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ব্রতগীত পাঁচালীর (পাঞ্চালীর) উদ্ভব হয়। গ্রাম্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন উপলক্ষে কাহিনী ও রূপকথা মিশ্রিত হইয়া এই গেয় আখ্যায়িকা কাব্যগুলি প্রথমে তিন দেবতাকে লইয়া রচিত হইয়াছিল। ক্রমানুসারে এইগুলি হইল মনসামঙ্গল, চণ্ডীমংগল ও ধর্মমঙ্গল।[১৩৬] পরে ইহার পরিধি আরও ব্যাপ্ত হয়।

(ক) মনসামঙ্গল—বিভিন্ন কালের বহু কবিই মনসামঙ্গল বা মনসাপ্রশস্তি লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বীরভূমনিবাসী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকের কবি বিপ্রদাসই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন[১৩৭] ও বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর বলিয়া ডঃ সুকুমার সেনের মত।[১৩৮]

(খ) চণ্ডীমঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীদেবীর মহাত্ম্য ও প্রশস্তিমূলক কয়েকটি কাব্য রচিত হয় কালকেতু ব্যাধ ও বণিকের কাহিনীর পৃষ্ঠ ভূমিকায়। এই পাঁচালী কাব্যের আসল নাম ছিল অভয়ামঙ্গল, কারণ দেবী দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী হইলেও মহিষাসুরমর্দিনী নন, তিনি অভয়া। লক্ষণ সেনের সময়ে হলায়ুধের ব্রাহ্মণ সর্বস্ব ও পঞ্চদশ শতকের শেষে বৃন্দাবন দাসের সাক্ষ্য অনুসারে মুসলমান অধিকারের বহুপূর্বেই স্মার্তবিধিমতে দুর্গা-চণ্ডীর পূজা শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের নিকট স্থান পাইয়াছিল।[১৩৯]

চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বর্ধমানের দামিন্যা বা দামুনিয়া গ্রাম ছিল তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙালী মানুষের এমন পরিপূর্ণ চিত্র বাঙলা সাহিত্যের আর কোথাও মিলে কিনা সন্দেহ। সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেশি বিদ্যায় অর্থাৎ লোক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।[১৪০]

ইহা ব্যতীতও অন্যান্য দেবদেবীর সম্বন্ধেও মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, যেমন শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালী বা কালিকা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল।[১৪১]

(গ) **ধর্মকথা, ধর্মমঙ্গল :**

মধ্যযুগে ধর্মরাজ ('রায়') বা ধর্মঠাকুরের পূজা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, সর্বধর্মের অনুষ্ঠানের মিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছিল।[১৪২] ধর্মপূজা বিধানে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান, 'কলিমা জালাল,' ছোট জালালী, বারমতি (বারমুক্তি), দাদুরিঘাটা, ঘরভাঙ্গা (শেষ দিনের অনুষ্ঠান) ইত্যাদি গাজন অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। ধর্মকথার তিনটি ভাগ, যথা, (১) পূজানুষ্ঠান-(বা সংজাত) পদ্ধতি ; (২) ধর্মপুরাণ বা আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রকথা ; (৩) ধর্মমঙ্গল বা ধর্ম-মাহাত্ম্যকাহিনী। আর সাধারণ উপক্রমণিকায় আছে সৃষ্টিবর্ণনা, যাহা শূন্যপুরাণ বা শূন্যশাস্ত্র নামে অভিহিত।

প্রথমভাগের নিবন্ধগুলি সব ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও ঠাকুরের আদি পুরোহিত রামাই (শ্রীযুত রামাঞি, পণ্ডিত শ্রীরাম ইত্যাদি) পণ্ডিতের নামে প্রচলিত। ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'জালালী কলিমায়' বা বড় জালালীতে ফিরুজ তুঘলকের উড়িষ্যা ও বাঙলায় বিদ্যুৎগতি অভিযানের স্মৃতি বিজড়িত আছে। জাজপুরে বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সাধারণ লোক বিব্রত হইয়া ধর্মঠাকুরকে স্মরণ করে।[১৪৩] এই অংশের নাম 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অর্থাৎ নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের ক্রোধ। এখানে নিরঞ্জন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ধর্মপূজারী সৎ-ধর্মীদের রক্ষক হইয়া খোদারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্য দেবদেবীরা তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্দির ধ্বংস হইল। সৎ-ধর্মীরা রক্ষা পাইল। ইহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।) ডঃ শহীদুল্লাহ শূন্যপুরাণের ভূমিকায় বলেন (পৃ, ৩৫) যে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-ঠাকুরের পূজারী বৌদ্ধ ও মুসলমান উভয়দের প্রতি একই প্রকার ব্যবহার করে। সেজন্য

ধর্মঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের সমবেত প্রতিবাদ।

'বড় জালালি'র পর 'ছোট জালালি'। খোন্দকার হিন্দু মুসলমান ভাইদের বিচার করিতে বসিলেন। "কো হিন্দু কো মুসলমান" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে

"হিন্দু পুজান্তি কাষ্ঠ পাষাণ।
মুসলমান পুজন্তি খোদায়
পুণ্য রেখ নাই"।[১৪৪]

এই দুই 'জালালি'র মধ্যে লৌকিক সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মাঝেও একটা আশ্চর্য সমন্বয়ের ভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু অনুষ্ঠানেই নয়, হিন্দু দেবদেবী ও মুসলমানদের খোদা, পয়গম্বর ইত্যাদির এক মিশ্রণেও। ধর্মঠাকুরের শাস্ত্রই পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য করা হয়।[১৪৫] ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতিতে বহু মুসলিম আচার-ব্যবস্থা মিশিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের মত সৎ-ধর্মিগণও হাঁস বা পায়রার কণ্ঠনালী কাটিয়া (জবাহ্) অর্ঘ্য দেয় ও পশ্চিম অর্থাৎ মক্কার অভিমুখী হইয়া পশু জবাহ্ করে। রমাই পণ্ডিতের জাজপুর প্রসঙ্গে কিছু নূতনত্ব আছে, কারণ মুসলমানদের কুরবাণীকে ধর্মঠাকুর ও চণ্ডীপূজার প্রকারান্তর বলা হইয়াছে।

সৈয়দ মোলানা কাজি বৈসে স্থানে স্থানে
ইদ্ পার্বণ করে আনন্দিত মনে।
নিরঞ্জন ভাবে তারা নিজ শাস্ত্র পড়ি
বনের পশু আনি তার গলায় দেয় ছুরি।
তথাএ খর্পর পাতি দেবী হ'ন দিগম্বরী
নিরক্ষ-রুধির পান করে মহেশ্বরী।...[১৪৬]

(ঘ) যোগীসিদ্ধ কথা বা নাথপন্থ ঃ

এই প্রসঙ্গে যোগীসিদ্ধ কথা বা নাথপন্থী ধর্মগ্রন্থেরও উল্লেখ আবশ্যক। নাথযোগী সিদ্ধাইদের উদ্ভব হয় পালযুগে।[১৪৭] নাথপন্থ প্রাচীন পতঞ্জলির যোগবাদ, বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রবাদ, শৈব-আগম মতবাদ এর সংমিশ্রণে জাত। আদিনাথ (শিব ইহার অলৌকিক প্রবর্তক। তাঁহার সেবক মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ প্রথম মানবিক গুরু। দশম শতকে এই নাথপন্থ বাঙলা, আসাম, নেপাল, তিব্বতে ও উত্তর ভারতে ও পরে পেশাওর ও কাবুলে প্রসারিত হয়। নাথ সিদ্ধাইগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ছিলেন উদার, বিভিন্ন মতবাদের সারগ্রাহী। জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে যে কেহ নাথপন্থী হইতে পারিতেন। আদিগুরু মৎস্যেন্দ্র বা মীন-নাথ সম্বন্ধে কাহিনী অলৌকিক। তিনি কৈবর্ত ছিলেন কিনা জানা নাই তবে মাছের সঙ্গে প্রথম যুগের যোগীসিদ্ধদের সম্পর্ক ছিল। তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ। নাথসাহিত্য ইহাঁদের কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 'গোরক্ষবিজয়ের' মূল ভাব এই যে জীবন্মুক্ত শিষ্য মোহমগ্ন গুরুকে চৈতন্যদান করিবে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ইহা "বিশ্ব সাহিত্যে বাঙ্গালার এক বিশিষ্ট দান।"[১৪৮] পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যেও নাথসিদ্ধভক্তের অভাব ছিল না। তাঁহারা মৎস্যেন্দ্রকে 'মছন্দর-মছন্দালি'তে ও আরও পরে 'মোচরা পীরে' পরিণত করেন। সুতরাং নাথসাহিত্যে অসংখ্য মুসলিম শব্দ ও উপমা বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপর মুসলিম ভাব ও ভাষার প্রভাব সহজেই অনুমেয়। ডঃ সুকুমার

সেনের মতে গোরক্ষ-বিজয়ের কবি (অথবা প্রাচীন গায়ক) তিনজন—ভীমসেন বা ভীমদাস রায় শ্যামাদাস সেন ও চাটিগাঁ অঞ্চলের ?) ফয়জুল্লা। শেষোক্ত দুই জনের রচনার মধ্যে ঐক্য অত্যন্ত গভীর। ফয়জুল্লার ছড়ায় আরবী ফারসী শব্দ স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান।[১৪৯]

মহেন্দ্রর শিষ্য গোরক্ষনাথ (আনুমানিক ১১-১২ শতক) কানফাট্টা যোগীদের এক প্রগতিশীল সংগঠন স্থাপিত করেন ও বিভিন্ন গ্রন্থে ও কবিতায় অনুরূপ দর্শনও প্রচার করেন। একজন প্রখ্যাত সুফী সাধক শেখ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর মতে তিনি মানব ছিলেন না, ছিলেন পরব্রহ্ম (Absolute Being), আদর্শ (perfect) পুরুষ, যিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব (oneness) উপলব্ধি করিয়াছেন। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে একজন হিন্দুর সম্বন্ধে এক মুসলমানের এইরূপ ধারণা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। প্রখ্যাত চিশ্তি, ফিরদৌসী ও শত্তারী সুফীগণ নাথযোগীদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভাষণ শুনিতেন ও ভাবের আদানপ্রদান করিতেন, তবে ভারতীয় দেহান্তরবাদ ও অবতারবাদ মানিতেন না।

দীর্ঘ ৪০০ বৎসর (১৩-১৬ শতক) নাথ ও সুফী সাহিত্য পরস্পরকে প্রভাবিত করে। নাথ সিদ্ধাই ও যোগীগণের প্রজ্ঞার প্রভাব সুফীদের উপর লক্ষিত হয় একটি নাথপন্থের হঠযোগীর তান্ত্রিক সংস্কৃত ধর্মীয় গ্রন্থে (অমৃতকুণ্ড)। আলি মর্দান খলজীর সময়ে লক্ষ্মৌতির ইমাম ও প্রধান কাজী কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী এই গ্রন্থটিকে এক ধর্মান্তরিত বাঙালীতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ, কামরূপের যোগীর (১২০৯-১৭) [ভোজর ব্রাহ্মণ বা বজ্রব্রহ্ম ?] সাহায্যে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন [হৌজ উল হায়াৎ]। এই গ্রন্থের গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে বিখ্যাত শত্তারী সন্ত শেখ মহম্মদ ঘৌস (১৫০০-৬৩) ইহার পুনরায় অনুবাদ করেন। মুসলমানরা ইহাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিত ও বহুবার ইহার আরবী ও ফারসী অনুবাদ হয়। নাথ সিদ্ধাইদের ঈশ্বর (Ultimate Reality) সম্বন্ধীয় ধারণা ও সুফীদের Wahdat ul Wujud (Unity of Being) ধারণা অনুরূপ ছিল বলিয়া নাথপন্থের প্রভাব জোরদার হয়। এই অমৃতকুণ্ড গ্রন্থটি ১৫-১৮ শতকে বাঙলাভাষায় অনূদিত করেন যোগতন্ত্র বিষয়-জিজ্ঞাসু সুফী কবিগণ। সৈয়দ সুলতান যোগ ও সুফীবাদের মিশ্রণ ঘটাইয়া 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'জ্ঞানচৌতিশা' রচনা করেন। তিনি অবশ্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি ঐশ্লামিক বিশ্বাসই প্রকাশিত করিতেছেন ও ইসলামকে হিন্দুধর্মান্বিত করেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যে সুফীদের উপর স্থানীয় লৌকিক ধর্মাচারের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় ও তৎকালীন হিন্দুমুসলিম সমন্বয়ের একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছায়া ভাসিয়া উঠে। অপরপক্ষে গোঁড়া মুসলমানগণ এই গতি-প্রবণতাকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। মুঘলদের বঙ্গবিজয়ের পরই ইহা সম্ভব হয়, কারণ ইহাতে বাংলার বিচ্ছিন্নতাযুগের অবসান হয়।[১৫০]

(২) ইসলামী বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের আভাস

(ক) রোমান্টিক কাব্য ঃ মধ্যযুগে বিশেষতঃ সুলতানী আমলের বাঙলায় কৃষ্টি-সমন্বয়ের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ দিক আমরা দেখি সাহিত্যে। মুসলমান-বিজয়ের পর বাঙলার বুকে যে সহজ সাধনার ধারা একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল তাহা মুসলমান সাধক-কবিদের মাধ্যমে চতুর্দশ-ষোড়শ শতকে সুফীসাধনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়।[১৫১] হিন্দু কবিরা মুখ্যতঃ দেব-মাহাত্ম্য-কাহিনী লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। অপর পক্ষে মুসলমান

কবিগণ অপভ্রংশ যুগে প্রচলিত রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য ও প্রণয়গাথার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।[১০২] তাঁহারা হিন্দুদেবদেবী সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বহু রচনা লিখিয়াছেন। কালী-মাহাত্ম্য-বিষয়ক বাঙলায় প্রথম প্রণয় কাব্য-কাহিনী 'বিদ্যাসুন্দর' এর রচয়িতা একজন ব্যতীত সকলেই হিন্দু। সেই একজন হচ্ছেন সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবি সাবিরিদ খাঁ।

উত্তর ভারতের প্রখ্যাত চিশ্‌তী সুফী পীর শেখ বুরহানের দুই শিষ্য, কবি ও সাধক, কুতবন[১০৩] ও মালিক মহম্মদ জায়সী[১০৪] ষোড়শ শতাব্দীতে যথাক্রমে রোমান্টিক তথা আধ্যাত্মিক রূপক কাহিনী 'মৃগাবৎ' ('মৃগাবতী') ও 'পদ্মাবৎ' ('পদ্মাবৎ') রচনা করেন। তবে বঙ্গদেশে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের গঙ্গাধারাকে আনিলেন রোসাঙ্গ (আরাকান) এর সপ্তদশ শতকের দুইজন সভাকবি দৌলতকাজী ও আলাওল। ইঁহাদের বিবরণ পূর্বেই দিয়াছি। এখানে সাহিত্যিক সমন্বয়ে তাঁহাদের অবদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সুফী সাধক কবি দৌলতকাজী একাধারে শ্রেষ্ঠ বাঙালী মুসলমান কবি ও প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি। ষোড়শ শতকের মিয়াঁ সাধনের ভোজপুরী 'মৈনাসৎ' ('ময়নাসতী') কাহিনীর ভিত্তিতে দৌলত কাজী যে 'সতী ময়না' কাব্য (যাহার ১ম খণ্ড লোর-চন্দ্রানী) রচনা করেন তাহা একটি অসম্পূর্ণ পাঁচালী কাব্য। ইহাতে আল্লা ও রসুলের বন্দনার সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বারিকা, বারমাস্যা পালা, বিভিন্ন রাগ-রাগিণী, পুরাণ-কথা, হিন্দু পরিচ্ছদ, হরিনামের কীর্তনের উল্লেখ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব গীতি কবিতারও সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে।[১০৫]

পণ্ডিত ও গুণী আলাওল এর কাব্য গ্রন্থগুলিও হিন্দুমুসলমান সমন্বয়ের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরাকানী মুসলমানদের নিকট তিনি 'তালিম আলিম' বলিয়া আদর পাইয়াছেন। অশ্বারোহী হইয়াও তিনি ছিলেন ভাষাবিদ ও গীত-নাট্য-কলা পারদর্শী। দৌলতকাজীর অসম্পূর্ণ 'সতীময়না' (বা 'লোর চন্দ্রানী')র সম্পূরণে, জায়সীর পদ্মাবতের অনুবাদে ও স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্তনে ও মান উন্নয়নে ও সুফীধর্মমূলক গ্রন্থ-অনুবাদে আলাওলের বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান, সুফী প্রেম সাধনার গভীরতা, বৈষ্ণব কবির আন্তরিকতা ও যোগমার্গের জ্ঞান প্রতিফলিত হইয়াছে। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দী জানিলেও তিনি তাঁহার রচনায় বেশী আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তবে ফারসী কাব্যের (যথা হফ্‌ৎ পয়কর বা সপ্ত পয়কর ও সেকন্দরনামা) ও আরবী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি 'বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ইসলামী পদ্ধতি' প্রবর্তন করেন।[১০৬]

(খ) মুসলমান পুরাণ পাঁচালী ঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে সাহিত্যে পয়গম্বর ও খলিফাদের জীবনী মাতৃভাষা বাংলায় রচনা করিবার দিকে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত, আমদানী-কৃত ইসলামী ধর্মপুস্তকের অনুবাদের বা পরিবর্তিত রূপের ভিত্তিতে এই সময়ে বাংলায় রচনা শুরু হইল। ইসলামী পদ্ধতির লেখকগণ বাঙালী হিন্দুর পুরাণ পাঁচালীর প্রভাবে ইসলাম প্রচারকদের জীবনী ও কাফের-দলন কাহিনী হরিবংশ, পাণ্ডব-বিজয়ের ছাঁচেই রচনা করিলেন। ইহা দুই প্রকারেরঃ (১) পয়গম্বর-কাহিনী—নবীবংশ,রসুল বিজয়, রসুল-নামা; মহম্মদ-বিজয়,—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত। (২) কাছাছোল-আম্বিয়া (কাসাসুল আম্বিয়া) বা নবীদের কেচ্ছা; ও খলিফাদের বিজয়-অভিযান-জঙ্গনামা বা যুদ্ধকথা,—উনবিংশ শতকে রচিত।

(১) নবীবংশ-রসূল-বিজয় পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন চাটিগাঁর অন্তর্গত পরাগলপুর-বাসী ও সুফী যোগী সাধক কবি সৈয়দ সুলতান। ইনি 'নবীবংশ' ও 'জঙ্গনামা' দুইটি মুসলমান ধর্মপুস্তক এবং 'জ্ঞানপ্রদীপ' বা 'জ্ঞান-চৌতিশা, নামে একটি তান্ত্রিক যোগতত্ত্ব নিবন্ধ রচনা করেন। সংস্কৃত 'হরি-বংশের' নামই 'নবীবংশে' অনুকৃত হইয়াছে ও ইহাতে তিনি হিন্দু শাস্ত্র কাজে লাগাইয়াছেন। লেখক ইসলামীয় সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীদের আবির্ভাব ব্যতীতও যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকেও নবী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার ধর্মীয় ঔদার্যের দ্যোতক। ইহার উপসংহার 'শবে মেয়েরাজ' বোধ হয় তাঁহার শেষ রচনা। তাঁহার পরমার্থ-মূলক সঙ্গীত পদাবলীতে তাঁহার কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণের রূপবর্ণনা পদটি বৈষ্ণব ভাবাপ্লুত।[১৫৭]

(২) জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাহিনী ঃ ইসলাম প্রচারক আদি খলিফাদের ইরাণবিজয়, আত্মকলহকাহিনী ইত্যাদি। কারবালার করুণ কাহিনী বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে অত্যধিক আদৃত হইত। ইহার রচয়িতাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ উল্লেখযোগ্য। (ক) চাটিগাঁয়ের কবি মহম্মদ খান (১০৫৬/১৬৪৬)—মুক্তাল হোসেন অর্থাৎ মকুতুল হুসয়ন); (খ) সৈয়দ সুলতান; (গ) চাটিগাঁয়ের কবি নসরুল্লা খান (অষ্টাদশ শতকের প্রথমে); (ঘ) চাটিগাঁয়ের (? সুফীপন্থী) মনসুর---আমীর জঙ্গনামা; (ঙ) উত্তর বঙ্গের হায়াৎ (বা হিয়াৎ) মামুদ-'আম্বিয়াবাণী' (১১৬৫ সাল/১৭৫৮ খৃ); জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব (১৭২৩ খৃঃ); হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদের বাংলা তর্জমা (১৭৩২ খৃ); ইসলাম তত্ত্বনিবন্ধ হিতজ্ঞানবাণী (১৭৫৩ খৃ); (চ) পশ্চিমবঙ্গের কবি গরিবুল্লা-আমীর হামজার জঙ্গনামা, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ; অসম্পূর্ণ। ইহাকে সম্পূরণ করেন সৈয়দ হামজা (১৭৯২); (ছ) রাধাচরণ গোপ নামে এক হিন্দু কবিও (? বীরভূমবাসী) বড় জঙ্গনামা লেখেন সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে। পুঁথির তারিখ ১৮২৭-'ইমাম এনের কেচ্ছা' (বা ইমামের জঙ্গ)।

(গ) পীর-গাথা ঃ

পূর্বেই সমাজে পীরদের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদের উপর যে সাহিত্য সৃষ্ট হয় তাহাকে পীর-গাথা বলা হয়। বাঙলায় মুসলমান সাধু-সন্ত-সুফী-পীর-ফকিরদের পদার্পণ তুর্কি-বিজয়ের পূর্ব হইতেই।[১৫৮] ইঁহারা কেবল ধর্মপ্রচারেই লিপ্ত থাকিতেন না, বিজয় অভিযানে, মন্দির-বিগ্রহ-বিহার ধ্বংস, লুঠপাট ও প্রশাসনেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিতেন। ধর্মকথার 'দেউল-দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে' অতি বাস্তব চিত্র। সুতরাং অনেকেই জনসাধারণের মনে ভীতির উদ্রেক করিত। আবার কখনও কখনও জনসাধারণ কোন কোন সাধু বা পীরের প্রতি তাঁহাদের চরিত্রগুণে বা অলৌকিক কার্যাবলী, সিদ্ধাই-এর জন্য ভক্তিও প্রদর্শন করিত। সুফীদের গুরুভক্তিও বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত যোগী ও তান্ত্রিক সাধুদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক দুর্বলতাও এই ভক্তির মূলে ছিল। তৃতীয়তঃ ছিল বৈষ্ণব প্রভাব। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম 'হিন্দু-মুসলমানের ভেদের বাধ' চূর্ণ করে। ধর্মনির্বিশেষে কৃষ্ণভক্তি ও নাম-নিষ্ঠা প্রচারের দ্বারা তিনি মুসলিম পীর ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কিছু বিভেদ দূর করিবার প্রচেষ্টা করেন। হিন্দুর পক্ষে মুসলিম সাধুর (জিন্দা পীরের)

নিকট দীক্ষাগ্রহণ বা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে আর কোন দূরপনেয় সামাজিক প্রতিবন্ধক রহিল না। সাহিত্যে এই পীর-মাহাত্ম্য-গাথার উল্লেখ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রচিত 'সেক শুভোদয়ায়' আছে।[১৫৯]

পীরপাঁচালীতে বৌদ্ধ ধর্মঠাকুর, মুসলিম পীর ও হিন্দু নারায়ণের সংমিশ্রণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে, বিশেষ, তাহার শেষভাগে।[১৬০] বাঙলাদেশেই মুসলমান অধিকারের শেষ পর্বে হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষ হইতেই প্রথম ধর্মের মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল সত্যপীর-সত্য নারায়ণের কাহিনীর মাধ্যমে। 'সত্য পীরের পুস্তক' উভয় সম্প্রদায়ের জন্য রচিত। ডঃ সুকুমার সেন বলেন পীর গাথার লেখক হিন্দুরা, গায়ক মুসলমানেরা, কিন্তু রচয়িতা উভয় সম্প্রদায়েরই কবি। পাঁচালীগুলির কিছু এই নূতন দেবতার আনুষ্ঠানিক পূজা পদ্ধতি রচনা, কিছু লৌকিক কাহিনী মূলক ও কিছু মুসলমানি ভাব-যুক্ত কাহিনী-মূলক। পশ্চিমবঙ্গ হইতে আসাম পর্যন্ত বহু হিন্দু মক্কার রহীম ও অযোধ্যার রামের সমীকরণ করিয়া সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পাঁচালী রচনা করেন।[১৬১] রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পাঁচালীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ফৈজুল্লার কাহিনীর যথেষ্ট মিল আছে। ফৈজুল্লার কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। উপক্রমে তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্যদের সমানভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহার পর লিখিয়াছেন।

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ
শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন।

মুসলমান-রচিত পাঁচালীর মধ্যে ইহাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে উভয় সম্প্রদায় যে 'কতটা এক হ'য়ে এসেছিল' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ফৈজুল্লার গাথায়।[১৬২]

কিছু পাঁচালী রচনায় সত্যপীর, দেবতা নহেন, মানুষ। সুকুমার সেনের মতে ইহার মধ্যে 'ইতিহাসের বস্তু' না থাকায় তাহার 'অনুসন্ধানও নিরর্থক'। তিনি আরও বলেন, 'উপকথার মধ্যে জনশ্রুতি আছে এবং দেশ কালের অনুগতি প্রচেষ্টা আছে'।[১৬৩] সুতরাং ইহার মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া সম্ভব। বাউল দরবেশ সম্প্রদায়-ভুক্ত তাহের মামুদ সরকারের শিষ্য উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণহরি সরকার (দাস) এর সত্যপীরের পাঁচালীকে 'বৃহত্তম ও বিচিত্রতম' বলা হইয়াছে।[১৬৪] এখানে সত্যপীর ব্রাহ্মণ কন্যার কানীনপুত্র। পাতালরাজ বলি ও জলের তলায় খোওয়াজ জিন্দাপীরের একত্রে উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলামের বৈষম্যের প্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ বলেন যে কোরাণ পড়িলে জাতি যায়, কারণ ইহার প্রথমেই 'বিসমিল্লা হরফ' আছে। ইহার উত্তরে সত্যপীর যুক্তি দেখান

এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার নাম জপে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।
হস্ত নাহি পদ নাহি ধরেছে সংসার
মুখ নাই আছে তার করিতে আহার।
কর্ণ নাহি কথা শোনে, চক্ষু নাহি দেখে

চিনিতে না পারে কেহ সর্বঘটে থাকে।
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।[১৬৫]

সুতরাং সত্যপীর সত্যনারায়ণ, বিষ্ণু আর বিছমিল্লা, আল্লা আর নিরঞ্জন সব এক হইয়া গিয়াছেন। অতএব প্রয়াত মনীষী রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত যে সত্যপীর মুসলমানদের ও সত্যনারায়ণ হিন্দুদের তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, এই পূজার উন্মেষের সময়ে অন্তত ছিল না।

মানিক পীর সুফীদের স্বীকৃত, কখনও যীশুর স্থানীয়, কখনও ইশানবীর সঙ্গে অভিন্ন। সত্যপীরের মত বিমিশ্র (Composite) দেবতা নহেন।[১৬৬]

(ঘ) **আঠারো ভাটির পাঁচালী :** সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নিম্নভাগীরথী-প্লাবিত অঞ্চল বিভিন্ন কারণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু নূতন লৌকিক বা অপৌরাণিক এবং স্থানীয় দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যও রচিত হয়। নদীর মুখে পলি-সমৃদ্ধ সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের ভয়ে সদা আতঙ্কিত থাকিতে হয়। সেইজন্য চব্বিশ পরগণার পূর্বভাগ, প্রাক্তন যশোহর জেলার পশ্চিমভাগ, খুলনা ও নোয়াখালিতে অনেকদিন হইতেই ভীত মানুষ ত্রাণের আশায় যথাক্রমে অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর পূজা করিতে অভ্যস্ত হয়। সর্প-দেবী মনসার (মঙ্গল) কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মোঙ্গলদের অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্র-মানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণ বাঙলায় ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ে পরিণত হইলেন। কুম্ভীর দেবতা হইলেন কালুরায়। ইঁহারাই কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গল' (১৬০৮ শক / ১৬৮৬-৭) এর উপাস্য দেবতা। এখানকার হিন্দু ব্যাধ, কাঠুরে, পশুপালক ও মধু মোম (মউল্যা) সংগ্রাহকদের অধি দেবতা বনদেবী মঙ্গলচণ্ডী বনদুর্গা নামে পূজিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে হিন্দু লৌকিক দেব দেবীর স্বীকৃত মাহাত্ম্য কাহিনীগুলিকে মুসলমান পীর পীরাণীর মাহাত্ম্যগাথায় রূপায়নের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে সমন্বয় আছে, সংঘর্ষও আছে, পরে মৈত্রীও আসে। সুতরাং মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সঙ্গে সাহিত্যের এই ধারার বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। (১) সমন্বয়ের দিক হইতে আমরা পাই ত্রিধারা ; (ক) মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দু দেবদেবীর প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা : অনাথ ফকির রচিত মাণিক পীরের গীতে মণিকপীর যেন শিবেরই প্রতিধ্বনি ; পীর মছন্দলী (পূর্ববঙ্গে মোচরা-পীর) যেন নাথ-গুরু মৎস্যেন্দ্র ও যোন্ধা-পীর মসনদ আলির সংমিশ্রণ ; বন-বিবি বন-দুর্গারই রূপান্তর ও বন-বিবির মাহাত্ম্য পাঁচালী (জহুরা-নামা) মঙ্গল চণ্ডীর কথার অনুরূপ ; বন-বিবির তলা পশ্চিমবঙ্গে এখনও পূজিত। (খ) একই কুম্ভীর দেবতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত : হিন্দুদের কালুরায়, মুসলমানদের মগরপীর কালু শাহা। (গ) হিন্দু ঠাকুর মুসলমান পীর হইয়াও পূর্বকার হিন্দু নামেই পরিচিত,—যেমন বর্ধমান ও ২৪ পরগণার পীর গোরাচাঁদ। (২) সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন পীর হিন্দু দেবতার প্রতিপক্ষ হইয়াছেন, যথা দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণরায় হিন্দুদের ঠাকুর এবং বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বড়খাঁ গাজী দক্ষিণের অধীশ্বর। দক্ষিণরায়ের মিত্র কালু রায়, বড় খাঁর কালু শাহা।

এই বিরোধ-কাহিনী বন-বিবির উপাখ্যানেও অনুবৃত্ত আছে।

মুসলমান কবিরা এই সকল নূতন দেবদেবীর মাহাত্ম্য পাঁচালী লিখিয়া 'জনসাধারণের ধর্মপিপাসা ও কাব্য জিজ্ঞাসা' মিটাইবার চেষ্টা করেন। বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে এ গুলির—সাহিত্যিক উৎকর্ষ যাহাই থাকুক না কেন—ঐতিহাসিক অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর কাহিনীতে যে সংঘর্ষ উল্লিখিত তাহা তৎকালীন, বঙ্গদেশে ধর্মীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইতেও পারে। 'রায়-মঙ্গলে' হিন্দু কবি প্রধান দুই নায়কের মধ্যে কাহারও মাহাত্ম্য খর্ব করেন নাই। কিন্তু 'গাজী সাহেবের গানে' (অর্থাৎ 'গাজী মঙ্গলে') মুসলমান লেখক দক্ষিণরায়কে পরাজিত সুতরাং হীনতর বলিয়াছেন। অবশ্য দুই মঙ্গলেই বিরোধের অবসান ঘটে মৈত্রীতে।[১৬৭]

(ঙ) **বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি :** ইসলামী বাংলা সাহিত্য ব্যতীতও বৈষ্ণবভাবাপন্ন কয়েকজন মুসলমান কবিদের কবিতাও ধর্মসমন্বয় ও ধর্মসহিষ্ণুতার মহতী বাণী বহন করে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১২১ জনের ও ৬০০ কিঞ্চিদধিক পদসংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকাংশই পূর্ববঙ্গবাসী,—শ্রীহট্ট, চাটি গাঁ, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহেরই পদ-কর্তাই অধিক। কয়েকজন অষ্টাদশ শতকের অবশ্য আছেন। তবে অধ্যাপক শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে ইঁহাদের অধিকাংশই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর। পরবর্তীকালের হইলেও কবিতা ও গানগুলির সাংস্কৃতিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইগুলি বাঙালী জাতির অখণ্ডতা ও মনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করিতে বিশেষ সাহায্য করে।[১৬৮]

এই সকল মুসলমান বৈষ্ণব যে রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা দৃশ্যতঃ অস্বাভাবিক। কিন্তু বাঙলার মাটিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানই হিন্দুবংশজাত। প্রাচীন সংস্কার অন্তঃশীলা ফল্গুর ন্যায় সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইত। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুধর্মসাধনার সহজ দিকটি একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। তাই প্রেমাস্পদ কানুর নাম মুসলমানরাও লইয়াছেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হয়ত মুছিয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রেমপ্রতীক রাধাকৃষ্ণের ছবি জাজ্বল্যমানই ছিল। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব প্রেমধারা শুধু হিন্দু হৃদয়কেই প্লাবিত করে নাই, মুসলমানদেরও সিঞ্চিত করিয়াছে। বাঙলার সূফীভাবাশ্রিত কবিগণ জীবাত্মা-পরমাত্মা প্রেম-মূলক সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য ফার্সী সাহিত্যের সূফী প্রেম কাহিনীর বদলে বাঙলার জাতীয় রূপক রাধাকৃষ্ণলীলাই গ্রহণ করেন, যাহাতে ইহা হিন্দু গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই সহজে বোধগম্য হয়।[১৬৯]

এই প্রবন্ধে মাত্র কয়েকজন বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির উল্লেখ সম্ভব হইবে। সপ্তদশ শতকে ফরিদপুর জেলার অধিবাসী আলাওলের নাম পূর্বেই করিয়াছি। ঐ শতকের নওয়াজিস সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার সুখছড়ি গ্রামবাসী।[১৭০] অষ্টাদশ শতাব্দীর চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওণখাইন গ্রামবাসী আলিরাজা· 'কানু ফকির' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম ছিল কেয়ামুদ্দীন। আলি দুইটি দরবেশী গ্রন্থ, 'সিরাজ কুলুপ' ও 'জ্ঞানসাগর,' দুইটি তান্ত্রিক গ্রন্থ, 'যোগ কালন্দর' ও 'ষটচক্রভেদ', ও একটি সঙ্গীত গ্রন্থ, রাগরাগিণী ও তাল এর উৎপত্তি বিষয়ক 'ধ্যান মালা

রচনা করেন।[১১১] কুষ্ঠিয়ার অন্তর্গত ভাঁড়োরা বা ভাঁড়ারা গ্রামনিবাসী লালন ফকির (১৭৭৫-১৮৯১) দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের নিকট বাউল সহজিয়া বা সুফী মতে দীক্ষিত।[১১২]

অধিকাংশ ভক্তিমূলক বৈষ্ণব কবিতাকে রাধাকৃষ্ণ রূপক মনে করিতে পারা যায়। সুফী পীর ও বৈষ্ণব মহান্ত সৈয়দ মর্তুজা প্রার্থনা করিতেছেন, 'পার কর মোরে নাইয়া কানাই' বলিয়া। অর্থাৎ ভবসিন্ধু পার করাও ভক্তিরূপ নৌকায়। তিনি 'ঘাটের ঘাটিয়াল,' বা ঘাটোয়াল, যাত্রীকে ঘাট নির্দেশ করেন বলিয়া এবং 'পন্থের চৌকিদার.' তাহাকে ভক্তিমার্গে প্রলোভন হইতে রক্ষা করেন বলিয়া।[১১৩] লাল মামুদ 'এবার···হরে কৃষ্ণ নাম করেছে সার।' তিনি বলছেন

"হিন্দু কিম্বা হোক মুসলমান।
তোমার পক্ষে সবাই সমান॥
আপন সন্তান জাতির কি বিচার।
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চন্ডাল কি চামার॥
"কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী।
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমায় ডাকে সারাৎসার"।[১১৪]

উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বাঙলায় কোন সময়ে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল মুসলমানেরই কণ্ঠে, আর এই বাণীর পিছনে কি আকুলতা!

যোগতন্ত্রেরও প্রভাব পড়িয়াছে বাঙলায় সহজ প্রেম সাধনার উপর। সাধারণ বিশ্বাস পরম দয়িত আমাদের 'ঘর'-রূপী দেহেই আছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে,[১১৫] বৈষ্ণব সহজিয়া গানে,[১১৬] ভারতের সুফী সাধকগণের চিন্তায়[১১৭] এই একই ভাব, একই সুর। বাঙলার বাউলদের নিকট ত দেহই দেউল। বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বর্ণনায় দেহতত্ত্ব-মূলক জীবাত্মা-পরমাত্মা প্রসঙ্গযুক্ত কবিতা ও গানেও এই ভাব। একজন ঘর, অপরে 'ঘুরণি' অর্থাৎ ঘরণী। কৃষ্ণ 'ঘর' হইলে রাধা 'ঘরিণী'। রাধা 'ঘর' হইলে কৃষ্ণ গৃহী। এই দেহ ও দেহী, মর্ত ও অমর্ত, সীমা ও অসীমের লীলা হইল অন্বয়তত্ত্বের লীলা।[১১৮] কবি শাহানুর দেহকেই রাধাকানুর মিলনস্থল বলেন। "তন রাধা মন কানু' (মন, আত্মা অর্থে)। "রাধার মন্দিরে অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী দেহে) কানু (অর্থাৎ অনাদি আত্মা) আছিলা পরবাসী"। আবার কেহ কেহ বলেন ইহার ঠিক বিপরীত। 'মন রাধা তন কানু।" "চলিয়া যাইবে নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।" (প্রাণ চলিয়া গেলে দেহের বিনাশ হইবে)-কবি উছমান।[১১৯]

মুসলমান কবিগণের রাধাকৃষ্ণলীলাগানের মধ্যে অনেক সময় যোগসাধনার বিভিন্ন ভাব ও কথা নানাভাবে ছড়াইয়া আছে। গোলাম হুছনের গান হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মুসলমান কবিগণ যোগের গোড়ায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন আর হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির সমন্বয় না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। তিনি বলিতেছেন,—

আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাওখানি যমুনার মাঝ।
কাণ্ডুকুরা কালা নিশান সুধু রাধার সাজ॥
আঁখির মাঝে আঁখিগুলি রাই নিরখিয়া চাও।

নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও ॥
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাশিকায় দাড় বাইও।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও ॥
গলুই এর মধ্যে নায়ের পন্থ রাই সর্গ মুখে যায় (ধায়)।
সুপন্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায় ॥[১৮০]

অর্থাৎ যেমন অপক্ক (Unseasoned) কাঠের নৌকা ও তাহাকে ঠেলিবার / কাঁচা বাঁশের লগী হইয়া যমুনা পার হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ যোগের দ্বারা দেহ শুদ্ধ না হইলে শুধু বাইরে যোগীর ঠাট লইলে কিছুই হইবে না। কবি যোগের পদ্ধতিরও ইংগিত দিয়েছেন।

কোন কোন মুসলমান বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ নামের দ্বারা ভগবানকেই নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার হাছন রজা (চৌধুরী)র নিকট রাধা ও খোদার মধ্যে কোন জুদা বা পার্থক্য নাই। তিনি রাধাকে রহিম ও রব্বানী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সীরে দেয় বাধা ॥
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।[১৮১]

কেহ কেহ লৌকিক প্রেম প্রসংগে রাধাকৃষ্ণের নাম করিয়াছেন।[১৮২] অনেকের কবিতার ঐ নামের উল্লেখ নাই কিন্তু লীলার প্রচ্ছন্ন ছাপ রহিয়াছে। আবার তাঁহারা কেবল গৌরাংগ বিষয়ক কবিতায় গৌর, গোরা, গোরাচাঁদ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। জগাই মাধাই প্রসংগে লালমামুদ লিখিয়াছেন গৌর অবতারে লোহার মানুষ সোনা হইল।[১৮৩]

(চ) **ইসলামী বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান বৈষ্ণব কাব্যের গুরুত্ব ঃ** বাঙলার মাটির উপর একেশ্বরবাদী, কাফের বিদ্বেষী, ইসলামধর্মালম্বীদের এ কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন? ইসলামের মধ্যে থাকিয়াও, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এই সকল মুসলমান কবি ও লেখক দ্বিধাহীন চিত্তে হিন্দুধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কালীসঙ্গীত রচনা, কালীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, নাথ সাহিত্যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (যথা শুকুর মামুদ, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ও ফৈজুল্লা, গোরক্ষবিজয়)। দৌলত কাজী ও আলাওল পদ্মাবতী ও লোরচন্দ্রানী রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেক নৈষ্ঠিক হিন্দু গংগাস্নানের পর ত্রিবেণীর মুসলমান কবি দরাফখানের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গংগাষ্টক (গংগাস্তোত্র) পাঠ করেন। তৎকালীন মুসলমান দ্বারা তিনি হিন্দু ভাবাপন্ন বলিয়া ধিকৃকৃত ত' হ'ন নাই বরং অভিনন্দিতই হইয়াছিলেন।

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান
গংগা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান।
(গংগনামা, কাব্যমালঞ্চ, পৃ. ৩১)

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ কেবল রাধাকৃষ্ণলীলাসংগীতই রচনা করেন নাই, হিন্দুর দেবদেবীকে পর্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা রাধিকার[১৮৪] ও নিমাই এর বারমাস্যাও লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু মুসলমান সাধক ভারতীয় সাধনা রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যোগশাস্ত্র অধ্যয়নে যোগ তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার উপরও গ্রন্থ রচনা করেন। কোন কোন মুসলমান ষটচক্রও স্বীকার করিয়াছেন। বাঙলায় রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখনীয় আলি রজার প্রেম ও যোগমিশ্রিত গ্রন্থ,—'জ্ঞান

সাগর,' যোগ-কালন্দর' ও 'ষট্‌চক্র'। 'জ্ঞানসাগর' জনপ্রিয় হিন্দু ধর্ম ও জনপ্রিয় মুসলমান ধর্মের ভাবধারার অপূর্ব সমন্বয়।[১৮২] পরিভাষা মুসলমানী, কিন্তু বিষয় ছিল হিন্দুযোগ। বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, বিশেষতঃ বর্তমান আলোচনার বিষয়ে ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সাধনাই যেন এখানে রূপায়িত হইয়াছে।

উপসংহার

মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিবেদন করিলাম। আকর-উপাদান এখনও সম্পূর্ণ হস্তগত হয় নাই; প্রাপ্ত উপকরণও এখনও সম্পূর্ণ অধীত বা ব্যবহৃতও হয় নাই। তথাপি ছিটে ফোঁটা যে সকল তথ্য আমি মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে আহরণ করিয়াছি তাহার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধা নাই যে দুই সম্প্রদায়েরই প্রবল ধর্মীয় বৈপরীত্য ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাহারা নিকটতর হইতেছিল। কোন কোন সুলতান বা শাসক এবং মোল্লা, উলেমা অবশ্য গোঁড়ামীতে ইন্ধন যোগান দিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের প্রাথমিক 'জিহাদ' যুগের রক্তপাত, অত্যাচার, অসহিষ্ণুতা চিরস্থায়ী হয় নাই। সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ও অসামঞ্জস্যের নির্দেশ আছে রাজনৈতিক ইতিহাসে, আছে শরীয়তী পুস্তকে, আছে সমসাময়িক কোন কোন সাহিত্যপুস্তকে। কিন্তু কালের অমোঘ শক্তির প্রভাবে পাঁচশত বা সার্ধপাঁচশত বৎসরে বাংলার সামাজিক জীবনে যে অপূর্ব, অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার নির্দেশ শরীয়তী পুস্তকে অলভ্য, ঐতিহাসিক কাহিনীতেও সম্পূর্ণ অভাব।

কিন্তু পরিবর্তন শীঘ্রই আসিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রভাবের ফলে ভারতে, বিশেষতঃ বাঙলার ইসলামে যে সকল লোকায়ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হইয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের নৈষ্ঠিক ধর্মসংস্কারকদের মতে 'শক'', আল্লার সহিত যোগস্থাপন বা প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস; ধর্মে ও ধর্মীয় কর্তব্যে ও পূজায় নবপ্রবর্তন বলিয়া অপব্যবহার। প্রত্যেক প্রকৃত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক মুসলমানেরই ইহা পরিহার করা কর্তব্য, কারণ ইহা নৈষ্ঠিক ইসলাম হইতে বিচলন। ভারতে ইসলাম ও কুফ্‌র্ খিচুড়ীর ন্যায় মিশ্রিত বলিয়া 'হিদায়েৎ উল্ মোমিনিন' গ্রন্থে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল স্যার মহম্মদ ইকবালও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। "Surely we have out Hindued the Hindu himself; we are sufferiug from a double caste system—religious caste system, sectarianism and the social caste system which we have learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which the conquered nation revenged themselves on the conquerors."[১৮৩] ("নিশ্চিতরূপে আমরা হিন্দুদেরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছি; আমরা দুই প্রকার জাতিভেদ প্রথা হইতে ভুগিতেছি, - ধর্মে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, ও সমাজেও জাতিভেদ, যাহা আমরা হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিয়াছি বা উত্তরাধিকার সূত্রেপাইয়াছি। যে সকল শান্ত উপায়ে বিজিত জাতি বিজেতাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে ইহা তাহাদেরই অন্যতম।")

অষ্টাদশ শতকে ইসলামে সংস্কার সাধনের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন আরম্ভ হয়। আরব দেশের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাব আমরা দেখি বেরেলীর সৈয়দ অহমদের (১৭৮৬-

১৮৩১) 'তরীকা ই মহম্মাদিয়া'র 'জিহাদ' বা পুণ্যযুদ্ধ আহ্বানে ও ফেরাইজী অর্থাৎ হাজী শরীয়তুল্লা (১৭৮১-১৮৪০) ও দুদু মিঞা (১৮১৯-৬২) দ্বারা পরিচালিত শান্তিপূর্ণ সংস্কার আন্দোলনে। কিন্তু তিতুমীর (১৮২৭—৩১) ও কেরামৎ আলির (১৮০০-৭৩) উত্থানে ধর্মীয় সংস্কার প্রয়াস সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বহুমুখী ব্যাপারে পরিণত হয়। গত প্রায় সার্ধ ছয় শতকে প্রসারিত হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় প্রক্রিয়া এইরূপে প্রতিহত হয়। এই সকল কারণে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাহা পরবর্তী অর্ধশতকে রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে।[১৮]*

পাদ-টীকা ও নির্দেশিকা

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'— বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ; 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'— ঐ, ভাদ্র, ১২৮০ ; 'বাঙ্গালীর বাহুবল'— ঐ, শ্রাবণ, ১২৮১।

২। J. N. Sarkar, ed. **Hist. of Bengal**, ii (1948), **Bibliography, p. 501**

৩। Ibn Battuta, **Travels**, tr. by H. Gibb (Hakluyt) ; **The Rehlah of**…tr. & ed. by Mahdi Husain, Baroda, 1953.

Mulla Taqia (Taqqaya), 16 century ; **Bayaz**, see S.H. Askari, **Bengal, Past & Present**, 1948.

আবদুল লতিফ গুজরাটের অন্তর্গত আহমেদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি আগ্রা হইতে রাজমহল (বর্তমানে বিহারে অবস্থিত) পর্যন্ত নৌকায় স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। ইহা এক মূল্যবান উপাদান। এমন কি ইহাকে আইন-ই-আকবরীর বিহার-বাংলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণের সম্পূরক বলা যাইতে পারে। স্যর যদুনাথ ইহার সম্ভবতঃ একমাত্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া বিহার সম্বন্ধী অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। **JBORS Vol. 5, Pt. iv. PP. 60**'-3.

মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের সামাজিক ইতিহাসের ধারণার অভাব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত **History of History Writing in Medieval India, Col. 1977.**

৪। দ্রষ্টব্য মৎলিখিত 'Survey of Medieval Indian Historiography' in **Quarterly Review of Historical Studies, 1963-64.**

৫। গ্রন্থসূচী দ্রষ্টব্য।

(ক) প্রয়াত মনীষিগণ – হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সুশীলকুমার দে, বিমানবিহারী মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য।

(খ) জীবিত মনীষিগণ—সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, সুখময় মুখোপাধ্যায়, তপনকুমার রায়চৌধুরী ও অন্যান্য।

(গ) পাকিস্তানের (পূর্বের পূর্ব-, অধুনা বাঙ্গলাদেশের) মনীষী—এ. বি. এম.

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী স্মৃতি বক্তৃতা

হবিবুল্লাহ, আবদুল করিম, এ. রহিম, এনামুল হক, মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অন্যান্য।

নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব পুনর্মুদ্রিত—

৬। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের গ্রন্থসূচীর জন্য দেখুন M. R. Tarafdar, **Husain Shahi Bengal** (1965) ; J. N. Sarkar, **History of Bengal.** ii (1948)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য – সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ; বৈষ্ণব গ্রন্থের জন্য—বিমান বিহারী মজুমদার, চৈতন্যচরিতের উপাদান।

মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে অনেক সময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় জানা যায়। মহম্মদ ঘুরীর মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল ও ফার্সী ব্যতীত দেবনাগরী ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

৭। এই বিষয়ে আমি জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮০তে এসিয়াটিক সোসাইটিতে বিমানবিহারী বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছি – Thoughts on Trends of Cultural contact in Medieval India (in press).

৮। লেখকের প্রবন্ধ 'Sir Jadunath Sarkar and His Historical Writings„ JBRS. 1960 দ্রষ্টব্য। যদুনাথ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে যে পত্রালাপ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে আছে।

R. C. Majumdar. **Historiography in Modern India,**

দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত **History Writing ; Thoughts on Indian History.** Presidential Address, Indian History Congress, Calicut, 1976.

৯। বাংলায় তুর্কীবিজয়ের কারণগুলির পূর্ণ বিশ্লেষণ হয়ত এখানে অবান্তর হইবে। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘশক্তির অভাব-জনিত দুর্বলতা ও সামাজিক জীবনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্রের অভাব ছিল অন্যতম কারণ। শৌর্যে ও দক্ষতায় বাঙালীরা ন্যূন ছিলেন না কিন্তু শাসকবর্গ রণবিদ্যায় রণকৌশলে ও অস্ত্রশস্ত্রে কালানুযায়ী কোন পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুধাবন করেননি। তাঁহারা গতানুগতিকতাই মানিয়া লইয়াছিলেন ও বাহুবল অপেক্ষা মন্ত্রবলের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করিতেন। যে রাজশক্তি রণ-শৌর্য অপেক্ষা গ্রহানুকূল্য ও মন্ত্র-তন্ত্র স্বস্ত্যয়নের উপর অধিক নির্ভর-শীল ছিল তাহার ভিত্তির দৃঢ়তা সহজেই অনুমেয়। শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হইলে কি কর্তব্য ? এক রণনীতির পুস্তকে লিখিত আছে, শ্মশানের ছাই, বিশেষবৃক্ষের ছাল মূল বাটিয়া তূর্যের গায়ে লেপন করিয়া মন্ত্র পড়িতে হইবে ও নিজ কপালে তিলক কাটিয়া সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করিলে তূর্যের শব্দে বিজয়লাভ হইবে। সুকুমার সেন, **মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী**, ১-২, হইতে।

১০। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অধ্যায়, শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬)। সুকুমার সেন, **বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস** ১ম/অপরার্ধ, ১৩৪ ; Karim, **Social** History, 143-4,

১১। ভাষাগত পার্থক্যের পর অলবিরুণী লিখিয়াছেন; "Secondly they totally differ from us in religion, as we believe in nothing in which they believed, and vice versa......In the third place, in all manners and usages,

they differ from us to such a degree as to frighten their children with us, with our dress, and our ways and customs, and as to declare us to be devil's breed, and our doings as the very opposite of all that is good and proper......All their fanaticism is directed against those who do not belong to them,—against all foreigners. They call them **mlechchas** i.e impure and forbid having any connection with them, be it by intermarriage or any other kind of relationship, or by sitting, eating and drinking with them, because thereby, they think they would be polluted. They consider as impure anything which touches the fire and water of a foreigner......They are not allowed to receive anybody who does not belong to them, even if he wished it, or was inclined to their religion. This, too, renders any connection with them quite impossible, and constitutes the widest gulf between us and them.' Sachau, **Alberuni's India**, i.17-22.

১২। বিদ্যাপতির 'অবহট্ট' ভাষায় **কীর্তিলতার** বর্ণনার অর্থ বুঝিতে হইলে দেখুন সুকুমার সেন, **মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী**, ৬-৭।

হিন্দু ও তুর্কীরা একত্রে বাস করিতেছে। একের ধর্ম অন্যের উপহাসের খোরাক যোগায়। কেউ 'আজান' ডাকে, কেউ বেদ পাঠ করে। কারো সমাজে মেলামেশা, কারো সমাজে ভেদভাব প্রকট। পণ্ডিতদের কেউ বলে ওঝা, কেউ বলে খোজা। কেউ পালন করে উপবাস, কেউ 'রোজা' (রমজান)। কেউ ব্যবহার করে তাম্রকুণ্ড, কেউ বা কুজো। কেউ নমাজ পড়ে, কেউ করে পূজা। কত তুর্কী পথে যেয়ে বেগার ধরে (forced labour)। ব্রাহ্মণ বটুকে (বড়ু) ধরিয়া মস্তকের উপরে গরুর রাঙ (হাড়) চড়াইয়া দেয় (ধর্মনাশের জন্য)। তাহারা ফোঁটা 'চাটে' (তুলিয়া দিয়া), পৈতা ছিঁড়িয়া দেয় ও ঘোড়ার উপর চড়াইতে চাহে। তাহারা ধোয়া উঁড়িধানে মদ চোলাই করে, মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করে। ধরণী পূর্ণ হইল কবরে ও গোমঠে, পা ফেলিবার এতটুকুও স্থান নাই। হিন্দুকে বলে, 'যাও, দূর নিকালো'। তুর্কী ছোট হইলেও বড়কে মারিতে যায়।

১৩। সুশীলা মণ্ডল, বঙ্গদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ ঃ প্রথম পর্ব (১৯৬৩) পরিশিষ্ট ঘ।

১৪। Arnold, **Preaching of Islam** (1913), 279, 280 ; Titus, **Islam in India and Pakistan**, 44-4` (1930) ; Herklots, Ja'afar Sharif, **Qanun-i-Islam.** Crooke's edn, 3-4, 6-7 ; **Sunya Purana, op cit**

১৫-১৬-১৭। Karim, **Social History**, 143-4 ; R. C. Mitra, Decline of Buddhism, **Visva Bharati**, 1954, pp 78-79, 81 ; Hunter, **Indian Muslims** 145-7 ; Census Reports, India (1911), i, 128 ; **Bengal** (1901) i. 156f ; (1911), i, 202 ff, 248 ; my **Islam in Bengal**, 21-23 ; **Sekh Subhodaya** ed by S.Sen; সুকুমার সেন, **বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস** ১ম/পূর্বার্ধ, ৭৯ ; ১ম/অপরার্ধ, ১৩৩-৪

১৮। **JASB**, 1867, p. 132 ; 1952, Intro ; Abdul Wali, **The Mohamme-**

dan Castes of Bengal; K. F. Rubbee, **Origins of Mussalmans of Bengal**, সুকুমার সেন, **মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী**, ২৭-২৯ : বৃন্দাবন, **চৈতন্যভাগবত**, আদি, ১৪। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের ছিল বিপরীত মনোভাব। তাহাদের নিকট কোন যবনের হিন্দুয়ানী আচার অসহ্য ছিল। কারণ তাহাতে শাসকজাতির মর্যাদা হানি হয়। যবন হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর নালিশের ভিত্তিতে মুলুক-পতি অকথ্য নির্যাতন করে।

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার
ভালমতে তারি আনি করহ বিচার।

ব্রাহ্মণগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠজাত মনে করিত দেখিয়া মুসলমানরাও নিজেদের 'মহাবংশজাত মনে করিত। মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুরা যেমন ছুঁত বিচার করিত, মুসলমানরাও হিন্দুদের সম্পর্কে সেইরূপ করিত। মুলুকপতি সুলতান হুসেনশাহ হরিদাসকে বলেন—

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত। (চৈতন্যভাগবত, আদি, ১১)

দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, **মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী**

১৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, **চৈতন্যচরিতামৃত**, মধ্য খণ্ড, ২৫ পরিচ্ছেদ।

এক দীঘি খননের সময় সুবুদ্ধি তাঁহার কর্মচারী সৈয়দ হুসেন খানকে তদারকীর গাফিলতির জন্য বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই কর্মচারীই সুলতান হুসেন শাহ হইয়া পূর্ব মনিবকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার বেগম তাঁহার দেহে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া সুবুদ্ধিকে হত্যা করিতে তাঁহাকে প্ররোচিত করেন। সুলতান রাজী হন নাই, কেননা "আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।" তখন বেগম তাঁহার জাতিনাশ করিতে বলেন। তাহাতেও সুলতান আপত্তি তুলিয়া বলেন যে জাতিনাশের পর সুবুদ্ধি জীবন রাখিবেন না। অবশেষে স্ত্রীর নির্বন্ধে সুলতান তাঁকে "করোয়ার পানী (অর্থাৎ অখাদ্য) মুখে দেওয়াইলা।" তাহাতে সুবুদ্ধি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী যান। সেখানে স্মার্তপণ্ডিতগণ বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুমোদন করায় তাঁহার সংশয় দূর হয় নাই। পরে শ্রীচৈতন্যের উপদেশানুযায়ী বৃন্দাবনবাসী হ'ন।

Ja'afar Sharif, 4; R. C. Majumdar (ed) **বাঙলার ইতিহাস** (মধ্যযুগ), অধ্যায় ১২, পৃ, ২৪৪; **Hist & Culture of Indian people, vol v.** ch. 16 (by M. W. Mirza); O Malley, **Khulna Dt. Gaz.** (1908), 6..

20। Abdul karim, **Social History**..... chs. 2, 3 pp 17-18; K. M. Sen, in **Cultural Heritage of India**; Titus, **op cit**, 44-45; Ja'afar Sharif, **opcit**, 3; Risley, **Tribes & Castes of Bengal**, **The pepole of India** ed. Crooke.

২১। Karim, **Social History**, 124; J. Wise, JASB, 1873, No. 3; Arnold, 280; Ibn Battuta, Tr. Yule, **Cathay & the way Thither, iv.** 151; **সুকুমার সেন**, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ১

২২। Karim, **op.cit**, chs 2, 3; **Ja'afar** Sharif, 1,6-7, quoted in my **Islam in Bengal**, 21-22.

বিজয় গুপ্ত, **পদ্মপুরাণ**, সম্পাদিত বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য, পৃ ৫৬ ; আবদুল করিম, **বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ** ১ম ভাগ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০, পৃ ১৫৯ । বদর সাহেব, দেখুন এনামুল হক, **বঙ্গে সুফী প্রভাব**, ১৩২-৩ ।

২৩। পীরদের অলৌকিক কার্যাবলী সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। ক) পীর শাহ জালাল সিলেট-মক্কা-সিলেট প্রতিদিন যাত্রা করিতেন Rehla of Ibn Battuta, 238-4)) ; (খ) চট্টগ্রামের পীরবদর মাছী সওয়ার হইয়া আরবদেশ হইতে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় আসেন। তাঁহার প্রদীপের আলোয় (চাটি) উদ্ভাসিত ভূখণ্ডের নাম চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম। পূর্ববঙ্গের হিন্দুমুসলমান মাঝিমাল্লারা যাত্রার পূর্বে বদর গাজীর গান করে ও তাঁহার নামে সিন্নি বা জল দেয়। (গ) সুন্দরবনের ঘুটিয়ারী শরিফে পীর মোবারক আলি ও ভ্রাতা কালু গাজী হিন্দুমুসলমান উভয়েরই পূজ্য (ঘ) আবার সুন্দরবনের দক্ষিণরায় 'গাজী' ব্যাঘ্রদেবতা বা হিংস্রপশুদেবতা বলিয়া উভয় সম্প্রদায়েরই উপকারী হিসাবে সম্মানিত।

২৪। মৎ প্রণীত **Islam in Bengal**, 21

২৫। **J. Sarker, ed. Hist of Bengal, Vol.2.**

মুসলমান কবিদের উপর বৈষ্ণধর্মের প্রভাব, দ্রষ্টব্য যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংগালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি (১৩৫৬)। সুকুমার সেন, **মধ্যযুগে বাঙালা ও বাঙালী**, 2[illegible]।

ডঃ সেনের মতে ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে সুলতানী রাজশক্তির বিলোপ না হইলে হয়ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও জাগরণ হইত। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বৈষ্ণবধর্ম প্রান্তীয় বাঙলাকে ভারতের সহিত যুক্ত করিল। রাজনৈতিক ইতিহাসে বাঙলা আকবরের মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল। মুঘল প্রশাসন রাজস্ব সংগ্রহের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় বাঙলার স্বাধীন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের পথ অবরুদ্ধ হয়। মুঘলশক্তির ভয়ে বাঙালীর বাহুবলও ক্রমশঃ হ্রাস পায়। প্রসংগতঃ বলা যাইতে পারে ভক্তিধর্মের প্রসারও ইহার জন্য অংশত দায়ী। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-আচরণে ও প্রচারে দুর্বলতার আভাস ছিল না। তিনি কাজীর আদেশ অমান্য ও সদলে তাহার বাসস্থান ঘেরাও করেন। ইহা সত্যাগ্রহ passive resistance নীতির প্রথম প্রকাশ। কিন্তু তাঁহার "অন্তরঙ্গ সাধনা রসধর্ম" সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইয়া বিষ্ণুপুর সহ বাঙলা ও উড়িষ্যায় নিবীর্যতার বীজ উপ্ত করে।

২৬। **Zakhiratul Mulk**, সর্তগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত R. C. Majumdar (ed) **Delhi Sultanate.** ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের স্থান তত্ত্বগতভাবে পাওয়া যাইবে Quran ix 29 ; **Encyclo Islam (Zimmi, djaziya)** ; Barani, **Fatawa-i-Jahandari**, ed. & tr by M Habib & Mrs. Khan ; **Tarikh i Firuzshahi.** E & D. iii : khadduri, **Laws of Peace and War in Islam** ; **Sources of Indian Tradition** (1958); 489-90, J Sarkar, **Aurangzib**, Vol iii Hindustan **Standard**, Puja No. 1950

২৭। R C. Majumdar(ed), **Delhi Sultanate.**

২৮। **Tarikh i Wassaf**, E & D. iii.42-44 ; iv. 447 ; Ferishta ; **Tabaqat -i Akbari**, iii 597 ; See R C Majumdar, **Delhi Sultanate for instances.**

২৯। **Rehla** of Ibn Battutah, GOS. c××ii, 123, 63, 123, 151 ; 241 ; 162-3 ; 228 ; 27 ; 124, 163, 185, 188, 196, 182 ; ×××iv,151-7, 183.

৩০। জয়ানন্দ, **চৈতন্যমঙ্গল**; দীনেশচন্দ্র সেন, **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য**, ষষ্ট সং ৩১৯-২০।

৩১। বিজয়গুপ্ত, **মনসামঙ্গল** (পদ্মপুরাণ), পৃ ৫৪ ও পরবর্তী।

৩২। ঈশান, **অদ্বৈত প্রকাশ**, অধ্যায় ৯, পৃ ৩৯

৩৩। কৃষ্ণদাস, **চৈতন্যচরিতামৃত**, আদি, অধ্যায় ১৭, পৃ ১২২ ও পরবর্তী ; মধ্য অধ্যায় ১ পৃঃ ১৩৮ ; অধ্যায় ১৯, পৃ ৩২৬ ; বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যভাগবত, অধ্যায় ২৩, পৃ ২৭১ ও পরবর্তী, অন্ত, অধ্যায় ৪, ৩৫৮

৩৪। সুলতান হুসেন শাহ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকে তাঁহাকে অসহিষ্ণু, অত্যাচারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কাজী ও মোল্লাগণ বহু অত্যাচার করেন (দ্রঃ চৈতন্যচরিতামৃত)। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ ৪২৬) উড়িষ্যার হিন্দুমন্দির ধ্বংসের উল্লেখ আছে। মাদলা পাঞ্জিকায় ইসমাইল গাজীর অধীনে পুরী ধ্বংসের (১৫০৯ উল্লেখ আছে। সুলতানের বিরোধী ঐতিহাসিকদের মধ্যে—রজনীকান্ত চক্রবর্তী গৌড়ের ইতিহাস (২য়) ; রাখালদাস ব্যানার্জী, বাংলার ইতিহাস (২য়), দীনেশচন্দ্র সেন, Hist. Beng. Lang &Lit ; R C. Majumdar, (ed) **Delhi Sultanate** ; **Hist. Med, Bengal.** আবার অনেকে তাঁহাকে উদারচেতা ও প্রজাহিতৈষী বলিয়াছেন। **Habibullah in Sarkar, ed Hist. Bengal** ii ; **M. R Tarafdar, Husain Shahi Bengal**.

৩৫। সুবুদ্ধি রায়ের ঘটনা দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৯।

উড়িষ্যা-পাদটীকা ৩৪। সনাতন,-চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, অধ্যায় ১৯, পৃ ৩২৬। চৈতন্য ভক্ত হইয়া সনাতন রাজকার্যে প্রায় অসুস্থতার অজুহাতে অনুপস্থিত থাকিতেন। সুলতানের আচমকা পরিদর্শনে তিনি ধরা পড়িয়া যান ও অবরুদ্ধ হন।

৩৫ ক। জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল, ১১-১২ ; বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যভাগবত ১৮, ৭৫।

জয়ানন্দ বলেন যে এই অত্যাচার শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণের পূর্বে, জালালুদ্দীন ফতে শাহ (১৪৮১-৮৭) এর সময়। তাহা হইলে ইহার জন্য হুসেন শাহকে দায়ী করা যায় না। সম্ভবতঃ সুলতান হইবার পরই তিনি গৌড় আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন তখন হিন্দুরা স্বভাবতই অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য Tarafdar, 65-67

৩৬। উদ্ধৃত সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী। ২৫-২৬।

৩৬ ক। মনসামঙ্গল, সম্পাদিত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, ৫৪-৬১। মনসা-বিজয়, সম্পাদিত সুকুমার সেন, ৬৩-৬৬। দ্রষ্টব্য Tarafdar, 341-42 ঃ

৩৭। **Wright, Catalogue, ii, 154-63 Pt. ii. pl. ii. nos. 52, 57, 66, 68etc.**

৩৮। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন—**Delhi Sultanate.**

৩৯। আমীর খুসরু, **Qiranus Sadain**, As. ms. ভূঁইয়া—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মধ্যযুগে বাঙ্গলা, ১২-১৩ ভাতুরিয়া দুর্গাচরণ সান্ন্যাল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।

৪০। সুকুমার সেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম/পূর্বার্ধ, ৯৩, ১০২

৪১। উপাধি কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি,

মহাচার্য, রায়মুকুট। পুরস্কার পাইয়াছিলেন—হার, কুণ্ডল, দশআঙুলে পরিবার রতনচূড়, ছত্র ও তুরগ।

৪২। পুঁথি কীটদষ্ট বলিয়া নাম জানা যায় নাই, তবে তাঁহার পিতার নাম ছিল জগদত্ত। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ৮-১৩।

৪৩। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ কর্ণাটদেশের রাজা বা ভূমিপতি ছিলেন। রূপেশ্বর বঞ্চিত হইয়া শিখরভূমে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দনের অনুরোধে নবহট্টক (নৈহাটী) গ্রামে বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দের পুত্র কুমারের তিনপুত্র,—সনাতন, রূপ ও বল্লভ। বল্লভের পুত্র জীব। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৪-১৫ ; বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম/পূর্বার্ধ ২৯২।

৪৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১০৪-১১।

৪৫। চৈতন্যমঙ্গল ; Sarkar, Hist Bengal ii 151 (Habibullah).

৪৬। Habibullah in Hist. Bengal ii. 135 ; সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৫।

৪৭। Habibullah in ibid. 151-2 ; সুকুমার সেন, ঐ। রজনী চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, ১০৪।

রামচন্দ্র খান প্রথমে চৈতন্যদেবকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। সীমান্তে উভয় পক্ষেরই শূলপোতা ছিল। পথিককে চর (জাসু) মনে করিয়া হত্যা করা হইত।

এই সকল রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারিগণের জন্য দ্রষ্টব্য—বৃন্দাবনদাস, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, পৃ. ৮, ৮২ (আদি) ; ২০৫ (মধ্য) ; ৩১৬, ৩৫০ (অন্ত্য) ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, ৭৬, ২৭৮, ২৯৩। সুখময় মুখোপাধ্যায় (পৃ. ২৬৪-৮৪) হুসেনশাহ দ্বারা নিযুক্ত ১৭ জন হিন্দু রাজ পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন।

৪৮। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৬।

চৈতন্যচরিতামৃতে এক প্রকার জমিদারের উল্লেখ আছে যাহাদের বলা হইত 'মজমুয়াদের' (majmu'adars)। পূর্বে সপ্তগ্রামের চৌধুরীর যে খাস সম্পত্তি ছিল তার খাজনা আদায়ের ঠিকা (farming) লইয়াছিলেন হিরণ্য দাস ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধন। আয় ছিল ২০ লাখ এবং খাজনা সরকারকে দিতে হইত ১২ লাখ। চৌধুরী বেগতিক দেখিয়া উজীরকে বলিলে হিরণ্য ও গোবর্ধন পলাইল কিন্তু গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস ধৃত হইল ও 'বাপ জ্যেঠাকে' আনিতে আদিষ্ট হইল।

৪৯। সুকুমার সেন, ঐ, ১৬—১৭। Sarkar, Hist, Bengal. ii. 151-2.

৫০। ঐ, ৫, ১৭। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে লিখিত সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্বে' অনেক পুরাণ উল্লিখিত আছে কিন্তু ভাগবত নাই, বৃহস্পতির 'পদচন্দ্রিকাতে'ও নাই।

৫১। বৃহস্পতি মিশ্রের অন্যান্য রচনা—(১) ব্যাখ্যা বৃহস্পতি—রঘুবংশ ও কুমার সম্ভবের টীকা ; (২) নির্ণয় বৃহস্পতি-শিশুপাল বধ টীকা ; (৩) পদচন্দ্রিকা অমরকোষের টীকা (১৩৫৩ শক / ১৪৩১-২)

৫২। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ৮—১৩।

৫৩। ঐ, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম / পূর্বার্ধ, ১০২।

৫৪। ঐ, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৬—১৭

৫৫। D.C. Sen, Hist. Beng. Lang. Lit. 222

৫৬। JASB (N.S.) V. 253.

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ে সুলক্ষণ।

৫৭। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৮

৫৮। D. C. Sen, op. cit, 202 and n ; সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৮।

৫৯। D.C. Sen, op,cit 204

৬০। Karim, Social History, 67f, 97f.

৬১। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ২০—১। ইসলামী বাঙলা সাহিত্য (সপ্তদশ) কামতা-কামরূপ, ত্রিপুরা, কাছাড়, দরঙ্গ, মল্লভূম, ধলভূম নামে সামন্ত কিন্তু বাস্তবে স্বাধীন বা স্বাধীনতা-লিপ্সু।

৬২। দৌলত কাজী আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মার লস্কর উজীর আশরফ খানের অনুরোধে কবি সাধনের ময়নাসতের হিন্দী (বা ভোজপুরী) মূল অনুসরণ করেন তাঁহার সতী ময়নামতী/লোর চন্দ্রানীতে। রচনার শেষ নিম্নসীমা ১৬৩৮। অসমাপ্ত।

আলাওল (অল্‌ অব্‌বুল, প্রথম) এর আসল নাম আরবী 'তখল্লুস' এর তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদ পরগণার জালালপুরের অধিপতি মজলিস কুতুবের এক সচিবপুত্র। (সয়ফুল মুলুক)। বৈচিত্র্যময় জীবনের এক অধ্যায়ে তিনি রাজা চাঁদেহুর (১৬৩৫-৫২)-কন্যা, সুধর্মার রাজ্যার্ধভাগিনী ভগিনীর পালিতপুত্র রাজকুমার ও প্রধান ওমরাহ মাগন ঠাকুরের আশ্রয়লাভ করেন। আলাওল কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

(১) মাগনের অনুরোধে লিখিত 'পদ্মাবতী' (১৬৫১) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। মূল অবধীর অল্প বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে, কেননা পাত্রপাত্রী যথাসম্ভব বাংলা ধাঁচে।

(২ মাগনের মৃত্যুর পর তিনি আশ্রয় পাইলেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মা (১৬৫২-৬৪) এর মন্ত্রী মহাপাত্র সোলেমানের সভায়। তাঁহারই ফরমাইসে আলাওল দৌলতকাজীর অসম্পূর্ণ 'সতীময়নার' উত্তরাংশ বা পরিপূরক রচনা করেন (১৬৫৮)।

(৩' ফারসী 'সয়ফুলমুলুক বদীউজ্জমাল' এর বঙ্গানুবাদ (১'৫৯) ও শেষাংশের অনুবাদ (১৬৬৯)।

(৪) পারসিক মহাকবি নিজামী গঞ্জবীর 'হপ্ত পয়কর' এর বঙ্গানুবাদ সপ্তপয়কর (১৬৬০)ও তাঁহার রচিত।

(৫) 'সিকান্দারনামার' বঙ্গানুবাদ (১৬৭১)।

(৬) পারসিক কবি ইউসুফ গদার 'তোহফা' তত্ত্বোপদেশের বঙ্গানুবাদ (১৬৬৪)।

(৭) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি গান।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ ১০৯। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ২১

৬৩। সুকুমার সেন, ঐ, ২৩-২৪; বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম/পূর্বার্ধ, ৯৬-১০০।

চতুর্ভুজ 'হরিচরিত' রচনা করেন সংস্কৃতে ১৪১৫/১৪৯৩। ইহা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ১৪ সর্গের মহাকাব্য। রূপ গোস্বামী তাঁহার পদাবলীতে অগ্রস্থ বহু কবির কৃষ্ণলীলাত্মক শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার 'উদ্ধব-সন্দেশ' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ এইখানেই রচিত।

এই অঞ্চলে মূর্তিশিল্পেও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইত। কানাই নাটশোলা গ্রামে শ্রীচৈতন্য চিত্রে অথবা স্থাপত্যে কৃষ্ণলীলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

৬৪। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ২৪

৬৫। ১২২৫/১৮১৮ স্বকীয়-পরকীয়বাদ লইয়া বিরাট বিচারসভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন উল্লিখিত স্থান হইতে পক্ষ-প্রতিপক্ষ দল আপন আপন সাক্ষী আনেন।

৬৬। দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, ঐ, ৮—১৩, ৩২, ৩৩ · ৩৭। ইজার অর্থাৎ izar, কাবাই অর্থাৎ qaba, লম্বা কোট।

৬৭। দ্রষ্টব্য ঐ ২৪—২৯। কাজীর উক্তি, কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৭ – ৬৫।

৬৮। R.C. Majumdar, Hist Medieval Bengal;

৬৯। চৈতন্য ভাগবত, উদ্ধৃত, সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ১৬

৭০। মালদা অভিলেখ (Inscription) ৯৩৮/১৫৩১ (JASB, 1874, p 308), Gaur Inscription 941/1535 (JASB 1872, 339).

৭১। বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, ৫৯

৭২। ঐ, ১৭৯ ৭৩। বৃন্দাবনদাস, চৈতন্য ভাগবত, আদি, ১৭,৬৭.

৭৪। দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, মধযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ২৬—২৭

৭৫। **Camb. Hist, India**, Vol. 3. (S, Chand edn); H.C. Ray, **Dynastic History of India**. Vol. I. (Ch on Sind).

৭৬। Tarikh-i-Firoz Shahi ; Sarkar, **Hist Bengal**. ii-61.

৭৭। Hist Bengal ii-59. ৭৮। Sarkar, **Hist Bengal**, ii. ch iv.

৭৯। Majumdar, **Hist Medieval Bengal**, 247

৮০। Ferishta (Lucknow ed.) ii 297.

৮১। প্রথম বক্তৃতা দেখুন।

৮২। I.H. Qureshi, **Administration of Delhi Sultanate**. Agha Mahdi Husain, **Tughluq Dynasty** ৮৩। Mahdi Husain, op, cit.

৮৪। ক্ষিতিমোহন সেন, মৎপ্রণীত **Trends of Cultural Contact in Medieval India** (Letures in The Asiatic Society, 1980, **In press**).

৮৫। **Ain-i-Akbari**, Jarrett and Sarkar, ii.

যে সকল সরকারের হিন্দু নাম ছিল—লক্ষণাবতী (লক্ষ্নৌতি), পূর্ণিয়া, তাজপুর, শ্রীহট্ট, সোনার গাঁ, চাটি গাঁ, সাতগাঁ, মন্দারণ, তান্ডা, ঘোড়াঘাট—১০।

যে সকল সরকারের মুসলমান নাম ছিল—বরমকাবাদ, মামুদাবাদ, খলিফতাবাদ,

ইসলামপুর (বাকলা), সুলেমানাবাদ, সমীমাবাদ, নসরৎশাহী, পিঁজরা, ফতেহাবাদ—৯।

৮৬। **Majumdar, op.cit, 250.**

৮৭। সুশীলা মণ্ডল, **বঙ্গদেশের ইতিহাস**, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব।

৮৮। **Majumdar, op.cit,** 243—252.

৮৯। হুসেন শাহের সময় চতুরঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণ ধর্মান্তরিত হইয়া খুলনার সেনের বাজার গঞ্জে মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁহার মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র সুধী খান ও সুচী খান তত্রস্থ কাজী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্মণ বংশজাত বলিয়া গর্ববোধ করিলেন।

৯০। ধর্মান্তরের পরও পূর্ব আচার-ব্যবহার ও লৌকিক প্রথা ত্যাগ করা সম্ভব হইত না অনেক সময়ে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

৯১। Sarkar, Hist of Bengal ii ; Abid Ali Khan, **Memoirs of Gaur and Pandua.**

মালদহে বড় দরগা বিরাট হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির উপর নির্মিত হয় (১৩৪১ খৃঃ), আলি মবারক শাহ দ্বারা পীর জালালুদ্দীন মকবুল শাহের দরগার জন্য।

৯২। তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রতি পৌষে একটি পশুমেলা হয়, কারণ তাঁহার পশুপ্রীতি ছিল স্থানীয় কিংবদন্তী।

৯৩। সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) গোপীনাথকে প্রথমে অর্থমন্ত্রী, নৌবলাধ্যক্ষ ও পরে উজীর নিযুক্ত করেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পুরন্দর নামক স্থানে তাঁহার জয়ের জন্য সুলতান তাহাকে 'পুরন্দর খান' উপাধি দেন। (দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, 'বংশ গৌরব, কায়স্থ-তত্ত্ব ও পটলডাঙ্গা বসু মল্লিক বংশের ইতিহাস, কলিকাতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩০-৩৩; উদ্ধৃত **Bengal Past and Present, July-Dec.** 1979 in Raja Subodh Chandra Mallik and his Times, by Amalendu De. সুতরাং গোপীনাথ যে কেবল সুশাসক রণকৌশলী ছিলেন তাহা নহে; তিনি এক উদারচেতা হিন্দু জমিদার ছিলেন। শুধু হিন্দু সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা-পূর্ণ ব্যবহারও সমর্থন করিতেন।

৯৪। প্রতি মঙ্গল বা শনিবারে বাতের রোগীরা স্থানীয় ধবধবির মেলায় সমবেত হইয়া ঔষধ প্রার্থনা করে। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে দরগার মাটি বাতক্লিষ্ট স্থানে প্রলেপে বাত নিরাময় হয়।

৯৫। ধর্মান্তরের পরও হিন্দু নামে পীর পরিচিত হইতেছে ইহা তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ মুসলিম পীরেরও হিন্দু নাম রাখিতে সমসাময়িক গোঁড়া মুসলিম সমাজে আপত্তিকর মনে হয় নাই। মুসলমানেরা বিসূচিকার দেবী 'ওলা' নামকেও লইয়াছে।

৯৬। হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের চিহ্ন বহন করিতেছে এই সমস্ত মসজিদ ও দরগা। পাণ্ডুয়ার বেশীর ভাগ মসজিদই মন্দিরের রূপান্তর। ঢাকায় পালরাজধানী রামপালের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের ধ্বংসের উপরই বাবা আদমের মসজিদ কাজী কসরা গ্রামে নির্মিত হয় (১৪৮৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের ৫ মাইল দূরে গয়সাবাদ দরগার কয়েকটি প্রস্তর সম্ভবতঃ মহাস্থানগড় বৌদ্ধ স্তূপ হইতে আনীত। কাটোয়া মহকুমা হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত

মঙ্গলকোটে কয়েকজন ফকিরের কবর ব্যতীত যে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে তাহার ভিত্তি হিন্দু মন্দিরের অনুরূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট। সপ্তগ্রাম জয়ের পর ত্রিবেণীর কূলে জাফর খান এক প্রাচীন মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁহার মরদেহ ইহারই ভিতরে শায়িত। বদর সাহেব, দেখুন এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, ১৩২-৩।

৯৭। James Wise, Eastern Bengal, 6, 9,

৯৮। Irvine, Army of the Indian Mughals, 202 ; Siyar, i. 44, ii. 387 ; Ja'afar Sharif, 84 : Meer Hasan Ali, **Observations on the Musalmans of India,** ed. by W. Crooke, i. 70.

মোগল বাদশাহগণ যুদ্ধাভিযানের পূর্বে যাত্রারম্ভের শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত সম্পর্কে জ্যোতিষীদের উপদেশ লইতেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে ফারুখশিয়ার জ্যোতিষীদের পরামর্শ লইয়াছিলেন।

৯৯। Ja'afar Sharif, 2, 3, 6, 31, 52, 54, 338, 341—2 ; Mrs. Ali, i. 294—9 ; JASB. XIII (1852), 350.

১০০। Wise, **Eastern Bengal,** 50 ff ; E & D. vi. 376 : Sleeman, **Rambles and Recollections,** ii. 238 ; **Cal Review,** vol. 33 No. 64 (1859) p. 254 ; JASB. i. 1832. 490 ; JRAS, vol. 13 1852), 350. ওলা বিবির জন্য দ্রষ্টব্য অমলেন্দু দে, **ইতিহাস,** পূর্বোক্ত। কালিকাতলায় বনবিবির মেলা ফেব্রুয়ারীতে ও তালদীতে শীতলামাতার মেলা জুনে বসে। Dt. **Hand Book, 24 Parganas;** op, cit.

১০১। JASB. i (1832), 492 ; **Qanun-i-Islam,** 133, 140, 195 , Mrs. Ali i. 46, 51, 350 ; **Cal. Christian Observer,** Nov. 1835, quoted in **Anglo-India** ii, 65 ; JASB (1832), 493.

১০২। **Insha i Mahru** JASB (1923), 280 ; Cunningham **Hist. of Sikhs,** 31 ; JASB, i. (1832), 494 ; Mrs. Ali, i. 7-8 ,Martin, **Eastern India,** i. 49, 145—6 ; ii. 111—12 ; iii. 150—2, 517.

সপ্তদশ শতকে ফরাসী পর্যটক Bernier বলেন, The embroiderer brings up his son as embroiderer, the son of a goldsmith becomes a goldsmith and a physician of the city educates his son for a physician, No one marries but in his own trade or profession and the custom is observed almost as rigidly by the Muhammadans as by the Hindus". Bernier, 258.

১০৩। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ৩৭-৪০ ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, Hist. Medieval Bengal, 195 ff.

১০৪। বৃন্দাবনদাসে তান্ত্রিকচক্রের বর্ণনা আছে।

১০৫। বৃন্দাবনদাস পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে মনসাপূজার আতিশয্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বিপ্রদাস পিপিলাই পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে মনসামঙ্গল রচনা করেন। গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ স্মৃতিগ্রন্থে ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমে এই পূজাকে বর্ষকৃত্যের মধ্যে বিবৃত করিয়াছেন।

১০৬। হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' ও নিত্যকৃতের মধ্যে বৈদিক মন্ত্রে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১০৭। বাসন্তী ও শারদীয়া পূজাও বহু প্রাচীন। তবে চতুর্দশ শতকের প্রাক্কালে শারদীয়া বাঙালীর প্রধান উৎসবে পরিণত হয়।

১০৮। শাখোট-বাসিনী বনদুর্গা, ধনপতি কাহিনীর মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। কালকেতু কাহিনীর দেবী পৌরাণিক গোধিকা-বাহিনী চণ্ডীর খোদাইকরা অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি (অষ্টম-নবম শতাব্দীর) পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল গানের বিশেষ প্রচলন ছিল।

১০৯। ইহার প্রথম ব্যবস্থাপক ছিলেন অদ্বৈত আচার্য।

১১০। বৈষ্ণব-আচার মন্নভ্রমে আবশ্যিক গণ্য হয়। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে 'হাস্যকরভাবে ইহা বাধ্যতা-মূলক হয়'। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্ম-মঙ্গলে লিখিয়াছেন, রাজ্যের সহিত রাজাও একাদশী করেন। এমন কি হাতীঘোড়ারও খাদ্য বন্ধ হয়ে যায়, 'চারা মানা হাতীকে ঘোড়াকে মানা ঘাস'।

১১১। যথা নীলাচলের জগন্নাথ ; জাজপুর (? কোনার্ক ধর্মঠাকুরের অন্যতম পীঠ) ; বর্ধমানের 'কাস্যড়ার বন্দো ধর্ম বল্লুকার তীরে' ; জাড়গ্রামের (ঝাড়িখণ্ড) কালু রায় ; মঙ্গলকোটের জয়চণ্ডী ; ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, শেহাখালার বাসুলী, লাউ গ্রামের দণ্ডেশ্বরী ; গোতানের বিশালাক্ষী ; নেওড়ের নালু ; গবপুরের কাঁকড়া বিছা ধর্মরাজ ; পাত্রসায়রের কালঞ্জর রায় ; তালপুরের ষষ্ঠী বুড়ি ; 'পুড়োসের ঘাটু' ; 'হিড়িমার চণ্ডী ; (দক্ষিণ বঙ্গের) কালু রায় ও দক্ষিণ রায়।

১১২। JASB.i. (Nov. 1832), 489 ff ; Hughes, **Notes on Muhammadanism** ; **Dictionary of Islam** , R. C. Majumdar (ed,) '**Delhi Sultanate** ch. 16, 17 ; M. R. Tarafdar, **Husain Shahi Bengal** ; Yasin, **Social History** ; Rizivi, **Muslim Revivalist Movements** ; Aziz Ahmad, **Studies**···

১১৩। A.Karim, **Social History**···ch 5,158—9, 162 ; Census Report (1911) I. Pt, 1—118 ; **Ency. Islam, ii, 491** ; K.K. Datta, **Survey**···4 ; Wylie, **Bengal as a Field of Missions,** 318 , M. A, khan, **Faraizi Movement, ch.** 1, 2, See B.

১১৪। বাংলা সাহিত্য হইতে আহরিত তথ্য,—চৈতন্য ভাগবৎ ; বিজয়গুপ্ত, পদ্মপুরাণ ; মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, ৩৪৫-৬ ; A Karim, Social History, ch. 5, 158-75.

১১৫। ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় **মধ্যযুগের সাধনার ধারা**

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে বহু পীরের পূজার উদ্ভব হইয়াছিল, —যথা সত্যপীর, মানিকপীর, কালুগাজী, বড়খাঁ গাজী ইত্যাদি। ইঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর।
দুই কুলে লয় সেবা হইয়া জাহির॥

কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ৩০ ঃ আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত (১৯৪৫)।

দ্রষ্টব্য যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ৩৬, ১৪২।

Ency. Religion & Ethics, x. 40, A. Karim, **Social History**... 162-170, 201, 88, 90, 134 ff ; M. Garcin de Tassy, **Musilman Saints of India** in Asiatic Journal (1831), iv. 75-6 ; vi (Aug, 1831), 222 ; M. A. Khan, Faraizi Movement, ch I. See. B ; K. R, Qanungo in Sarkar (ed,) **Hist of Bengal** ii 69-70. ডঃ কানুনগোর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১১৬। সুকুমার সেন, মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালী, ৪১-৩।

১১৭। পীর ইসমালি অর্থাৎ ইসমাইল। পাঠান্তর—পীরিসমালী সঙরিয়া (অর্থাৎ স্মরণ করিয়া) পথে চল্যা যায়/মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়। পাড়ুয়া অর্থাৎ পান্ডুয়া। 'সুফী খাঞে', শুভি খাঁ ?। 'বড় পঁএরায়' অর্থাৎ 'বড় পাড়ুয়ায়'। কুতুব আলম, নুর' কুতুব আলম, গণেশের সম-সাময়িক। 'বদর আলম', পীর বদর। ত্রিপিনি, ত্রিবেণী। 'বিরাম শক্করা', বহরাম সক্কা। 'পেকাম্বর', পয়গম্বর।

১১৮। সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পীরেরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহারা রোগ নিরাময় করিতেন, দরিদ্র, নিঃস্ব ও রুগ্ন ব্যক্তিদের দুঃখ ও যন্ত্রণার লাঘব করিতেন ; বন্ধ্যা রমণীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইতে পারিতেন . একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইতে পারিতেন ; ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন ; এমন কি মৃতব্যক্তিকে প্রাণদান অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটাইতে সক্ষম ছিলেন ; এবং ইচ্ছা করিলে কোনস্থানে প্রবল বর্ষণও ঘটাইতে পারিতেন। জনশ্রুতি আছে ত্রিপুরার জগন্নাথপুরের শাহ করিম আলি এইরূপ করিয়াছিলেন। Asiatic Journal, vi (1831), 354-5 ; JASB vol. 43 (1874 ; pt I. No. I. 96 ; vol, 63 (1894), pt. 3. no I. 38. গঙ্গাসাগরের কাছে বিখ্যাত পীর মছন্দলী সৈফ (? শরীফ) এর দরগা আছে। চড়ায় আটকান নৌকাকে আবার তিনি ভাসাইয়াছিলেন তাঁহার এই কথা অবিশ্বাস করার জন্য তিনি এক নাপিতের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। **West Bengal District Hand Book, 24 Parganas, xl iv.** Titus, 131 ; A R. Mullick, British Policy and Muslims in Bengal (1757-1858), 10-11 ; Hamilton, East India Gazetteer, ii, 608

১১৯। পাদটীকা নং ১১৫ দ্রষ্টব্য।

১২০। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিবার কয়েকটি বিশেষ পন্থা ছিল। উৎকৃষ্ট ফসল হইলে পর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ পক্ক চাউলের নৈবেদ্য প্রদান করা হইত ; অথবা কোন দুর্যোগ বা মহামারী এড়াইতে ধান্য বা বাতাসা দেওয়া হইত।

James Wise, The Muhammadans of Eastern Bengal in JASB. vol. 63. (1894), pt. 3. no. I. 37 ; Blochmann, Contributions to Geography and History of Bengal, JASB, vol.42(1873), pt. I, No. 3, 236-302 , pt. iii. No. I. 280-1 ; vol.43 (1874), pt. I. No. I, 89, 96 ; Buchanan in Martin **Eastern India**. ii. 635, 638, 640, 644-46, 660, 666, 667, 669, 352 (Gorakhpur) ; iii. 423, 447 Names of Saints given. দেখুন মৎ প্রণীত **Islam in Bengal**. 32-33। বদর উদ্দীন বদর ই আলম (বা চট্টগ্রামের পীর বদর) এর

কবর ছোট দরগা নামে প্রসিদ্ধ পাটনা জেলার বিহারশরীফে অবস্থিত।

১২১। মালদা জিলার (বর্তমানে রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত) শাহ মকদুম ও শাহ কুতুবের দরগার জন্য ২৮০০০ বিঘা নিষ্কর জমি প্রদান করা হইয়াছিল। দিনাজপুরের মুল্লা আতাউদ্দীন ও মনসুরগঞ্জের আবদুল কাদিরের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি নির্দিষ্ট ছিল।

Martin, **Eastern India**, ii. 645, 352, 660 ; iii. 59 ; **Asiatic Journal** vol. 6 (1831), 355-6 ; JASB i. (1832), 489-93 ; vol. 63 (1894), pt. 3. No. 1. 37.

১২২। পাদটীকা নং ১১৮ দ্রষ্টব্য।

১২৩। J, Wise in JASB. vol. 63 (1894), pt. 3, No. 1, p. 236 ; Blochmann in JASB vol. 42 (1873), pt. 1, No. 3 238 , Martin, **Eastern India**, iii. 458 ; **Siyar**, ii. 859, Karim, **Social History**. 173-5.

১২৪। **Asiatic Journal**, vol. 1 (1832), 142 ; JASB, vol. 53 (1894). pt. 3, No. 1, 38-39 ; Ja'afar Sharif, 272-3 ; J. Wise, **Eastern Bengal**; 12-20 ; Hodges, **Travels** 35 ; **Siyar** (Briggs) ii. 583 ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৭২।

১২৫। JASB vol. 63 (1894), 41 ; vol. 42 (1873), pt. 1 No. 3, p. 802 ; J. D. Anderson, **People of India**, 85।

পীর বদরকে Pas Goal Pearis Botheilo নামে এক পর্তুগীজের সঙ্গেও সনাক্ত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি ভাসমান শিলায় আরোহণ করিয়া তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হন এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

১২৬। **Statistical and Geographical Survey of 24 Parganas District**; R. Smyth in JASB, Vol. 63 (1894). pt.3. No. 1 pp. 40, 43 **Asiatic Journal**, Vol. 4 (1831), 75-6,

সালার মাসুদের জন্য দেখুন Elliot on **Mirat Masudi** হাজী ইলিয়াস তাঁহার কবরে গিয়াছিলেন।

মুহুররা গাজী (মবরা অথবা পীর গাজী মবারক আলি সাহেবের দরগা শিয়ালদহ-ক্যানিং লাইনে ঘুটিয়ারী শরীফে অবস্থিত। দ্রষ্টব্য **Census 1951 West Bengal** Dt. Handbook 24 Parganas, xl iv-v' 359. পীর গোরাচাঁদ বা গোরাই গাজীর কবর বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়ায় অবস্থিত, ibid, ciii. গাজীর সম্মানে জয়নগরের অন্তর্গত রক্তখানেও গান গাওয়া হয়। মজিলপুরের জমিদার কালিদাস দত্ত গানগুলির একটি পুঁথিও নিমপীঠে শ্রীপূর্ণচন্দ্র গায়েনের নিকট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অমলেন্দু দের প্রবন্ধ, 'ইতিহাস' নব পর্যায় বঙ্গাব্দ ১৩৭১ খণ্ড ৪, অংশ ৩।

১২৭। **Asiatic Journal**, op. cit, vol. 7 (1832), 56-7 ; Ja'afar Sharif, 241 ; Mrs Ali, ii, 821 ; Martin, **Eastern India**. ii, 110 ; iii. 147-8, 5 15.

শেখ মদার সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। উইলসন সাহেবের মতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি পারস্যে হইয়াছিল এবং বদি উদ্দীন নামে পরিচিত এক সুফী কর্তৃক

ইহা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। ভ্রমক্রমে তাঁহাকে এই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে পয়গম্বর বেহেস্তে পৌঁছিবার পূর্বে 'দম মদার' কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

১২৮। JASB. vol. 63 (1894), pt 3. No, 1. 43-44; 1854. I. 159; **Imp. Gaz** 1.433-6; Karim, **Social History**, 167—9; Ency. Rel. & Ethics, ix. 600.

১২৯। J. Wise, **E. Bengal**, 35.

১৩০। Martin, **Eastern India**, 108-110। Ja'afar Sharif, 291-3, 296.

১৩১। মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ষোড়শ শতকের শেষ), ৩৪৩-৪; পদ্মপুরাণ, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৫৪।

১৩২। Martin, Eastern India, ii 145, 445-6; iii, 512; D.C. Sen, 796-7.

১৩৩। ইহার নাম হরিদাস দত্ত। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ২৪৮।

১৩৪। R. K. Chaudhary, **Mithila in the age of Vidyapati, A Survey of Maithili Literature.**

১৩৫। দ্রষ্টব্য বিমান বিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান।

এই সকল নাম ব্যতীত আছে নরহরিদাসের ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, রঘুনাথ পণ্ডিত (১৫১৪) এর কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, গোবিন্দ দাস কবিরাজ (১৫৩০-১৬০০) এর সঙ্গীতমাধব পদাবলী ও কর্ণামৃতকাব্য, জ্ঞানদাস (১৫০২-১৬০০) এর পদাবলী। সুকুমার সেনের মতে (কর্মকার) গোবিন্দ দাসের কড়চা খাঁটি নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ ৩৭৪-৬।

১৩৬। সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৯,১৫।

১৩৭। বিপ্রদাসের আগে ও পরে কয়েকটি মনসামঙ্গল-রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। যেমন চতুর্দশ শতকের পূর্ববঙ্গীয় হরিহর দত্ত; পঞ্চদশ শতকের ময়মনসিংহ জেলার নারায়ণ ও ত্রিপুরা জেলার (মোহনশালে জন্ম) নারায়ণ দাসের পদ্মপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়; সুশীলা মণ্ডল, পরিশিষ্ট, ৫৩। মনে হয় সুকুমার সেন ইঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন নাই। তিনি পঞ্চদশ শতকের দ্বিজ বংশীধর ও ষোড়শ শতকের কেতকাচার্য ক্ষেমানন্দর উল্লেখও করেন নাই।

১৩৮। সুকুমার সেন, ঐ, ২৪১-৪। 'ঋতুশূন্য বেদশশী' অর্থাৎ ১৪০৬ শক/১৪৮৪ খ্রী. তারিখ তিনি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৩৯। সুকুমার সেন, ঐ, অধ্যায় ১৫। এই কাব্যের যে জনশ্রুতিমূলক আদি কবি ছিলেন মাণিক দত্ত তাহা মুকুন্দরামের পুরানো পুঁথিতেও স্বীকৃত। ইনি চতুর্দশ শতকে গৌড়ে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁহার পাঞ্চালী বলিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাকে সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতকের বলিয়া মনে করেন। প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬-৫০৭।

দ্বিজমাধব (বা মাধবানন্দের) চণ্ডীমঙ্গলের প্রাপ্ত পুঁথি ডঃ সেনের মতে 'জোড়াতালি রচনা'। তাঁহার বাসস্থান, পিতৃপরিচয় ও রচনাকালও অনিশ্চয়তাপূর্ণ (পৃ. ৫০৮-১৩)। নিবাস-? চট্টগ্রাম? নবদ্বীপ? সপ্তগ্রাম? পরাশর কে? সময়—ষোড়শ না সপ্তদশ শতাব্দী? সুশীলা মণ্ডল, পরিশিষ্ট, পৃ. ৫৪।

১৪০। সুকুমার সেন, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৪-৪৮। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত (পৃ. ৫২২-২৩) মানসিংহের উড়িষ্যা-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ; প্রাঃ ১৫৮৯-৯০)

১৪১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, Hist. Medieval Bengal

১৪২। জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক বরুণ, যদিও অন্যান্য বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইহা বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি কিন্তু অনেকে এই অভিমত গ্রহণ করেন না। সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড অধ্যায় ৭, পৃ. ১২৬-৭।

মধ্যযুগে এই পূজা বাঙলায় রাঢ় দেশে ও সীমান্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তবে একদা, চতুর্দশ শতকে সমগ্র বাঙলায় ও বাহিরেও প্রচলিত ছিল (যথা বিহারের "ছট পরব," কাশী, কোশল ও উত্তর ভারত)। উড়িষ্যার জাজপুর ইহার পীঠস্থান। সুকুমার সেন, ঐ, পৃ. ১৩২।

১৪৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া রূপে সৃষ্ট হইয়াছিল ('নারায়ণ পত্রিকা, মাঘ, ১৩২২)। সুকুমার সেন ইহার বিরুদ্ধে। রমেশচন্দ্র মজুমদার সেনের মতের বিরুদ্ধে।

ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কথা 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' স্পষ্ট বর্ণিত আছে ও ধর্মঠাকুর মুসলমানের বেশে আসিয়া সৎধর্মীদের রক্ষা করেন। ধর্ম কথার উদ্ধৃতির জন্য দেখুন সেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৬।

১৪৪। সেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬। পূজা পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও পুণ্যলাভে কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই। 'রেখ' সম্ভবতঃ রেখা বা পার্থক্যের প্রতীক।

১৪৫। ঐ, পৃ. ১৩৮।

১৪৬। ঐ, পৃ. ২১৫-৬।

১৪৭। শ্রী কল্যাণী মল্লিক, 'নাথ পন্থ' ; 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী ; 'নাথ পন্থ' বিশ্বভারতী, ১৩৫৭। নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গোরক্ষবিজয়, মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান ইত্যাদি।

১৪৮। সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ২২৫।

যদিও মীননাথের নাম ষোড়শ শতাব্দীতেও অপ্রচলিত ছিল না তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে লেখা মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়াছেন ডঃ সুকুমার সেন (খণ্ড ২য়, অধ্যায় ৮), পৃ. ২১৮।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক পীঠস্থান পাটিকা ভবন বা মেহের কুলের (বর্তমান ত্রিপুরা) রাজা মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দ (বা গোপী) চন্দ্র। ইঁহাদের কাহিনী বা গীতের কবি ছিলেন দুর্লভ মল্লিক, ত্রিপুরার ভবানী দাস, ও উত্তরবঙ্গের সুকুর মামুদ বা আবদুল সুকুর।

১৪৯। সুকুমার সেন, ঐ, পৃ. ২১৯।

১৫০। দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত Thoughts on Trends of Cultural Contact in Medieval India, (The Asiatic Society), in Press.

১৫১। ইসলামী বাংলা সাহিত্যের গবেষকগণ—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ, মহম্মদ শহীদুল্লা, এনামুল হক, মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সুলতান অহম্মদ ভূঁইয়া, সুকুমার সেন, ইত্যাদি। সুকুমার সেন ইহাকে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম বলিয়াছেন। 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য,' বর্ধমান, ১৩৫৮ সাল, পৃ. ৪।

১৫২। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ পৃ. ৫, ১৪।

১৫৩। জৌনপুরের শার্কী সুলতান হুসেন শাহের অনুচর। দিল্লীর ভয়ে পলাতক সুলতানের সঙ্গে বাঙলার হুসেন শাহের আশ্রয়ে গৌড়ে আসেন ও ৯০৯/১৫১২ এ 'মৃগাবৎ' লেখেন। সেন; ই. বা. সাহিত্য ৮-১০।

তিনজন কবি কুতবনের মৃগাবতীর অনুসরণ করেন। একজন মুসলমান (ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ)। অন্য দুইজন হিন্দু (সপ্তদশ শতকের শেষ)। দ্বিজ পশুপতির কাব্য মুসলমান পাঠক সমাজে পরিচিত ছিল। ই'হাদের পুঁথি অবলম্বনে চন্দ্রাবলী নামে একটি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। সু. সেন, বা সা ই. ৩৯-৪১। অন্যান্য রোমান্টিক কাহিনী ঐ পৃ. ৪১-৪৩

১৫৪। মহম্মদ জায়সী অযোধ্যার অন্তর্গত জায়স গ্রামবাসী। ৯২৩-১৫২০ এ কাব্য রচনা শুরু ও (শেরশাহের সময় অর্থাৎ) ১৫৪০ এর পর শেষ। মৃত্যু ১৫৪২। 'পদ্মাবৎ' শুধু 'অবধী সাহিত্যের নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা'। সু. সেন, ঐ পৃ. ১০; তাঁহার মতে হয়ত জায়সীও বাঙলাদেশেই ইহা লেখেন, কারণ সেখানেই পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথম প্রচার হয়। বা. সা. ইতি. ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃ. ৩৩০।

১৫৫। সু. সেন, ঐ, পৃ. ৩২১-২৬; বা সা. ই.

১৫৬। ঐ, ৩২৭-৪৩; ঐ; গ্রন্থগুলি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৫৭। ঐ, পৃ. ৩৪৪-৫; ঐ।

নিবাস—এনামুল হক, কবি সৈয়দ সোলতান, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪১ বর্ষ, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৮-৫৫। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মতে ইনি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লস্করপুরের প্রসিদ্ধ সৈয়দবংশে জাত। বঙ্গে মুসলমান কবি. পৃ. ১৩০-১।

নবীবংশ ঃ রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে, পুঁথির পাঠ নিয়ে। সুকুমার সেন এর মতে ১০৬৪ হিজরী ("দশ শত রস যুগে অব্দ")। ১৬৫৪-৫; তবে 'যুগ' শব্দের অর্থ ২ হইলে ১০৬২।১৬৫২-৫৩ হইবে—বা. সা. ইতি. পৃ. ৩৪৪-৫। যতীন্দ্রমোহন ভটাচার্যের মতে, ৯০৬ হিজরী ("গ্রহ শত রস যোগে অব্দ")।১৫০০ শেষ।

সৈয়দ সুলতান নবীবংশ লিখিবার কারণ দেখাইয়াছেন তাঁহার 'ওফাৎ-ই-রসুলে'। "সব বাঙালীরাই আরবী বোঝে না; কেহই ধর্মের কথা হৃদয়ঙ্গম করে না। সকলেই (হিন্দু) কাহিনী নিয়েই সন্তুষ্ট"। তিনি 'পরাগলী' মহাভারতের প্রভাব কাটাইতে নবীবংশ লেখেন। জৈনুদ্দীন ও শেখ চাঁদও নবীবংশ লেখেন।

১৫৮। "সেক শুভোদয়া' হইতেও ইহা জানা যায়। সুকুমার সেন সম্পাদিত।

১৫৯। পীর মাহাত্ম্য পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সেক শুভোদয়া, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৬০। ধর্ম ঠাকুর ফকির বেশী। রূপরাম চক্রবর্তী ('ফকির')। সু. সেন, বা. সা. ইতি. ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৪৯-৬৬।

১৬১। সু. সেন, বা. সা ই. পৃ. ৮০-১। নাম সম্বন্ধে আলোচনা, সু. সেন, বা. সা. ইতি. পৃ. ৪৫২-৫৫।

১৬২। ফৈজুল্লা পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিত পাচনা গ্রাম-বাসী।

উপাস্য ঃ আল্লা, মোহম্মদ মুস্তাফা পাঞ্জাতন পীর, রসুলের চার ইয়ার ও স্থানীয় পীর-পীরাণীদের সঙ্গে হিন্দুদের (খানাকুলের) গোপীনাথ, (বৃন্দাবনের) কৃষ্ণ-বলরাম, দেবকী, রোহিণী, শচী-ঠাকুরাণী, গোরাচাঁদের বন্দনা।

১৬৩। সু. সেন, বা. সা. ইতি. পৃ. ৪৬৩।

১৬৪। সু. সেন, বা. সা. ই. পৃ. ৮১।

১৬৫। সু. সেন, বা. সা. ইতি. পৃ. ৪৬৫ উদ্ধৃত।

কোন কোন রূপ-কাহিনী পীর মাহাত্ম্য-গাথায় উন্নীত হয়। যেমন (১) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণরাঢ়ের তাজপুরবাসী আরিফের 'লালমোহনের কেচ্ছা' বা কথা। (২) ফকিররাম কবিভূষণের 'শশীসেনা', 'শশীসেনা', 'সখীসোনা' বা 'সখীসেনা'। সু. সেন, বা. সা. ইতি. পৃ. ৪৬৫-৬ ; বা. সা. ই. পৃ. ৬৮-৮১।

১৬৬। 'মাণিক্য' শব্দের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মাণিকী (Manichee) গ্রীক Manikhaios) হইতে উদ্ভূত। ইনি ইরাণীয় ও জরথুস্ট্রীয় ও খৃষ্ট ধর্মমিশ্রণে নূতন ধর্মপ্রচারক (দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের)। সু, সেন, বা সা, ইতি, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ পৃ. ৪৬৬। 'মাণিক পীরের গীত' এর রচয়িতা আজিমাবাদে ধানসিঘো (? শিষ্যা) গ্রামবাসী 'অনাথ ফকির' (অষ্টাদশ শতকের শেষ)। সু. সেন, বা. সা. ইতি, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৬৬।

১৬৭। সু. সেন, বা. সা ই পৃ. ৮২-১০১ ; বা. সা. ইতি পৃ. ৫৩৮-৯, ৪৬৯।

আবদুল গফুরের 'গাজী সাহেবের গান' বা 'কালু গাজী-চম্পাবতী পাঁচালী'তে হিন্দু মুসলমান (দক্ষিণরায়-গাজী) সংঘর্ষ আছে ও দক্ষিণ রাজ্যের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর সহিত গাজীর বিবাহের উল্লেখ আছে। সৈয়দ হালু মিঞা -'বড়ে খাঁ গাজীর কেরামতি, আবদুল রহীমের 'গাজীর পুথি' (? ময়মনসিংহ বাসী)।

১৬৮। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি (১৯৪৫/১৯৬২) ইনি কবিতাগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি,' প্রকাশিত বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা।

দ্রষ্টব্য রমনীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ; ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সঙ্কলিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি,' ৪ খণ্ড। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুস্তকে (১৪৮-৫১) অন্যান্য প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুন্সী এক্রামুদ্দীন লিখিত প্রবন্ধগুলি মূল্যবান।

১৬৯। কারণের জন্য দেখুন ভট্টাচার্য পৃ. ১-৫। কেহ কেহ কি ভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইলেন নির্ণয় করা শক্ত।

মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তুলনীয় খ্রীষ্টান মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব না হইয়াও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী।

১৭০। য. ম. ভট্টাচার্য, পৃ. ১১৬।

১৭১। ঐ, পৃ. ১১০-১১, ১২৬ ; করুণাপদ দত্ত, Journal of Indian Research Institute vol ii. আলির দুই পুত্র ও শিষ্য। (১) আলির দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সর্ফতোল্লা। (২) এর্শাদুল্লাহ, অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি।

দ্রষ্টব্য-S. Sen, Hist of Bengali Lit. (1971), 148 ; Munshi Abdul Karim সাহিত্য বিশারদ, পুঁথি সংগ্রহ : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯১।

১৭২। লালনের নাম সুবিখ্যাত।

১৭৩। পরিচয় অজ্ঞাত, সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী। ইনি নিজেকে 'জনমের ফকির' ও গাজী

বলিয়াছেন। সমাধি মুর্শিদাবাদের কাছে। দ্রষ্টব্য সু. সেন, বা. সা. ইতি. ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৫৩৬।

১৭৪। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার নারায়ণ ডহরের নিকট বাওইডহর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম কালু।

১৭৫। দেহ হিঁ বুন্ধ বসন্ত ন জানই।

১৭৬। বস্তু আছে দেহ বর্তমানে। (বস্তু=তত্ত্ব)

১৭৭। 'He who knoweth himself knoweth God' **Sayings of Mahammad** by Sir A. Suhrawardy (1938), 53. তুলনীয় "I am He whom I love/And He whom I love is I./We are two spirits dwellng one body./If thou seest me, thou seest Him/And if thou seest Him/Thou seest us both." (R. A. Nicholson, **Islamic Mysticism**, p. 80) তুলনীয় কবীর বাণী (১ম খণ্ড, পৃ. ১৩-৪) মো কো কহাঁ ঢুঁড়ো বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ। /না মৈঁ দেয়ল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে, কৈলাস মেঁ॥ /কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব শ্বাঁসো কী শ্বাস মে। দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২ ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ২-৩।

১৭৮। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা।

১৭৯। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ১৭-২৪।

১৮০। গোলাম হুছন (=হুসেন) কে, কোথাকার বাসিন্দা জানা নাই। তবে রচিত গানটি 'আবাহন' পত্রিকায় ছাহ ছৈয়দ হাছান আলি লিখিত 'অসমীয়া' মুছলমানী পুঁথি শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত আঘোন, ১৮৫৪ শক/১৯৩২-৩৩ পৃ. ২২৩-২৪। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে তিনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টবাসী, বি ভা. পত্রিকা। গোলাম হুছনের ভাষা খুব শুদ্ধ নয়, বানানে অনেক ভুল আছে। কিন্তু ভাবের গভীরতা আর যোগের জ্ঞান প্রশংসনীয়। প্রথম দু লাইনের ভাবার্থ উপরে বোঝান হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন কথার অর্থ, —'আকাণ্ঠা কাণ্ঠের নাও' অর্থাৎ অপক্ব (বাজে) কাঠের নোকা। 'কাঞ্চুকুরা' অর্থাৎ কাঁচা (অপোক্ত) 'কুরা' (নৌকা ঠেলিবার লগি বা বাঁশ), 'কালা নিশান' (ঘন সবুজ বাঁশের রঙ কাল বলে মনে হয়) অর্থাৎ কাঁচা, অপক্ব, অবিশুদ্ধ ; 'শুধু রাধার সাজ' এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে কাপড় রাঙালে যোগী'। 'যবুনা' অর্থাৎ উত্তাল যমুনা বা কালপ্রবাহ। তার পরের ৬ লাইনে যোগসাধনার প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন কবি। 'আখির মাসে আখিগুলি……' আখি (আঁখি) অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু আবৃত না করে খুলে দেখ। 'নায়ের মাঝে ·····' দেহের মধ্যেই পরম দয়িতকে আবিষ্কার ও উপলব্ধি কর। পাদটীকা ১৭৭ দেখুন। উপলব্ধির আনন্দে পায়ে নেপুর' অর্থাৎ নুপুর দিও। তারপর দু লাইনে কবি যোগ-প্রক্রিয়ার গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন। 'কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। 'নাশিকায় দাঁড় বাইও' অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে (control of breath, হিন্দুদের প্রাণায়াম সুফীদের pass i an fas)। 'মুখের মাঝে মুখ ··' কবি এখানে তাদাত্ম্যের প্রতি (অর্থাৎ identity বা unity) ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'গলুইর মধ্যে নায়ের পন্থ'। নৌকার পথের ইঙ্গিত দেয় গলুই (stern)। সেইরূপ দেহের মধ্যে নাড়ী চক্র সাধনার ইঙ্গিত দেয়। 'রাই সর্গ' (অর্থাৎ স্বর্গ বা উর্ধ্ব) মুখে যায়' (বা ধায়) এই বাক্যে 'সাধকগণের উল্টা সাধনা বা উর্ধ্ব সাধনার ব্যঞ্জনা' পাওয়া যায়।

১৮১। শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত রামপাশা গ্রামবাসী আলি রজা চৌধুরীর পুত্র (১২৬১-১৩২৯)। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। গানের এক সংগ্রহ হাছন উদাস পৃ. ৬৭। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ২৫-৬।

তুলনীয় ঃ রামকৃষ্ণ-জল এক ; কবীর-রাম, খোদা, শিব, শক্তি ; রকরঙ্গ (হিন্দীভাষার মুসলমান কবি)- অহম্মদ, ঈশা, রাম ; রামপ্রসাদ – যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজী'।

১৮২। তুলনীয় ঃ 'দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা (রবীন্দ্রনাথ), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ২৬-৮।

১৮৩। ঐ, পৃ. ২৮-৩৫।

১৮৪। কবি হাসিম—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, 'পূর্ণিমা', ১৩০৯ আষাঢ় পৃ. ৯২ উদ্ধৃত। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৫-৩৬।

১৮৫। রচয়িতা আলি রজা। অনেকে যোগ কালন্দরকে সৈয়দ মর্তুজার রচনা বলিয়া মনে করেন।

১৮৬। দ্রষ্টব্য প্রণীত Islam in Bengal, 42-48. Hindustan Review quoted in Census of India Report 1911. xiv (Punjab), Pt. I. p. 165.

১৮৭। Islam in Bengal, 48-75.

পরিষৎ সংবাদ

শোক-সংবাদ

১৩৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত বিভিন্ন অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ফণিভূষণ চক্রবর্তী, ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) ও বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর প্রয়াণে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণসভা

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ (২৩ মে, ১৯৮১) শনিবার অপরাহ্নে পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে প্রয়াত বিজ্ঞানী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রী অশোক মিত্র, বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ইন্দুশেখর রায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলরঞ্জন মৈত্র, শ্রীরুদ্রেন্দ্র কুমার পাল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যে পত্র সমূহ প্রেরণ করেন সেইগুলি সভায় পঠিত হয়।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস, অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু, শ্রী রতনলাল খান, শ্রী মঙ্গলকান্তি রায় গোপালচন্দ্রের

বিজ্ঞানপ্রতিভা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া প্রয়াত বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি গোপালচন্দ্রের সমগ্র রচনা সংগ্রহ করিয়া সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ এবং গোপাল চন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে গোপালচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কেও অনুরোধ জানানো হইয়াছে। তাঁহার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

আচার্য রাধাগোবিন্দ স্মারক বক্তৃতা

গত ১২ এবং ১৩ই আষাঢ়, ১৩৮৮ (২৭ ও ২৮ জুন, ১৯৮১) পরিষদ ভবনে "বাংলার বৈষ্ণব কথা ও ব্রজ সাহিত্য" সম্পর্কে অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁহার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। দুইদিনই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য।

রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা

গত ২৬ এবং ২৭ আষাঢ় (১১ এবং ১২ জুলাই, ১৯৮১) পরিষদ ভবনে শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বাংলার মধ্যযুগীয় মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র" সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। সভায় প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী রমা চৌধুরী এবং দ্বিতীয় দিনে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় শ্রোতৃ মণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য বক্তার নিষ্ঠা, শ্রম ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রশংসা করেন।

বিশেষ অধিবেশন

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ (৩১ মে ১৯৮১) পরিষদ ভবনে "বাংলা চেতনা চরিতগুলির ঐতিহাসিকতা" সম্পর্কে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সম্পাদক শ্রী দিলীপকুমার বিশ্বাস বক্তা শ্রী মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দানকালে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির ধারাবাহিক আলোচনা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক দান

পদক প্রদানের শর্ত অনুযায়ী বর্তমান বৎসরে বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় ভাষার প্রখ্যাত লেখককে সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান করিতে হইবে। সাহিত্য আকাদমীর সচিব ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য সংগঠন সমূহের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় বর্তমান বৎসরের জন্য অসমীয়া কথাসাহিত্যিক ডঃ ভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়াকে এই পদক প্রদানের প্রস্তাব করেন। ৩০ শে আষাঢ় তারিখের অধিবেশনে কার্য-নির্বাহক সমিতি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

নিবেদিতার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ

শ্রী বরেন নিয়োগী লিখিত নিবেদিতার পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত পুস্তকটির প্রকাশ সম্পর্কে কার্যনির্বাহক সমিতি দীর্ঘ আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে সামান্য দুই একটি সংশোধনের পরে পরিষৎ গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারেন।

বিষ্ণুপুরাণ

বরোদার ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট তাঁহাদের বিষ্ণুপুরাণ প্রজেক্ট এর জন্য বিষ্ণুপুরাণের বিনাব্যয়ে ছবি তুলিবার আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা মাইক্রোফিল্ম করা ও ডাকযোগে তাহা

প্রেরণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত আছেন। গত ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহাদের এই আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। তবে পরিষৎ ভবন হইতে পুঁথি কোনক্রমেই বাহিরে যাইবে না বলিয়া সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে।

পুঁথির তালিকা প্রণয়ন

সম্প্রতি ভারতসরকার পরিষৎ-পুঁথিশালার জন্য পঁচিশহাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত অনুদানের নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মধ্যে পুঁথিসমূহের তালিকা প্রণয়ন আছে। এই বিষয়ে যথাযথভাবে কাজ করিবার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের পুঁথি বিভাগের সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রতিনিধি এবং আরও পাঁচজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটি উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই উপসমিতির সুপারিশ অনুযায়ী পুঁথির তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হইয়াছে।

আজীবন সদস্য

১০/১ হেম ব্যানার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া নিবাসী শ্রীঅচল ভট্টাচার্য পরিষদের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৪ তম বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে তাঁহার এই আবেদন অনুমোদিত হয়। তিনি জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন।

পরিষৎ কর্মিগণের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি

পরিষৎ কর্মিসংঘের আবেদনক্রমে পরিষদের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পরিষৎ কর্মিবৃন্দের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা বিষয়ে যে সুপারিশ করিয়াছেন পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ২০ বৈশাখ, ১৩৮৪ তারিখের অধিবেশনে উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সুপারিশ বৈশাখ, ১৩৮৪ হইতে কার্যকর হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	২৯	কৃতজাল	কৃতাঞ্জলি
৩৫	৩৩	পদচহ্ন	পদচিহ্ন
৩৬	৩৫	মুসলমান	মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম
	২৩	১৫৪৯৫—	১৪৯৫—
৪০	১১	চক্রবর্তী…	কবিকঙ্কণের কাব্য (আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত)
	১৩	মানুয়ের	মানুষের
৪৬	২৮	মণিকপীর	মাণিকপীর
৪৭	৩৩	ওগ খাইন	ওশ খাইন
	ঐ	আলিরাজা	আলি রজা
৪৮	২৩	ঘুরণি	ঘরণি
৫০	২৯	হইবে) কবি	হইবে —কবি
	২৭	sufferiog	suffering
৫১	১৩	Hakluyt	Hakluyt), 1958
৫৭	২৩	'মজমুয়াদের'	'মজমুয়াদার'
৫৮	১৬	ময়রাসতের	ময়নাসতের
	৩০	'বদীউজ্জমাল'	'বদীউজ্জমাল (ন ?)
৫৯	২৫	Sarkar, Hist. Bengal ii ch. IV	Khadcuri, Laws of Peace a war
	২৬	Majumdar…247	Majumdar, Sarkar, Hist. Bengal ii. ch. IV
	৩২	Letures	Lectures
	৩৬	বরমকবাদ	বরবকাবাদ
	ঐ	খুলিফতাবাদ	খলিফতাবাদ
৬০	৪	243	248
	৩৪	কসরা	কসবা
৬১	২৪	14-6	145-6
৬৩	১০	বড় প'ররায়	বড় প'তরায়
৬৪	২৪	মাসুন্দর	মাসুদের
৬৭	৯; ১৫; ৩৩	বা.সা.ই. স্থলে	ই.বা.সা.
৬৮	২, ৭, ১৪	ঐ	ঐ
৬৯	৯	dweling	dwelling
	৩৫	গল্লুই	গলুই
৭০	১৪	দ্রষ্টব্য প্রণীত	দ্রষ্টব্য মৎ প্রণীত
	৩৩	সর্বতোম্ন	সর্বতোম্না

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৩	সুর ই রৌজৎ উল্	সুবহ্ ই, রৌজৎ উল্
	৩৩	ore	lore
৮	১৮	(খ) স্বেচ্ছা-	১৯ লাইনে নতুন অনুচ্ছেদ আরম্ভ
১৩	১৬	zimme	zimmi
১৫	৩১	পদ্মাপুরাণে	পদ্মপুরাণে
১৬	১৪	নাচ	নীচ
১৮	১৮	শেযেক্ত	শেষোক্ত
১৯	৪	সৈদ্য	সৈন্য
	২৪	বল্লভ	বল্লভ
২১	২৪	ফহোবাদ	ফতেহাবাদ
২৫	২২	রাজত্ব	রাজত্বে
২৬	১২	অবশ	অবশ্য
	১৬	Oligarehy	Ollgarehy
	২৩	যে...	জন্য তাঁহাকে সিংহাসন
	২৪	ভাষে	ভাসে
২৭	১০, ২২	ধর্মান্তর	ধর্মান্তরণ
	২২	ঐ	ঐ
	৩০	দরসা	দরগা
	২০	বধিনিষেধ	বিধিনিষেধ
	২১	লোকাচার	লোকাচার
৩১	৬	হিন্দু...	ও মুসলমানের অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা জাহাংগীরের আমলে রজোরে ঘটিয়াছিল। হিন্দু
	২০	castcism	casteism
	২৫	মশেখ প্রভৃতি, উলেমা	উলেমা, মশেখ প্রভৃতি
	২৬	মফেরুজমান	মফারুজমান
	৩৪	"ফোমে"র	"কৌমে"র
৩২	২১	শেষ দেখিতে	শেষ চিহ্ন দেখিতে
	৫৫	শক্তি-পূজার	শক্তি-পূজায়
৩২ খ)	১৯	পালপার্বণের	পালাপার্বণের
	২৩	মোসিনিন"	মোমিনিন"
	ঐ	কাফের	কুফুর
৩৩	৮	(fiqh) উপর	(fiqh) এর উপর
	১৭	পরিচয়	পরিচয়

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশের

ন্যায়-পরিচয়

পরিষৎ সংস্করণ কেন্দ্রীয় সরকারের
অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইল।

সুলভ মূল্য : পনেরো টাকা

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

স্বপ্ন

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই।

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : তিন টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন
১৩৮৮

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ২৪ জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ ও অবহট্টে রচিত 'ডাকার্ণব', নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি অমূল্য প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ॥

মূল্য : ত্রিশ টাকা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(১৭৯৫-১৮৭৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা

পঞ্চম সংস্করণ

সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

ভারত কোষ

বাংগালা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা

Encyclopædia

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সুদৃশ্য বাঁধাই।

সম্পূর্ণ সেট একশত পঞ্চাশ টাকা ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন

১৩৮৮

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

বঙ্গাল-বাণী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

সুকুমার সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের (২য় সংস্করণ, ১৯৪৮) আখ্যাপত্রের উর্ধ্বভাগে নিম্নের শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে।—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ ॥ আর্যা ॥

১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীধরদাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংজ্ঞক সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ থেকে কবি বঙ্গাল রচিত ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত। উদ্ধৃতিতে একটু ভুল থাকায় ছন্দোভঙ্গ হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষাংশের প্রকৃত পাঠ 'গঙ্গা চ বঙ্গাল-বাণী চ'; ভুলবশতঃ 'গঙ্গা'র পরবর্তী 'চ' শব্দটি বাদ পড়েছে। শ্লোকের রচয়িতা বঙ্গাল নামক কবি। তবে সেন মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"ঘনরসময়ী, গভীর বক্রোক্তির (অর্থান্তরে বাঁকের) জন্য সুন্দর, কবিদের দ্বারা আস্বাদিত (অর্থান্তরে অধ্যুষিত) বঙ্গাল-বাণীতে এবং গঙ্গায় নিমজ্জন লোককে পবিত্র করে।" কিন্তু তাঁর মতে কবি এখানে আত্মপ্রশংসার ছলে নিপুণভাবে বঙ্গবাণীর অর্থাৎ বাংলাভাষার জয় ঘোষণা করেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (মার্চ, ১৯৬৫) নামক পুস্তকের আখ্যাপত্রে এর উপর একটু রং চড়ানো হয়েছে। তিনি অবশ্যই সেনমহাশয়ের গ্রন্থ থেকে শ্লোকটি গ্রহণ করেছিলেন কারণ তিনিও 'গঙ্গা চ' স্থলে 'গঙ্গা' লিখেছেন। কিন্তু শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন—"ঘনরসময়ী (নদী অর্থে—প্রচুর জলময়; ভাষাঅর্থে—বিভিন্ন রসের অধিষ্ঠানভূমি); গভীর (গভীর-খাত-বিশিষ্ট; গভীর-অর্থ-সমন্বিত); বক্রিম (বঙ্কিম, আঁকাবাঁকা যাহার গতি; সুন্দর বা মনোহর ও সুভগা (সুন্দর; ঐশ্বর্যশালিনী), এবং বহু কবি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন—এইরূপ গঙ্গানদী ও বাঙ্গালাভাষা,—এই দুই প্রবাহে অবগাহন করিলে, মানুষ পবিত্র হয়।" তাঁর মতে এটি 'অজ্ঞাতপরিচয় কোনও পূর্ববঙ্গীয় ('বঙ্গাল' অর্থাৎ বাঙাল) কবির বঙ্গভাষা-প্রশস্তি'। তিনি যেন ভুলে গিয়েছেন যে, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' অনুসারে শ্লোকরচয়িতা কবির নাম বঙ্গাল।

প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা' (১৯৭৮) বইটিতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসরণে শ্লোকটির নিম্নোদ্ধৃত বাংলা পদ্যানুবাদ দেওয়া হয়েছে।—

ঘনরসময়ী বঙ্কিমগতি
পবিত্র করা জনগণমতি
গাহনপুণ্যে ধন্য করিয়া ঘুচায় গ্লানি
কবিবন্দিতা গঙ্গানদী ও বাংলাবাণী

আমাদের বিবেচনায় শ্লোকে ব্যবহৃত 'বঙ্গাল-বাণী' শব্দের অর্থ বঙ্গাল নামক কবির রচনা; এতে বাংলাভাষা বোঝাতে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বিশেষণগুলির মধ্যে 'গভীরা' এবং 'বক্রিমসুভগা' (অর্থাৎ বক্রোক্তিহেতু মনোহরা) রচনার পক্ষে যেমন সুষ্ঠুপ্রয়োগ, ভাষার পক্ষে

তেমন নয়। "বাংলা ভাষা বক্রোক্তি মনোহরা" বলায় কোনও অর্থবোধ হয় কিনা সন্দেহ। কাব্যের বক্রোক্তি-মাধুর্য বোঝা যায়; একটা ভাষার বক্রোক্তিগুণ কেমন বস্তু? তাছাড়া, রচনার গভীরতা ভাবগাম্ভীর্য হতে পারে, কোনও ভাষার গভীরতা বস্তুটি কি হবে?

দ্বিতীয়তঃ, কোনও কবি যদি বাংলাভাষার প্রশস্তি গাইতে চান, তবে তিনি সংস্কৃতভাষার আশ্রয় নেবেন কেন? ভাষাচার্যগণ ৯৫০-১২০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলা-ভাষার আদিযুগকে স্থান দিয়েছেন। কবি বঙ্গাল ঐ যুগেরই লোক। সুতরাং তিনি বাংলাভাষার প্রশস্তি রচনা করলে তৎকালপ্রচলিত বাংলাতেই করতেন, সংস্কৃতে নয়। সংস্কৃতে বাংলাভাষার প্রশস্তি রচনার কল্পনা আমাদের কাছে নিতান্তই উদ্ভট মনে হয়।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, বাণী ও গঙ্গার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে অপ্রাপ্য নয়; কিন্তু সেস্থলে 'বাণী'র অর্থ কোনও কবির কাব্যকীর্তি, কোনও ভাষা নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা পালবংশীয় নারায়ণপালের (আ ৮৬০-৯১৭ খ্রী) রাজত্বকালীন গুরবমিশ্রের বাদাল প্রশস্তির ২৪শ ও ২৫শ শ্লোকের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।—

অতিলোমহর্ষণেষু কলিযুগ-বাল্মীকি-জন্ম-পিশুনেষু।
ধর্মেতিহাস-পর্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতীর্ব্যবৃণোৎ ॥
অ-সিন্ধু-প্রসৃতা যস্য স্বধুনী [ব সহস্রধা]।
বাণী প্রসন্ন-গম্ভীরা ধিনোতি চ পুনাতি চ ॥

অর্থাৎ কলিকাল-বাল্মীকির জন্মদ্যোতক ও অতি রোমাঞ্চোৎপাদক ধর্মেতিহাস গ্রন্থসমূহে যে পুণ্যাত্মা (গুরবমিশ্র) বেদসমূহ ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং যাঁর বাণী (রচনা) সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রসন্না (প্রসাদগুণযুক্তা; প্রীতিকরা) ও গম্ভীরা (ভাবগাম্ভীর্যযুক্তা, জলের গভীরতা-যুক্তা) এবং সহস্রদিকে বিস্তৃতা; কিন্তু সিন্ধুর (যবনাধ্যুষিত সিন্ধুদেশের; সমুদ্রের) দিকে ধাবিতা নয়। সেই বাণী এবং স্বর্গঙ্গা সকলকেই তৃপ্তিদান করে ও পবিত্র করে।

বঙ্গালরচিত শ্লোকটির সঙ্গে বাদালপ্রশস্তির শ্লোকদ্বয়ের ভাষা ও ভাবের মিল এত স্পষ্ট যে, একস্থানে বঙ্গালের রচনার এবং অন্যত্র গুরবমিশ্রের রচনার কথা হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ উঠতে পারে না। বাদাল প্রশস্তিতে 'বাণী' শব্দে গুরবমিশ্রের মুখের কথা বোঝায়না; তাঁর মুখের কথায় কেউ পবিত্র হলে এরূপ মনে করা কঠিন। তাঁর রচনার উল্লেখ করা হল কেন?

মূলতঃ বঙ্গাল একটি দেশের নাম, একথা সত্য; কিন্তু 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' এই ধরনের আরও ব্যক্তি নাম দেখা যায়, যেমন দাক্ষিণাত্য, বাহ্লিক ও কর্ণাটদেব। স্ব স্ব দেশের নাম থেকে কবিগণের এই জনপ্রিয় নামের উদ্ভব হয়েছিল, বোধহয় বিদেশের কোনও রাজসভাতে।

'বক্রোক্তি' ও তদ্বোধক শব্দের অর্থ বাঁকাভাবে কথা বলা; ঐ নামের অলঙ্কারটিরও একই বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বক্রবাক্য-রচনা-রমণীয়' (শিশুপালবধ। ১০।১২), 'কিমেতৈর্বক্র-ভণিতৈঃ' (রত্নাবলী।২), 'সচসুধা-স্যান্দি-গিরাং বক্রিমা' (গীতগোবিন্দ। ৩।১৫) প্রভৃতি লক্ষণীয়। আবার 'বক্রোক্তি' অলঙ্কার সম্পর্কে মম্মটকৃত 'কাব্যপ্রকাশে' বলা হয়েছে—

যদুক্তমন্যথা বাক্যমন্যথান্যেন যোজ্যতে।
শ্লেষেণ কাকা বা জ্ঞেয়া সা বক্রোক্তিস্তথা দ্বিধা ॥

বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে'ও (১০।৯) ঐরূপ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'বক্রোক্তি' অলঙ্কারে একভাবে বলা একটা কথার অর্থ অন্যভাবে গৃহীত হয়; সেটা বিভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার কিংবা প্রশ্নদ্বারা দ্যোতিত হতে পারে বলে শ্লেষ-বক্রোক্তি ও কাকুবক্রোক্তিভেদে অলঙ্কারটি দ্বিবিধ।

উপরে কবি বঙ্গালের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার দেখা যায়। কারণ কবির রচনাকে গঙ্গার সঙ্গে উপমিত করে যে বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির অর্থ রচনাপক্ষে এক, কিন্তু গঙ্গাপক্ষে আলাদা। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কবি বঙ্গালের আরও যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে, তাতেও শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার দেখতে পাই। শ্লোকটি এই—

অক্ষিভ্যাং কৃষ্ণসারাভ্যামস্যাঃ কর্ণৌ ন বাধিতো।
শঙ্কে কনক-তাড়ঙ্ক-পাশ-ত্রাস-বশাদিব॥

এখানে নায়িকার চক্ষু দুটিকে কৃষ্ণসার (কালসার) মৃগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সোনার কানপাশারূপ পাশে বন্ধ হবার ভয়েই যেন চক্ষুরূপ মৃগদ্বারা কর্ণদুটি পীড়িত হয় নি। অর্থাৎ কানের কাছে গিয়ে তারা ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এই বর্ণনায় কবির আসল বক্তব্য হল, নায়িকার চক্ষুদুটি এত বড় যে, সে দুটি প্রায় কাণ ছুঁয়েছে। কবি 'পাস-ত্রাস-বশ' লেখাতে সন্দেহ হয় যেন সেই আমলেই দন্ত্য 'স'-এর তালব্য উচ্চারণ বাংলা দেশে প্রচলিত হয়েছিল।

আমরা দেখলাম, কবি বঙ্গাল আপন রচনাকে বক্রোক্তি-মনোহরা বলেছেন এবং 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' উদ্ধৃত তাঁর দুটি শ্লোকেই বক্রোক্তি অলঙ্কার দেখা যাচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন কবি বক্রোক্তি অলঙ্কারে শোভিত রচনার জন্য প্রসিদ্ধ বলে প্রবাদ আছে। তাঁরা সুবন্ধু, বাণভট্ট এবং কবিরাজ—

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥

কবি বঙ্গালের দাবী থেকে মনে হয়, তিনি নিজেকে বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণ বলে মনে করতেন। তিনি হয়ত ভাবতেন, যেমন 'উপমা কালিদাসস্য' একটি কথা আছে, তেমনই, তার সঙ্গে যোগ করা যায় বক্রিমা 'বঙ্গালস্য চ'।

পরশুরামের গল্পে হাস্যরস

শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার

প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে বাঙালী সাহিত্যিকদের বাস্তববোধের ধারণা একটা তীক্ষ্ন বাঁক নিয়েছিল। এর দশবারো বছর আগে, এই শতাব্দীরই সূচনায়, 'চোখের বালি' কিংবা 'নষ্ট নীড়ে' সামাজিক সম্পর্কের বাইরের খোলসটাকে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতটা কুণ্ঠাহীনভাবে বাস্তবতার ভেতরকার চেহারাটা দেখাতে পেরেছিলেন তাতেই নতুন বাস্তববোধের একটা অপরিচিত স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল। এ স্বাদ দুঃসাহসিক ঠিকই, কিন্তু নিঃশব্দ আবরণ-উন্মোচনের স্বাদ, তীব্রতা কিংবা বিদ্রোহের জ্বালা সেই উন্মোচনে ছিল না। এই বাস্তবতার উন্মোচন মূলতঃ বাঙ্গালীর পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। পারিবারিক জীবনের পটভূমিতে এই প্রথাবিরুদ্ধ উন্মোচন ঘটেছিল চৈতন্যের বিশ্লেষণে, অন্তর্মুখী আত্মনিরীক্ষায়। সমাজের সংস্কারগুলির সঙ্গে বাস্তববোধ ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব এই সূত্রেই এসেছিল। কিন্তু ক্রমে সে উন্মোচন শুধু সংস্কারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না। নানা মানবিক প্রবৃত্তি এবং সামাজিক ছদ্মবেশও তীক্ষ্ন বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের সমকালে, তখনকার সদ্য প্রকাশিত সবুজপত্র এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায়। রোম্যান্টিসিজমের বিলাস, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, অহংকার, ধর্মের ভণ্ডামি, বর্ণচোরা লোভ, স্বার্থপরতা, ভণ্ডমানবপ্রেম এবং ছদ্ম দেশপ্রেম প্রধানতঃ এইসব ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রবণতাই নিখাদ কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যের ব্যক্তি চরিত্র সামাজিক স্বভাবেরই প্রতিনিধি হয়ে এসেছে।

বিদেশী সাহিত্যে এই রকম সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কার বেশ কিছু অসাধারণ ও কালজয়ী রচনার জন্ম দিয়েছে। ভল্‌ত্যারের তীব্র তীক্ষ্ন বিদ্রূপ প্রচলিত দার্শনিক-ধারণা বিরোধী 'কাঁদিদের' জন্ম দিয়েছিল, তেমনি ধর্মীয় ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়েছিল মলিয়ের-এর 'তার্তুফ' নাটকে। আয়ারল্যাণ্ডের চাষীদের ওপর রাজনৈতিক অত্যাচারের ব্যঙ্গাত্মক তীব্র রূপ দেখা দেয় সুইফটের 'এ মডেস্ট প্রোপোজাল'-এ। আবার ব্যক্তিগত আক্রমণের মারাত্মক রূপ দেখি ড্রাইডেনের ম্যাক ফ্লেক্‌নো-তে। তেমনি থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার' কিংবা 'দি বুক অব স্নবস্‌' যুক্তিমান বস্তুতান্ত্রিকেরই সমাজবিশ্লেষণ। কিন্তু এঁদের সঙ্গে পরশুরামের কিছু কিছু সমধর্মিতা থাকলেও তফাত আছে। ভল্‌ত্যারের তীক্ষ্ন তিক্ততা পরশুরামের এক বিশেষ পর্বে আছে, সর্বত্র নেই। মলিয়ের-এর মতো পরশুরামও একটু হৃদয়বান, অনুচ্ছ্বাসিত, নাগরিক এবং চরিত্র বা আইডিয়া-ভিত্তিক (ভণ্ডামি, জোচ্চুরি, ফ্যাশান, শিক্ষিতের অহংকার, কৌশলী চৌর্যবৃত্তি, তারুণ্যের পাগলামি ইত্যাদি); আবার থ্যাকারের মতো নগ্ন নির্মমতা পরশুরামের মৌলিক স্বভাব নয়, প্রায় মিছরির ছুরি-জাতীয় রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত, কোমল কৌতুকের নেপথ্যে তাঁর আক্রমণ নিহিত। গল্প-জমানো আর্টে হয়তো থ্যাকারে একটু বেশী শক্তি ধরেন, উপন্যাসের বিস্তৃত কাহিনী বুনতে তিনি সিদ্ধহস্ত। পরশুরামের কৃতিত্ব কিন্তু ছোটগল্পে। থ্যাকারের কোনো কোনো লেখায় সাংবাদিকতা স্পষ্ট, পরশুরাম সেদিক থেকে বৈঠকী আমেজ সৃষ্টিতে

বেশি অভ্যস্ত—ত্রৈলোক্যনাথেরই আধুনিক সংস্করণ তিনি। মার্কিন লেখক স্টিফেন লীককের স্নিগ্ধ সংযম ও বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রূপ ব্যঙ্গ পরশুরামে আছে—দুজনেই ছোটগল্প বা নকশা-জাতীয় রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু পরশুরামের বৈঠকী মেজাজের উল্লাস —বংশলোচন বাবুর বৈঠকে মুসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজার গন্ধ লীককে নেই-- থাকতে পারে না। চরিত্রসৃষ্টিতেও পরশুরাম লীককের চেয়ে অনেক বড়—দক্ষ মূর্তি-শিল্পী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন যে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ আন্দোলন বাঙলা গল্পে উপন্যাসে প্রভাব ফেলেছিল -পরশুরাম সেই আন্দোলনেরই তির্যক রিয়্যালিস্ট শিল্পী। যতীন্দ্রকুমার সেন এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র পরশুরামকে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। ব্যঙ্গচিত্র থেকে ব্যঙ্গগল্প--স্বভাবতঃই পরশুরামের রসিকতার ভিত্তি সামাজিক লোকব্যবহার। তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' বাঙালীর লিমিটেড কোম্পানির মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির বস্তুতান্ত্রিক দ্বারোদ্‌ঘাটন। বাঙলাদেশের যৌথ ব্যবসায়ের মধ্যে যে জালিয়াতির বাড়াবাড়ি আমাদের জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে তার ব্যঙ্গাত্মক নিদর্শন হিসেবে গল্পটি তুলনাহীন। ব্যঙ্গচিত্রকারের কৌশলে যে রমণীয় আতিশয্য থাকে সেই আতিশয্যেই গল্পটির শ্লেষের ঝাঁজ শেষপর্যন্ত স্নিগ্ধ হয়েছে। ব্যবসায়ের প্রসপেকটাসে বলা হয়েছে—মূল উৎপাদন বিক্রয় করা ছাড়া লাভের আরো পথ খোলা আছে : 'এতদ্‌ভিন্ন by product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। ৺সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে ; এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির নিহত ছাগ-সমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিডস্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।' এই ছাগ-বলির ব্যাপারে নিরামিষাশী পার্টনার গণ্ডেরিরাম আপত্তি জানালে কুমড়ো বলির প্রস্তাব হলো। কিন্তু কুমড়োর চামড়া তো ছাগলের মতো দামী হবে না। তখন বৈজ্ঞানিক বিপিন বললে, 'কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে কিড-স্কিনের জুতো না হলেও বোধ হয় ভেজিটেবল শু হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' এই প্রথম গল্পেই পরশুরাম অন্ততঃ তিনটি সামাজিক প্রবণতাকে বিদ্রূপ করলেন। ১ ধর্মের ব্যবসায়িক ব্যবহার। ২. ধোঁকা দেবার জন্যে বৈজ্ঞানিকতার আরোপ। ৩. ব্যবসায়ের জালিয়াতিতে শ্রেণীবিশেষের প্রতি কটাক্ষ। তাছাড়া বাঙালীর প্রতিও কটাক্ষ আছে। নতুন আপিসের নাম শুনে তিনকড়িবাবু তাঁর অকালকুষ্মাণ্ড শালীপোকে কাজে লাগিয়ে দেবার তাল খুঁজেছেন। আবার বাঙালীর সমালোচক বাটপারিয়া নিজের শ্রেণীচরিত্রটিকেও প্রকাশ করেছে : 'বাঙ্গালী ধরম মানে না। তিস রুপেয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপেয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্‌ ভি করে হিসাবসে। আপনাদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—'বৈরাগ্যসাধন মুক্তি সো হামার নহি।' রবীন্দ্রনাথকে পাকা ব্যবসাদার প্রমাণ করে দলে টানায় গণ্ডেরি বাটপারিয়া যে সহানুভূতি আদায় করে তাতেই বিদ্রূপের জ্বালা কৌতুকে স্নিগ্ধ হয়ে যায়। এই রকম জোচ্চুরি, ভণ্ডামি, সমাজ-সেবার ছদ্ম আড়ম্বর, ভাববিলাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে পরশুরামের আক্রমণ ফুটেছে 'চিকিৎসা সঙ্কট,' 'বিরিঞ্চি বাবা,' 'মহাবিদ্যা,' 'কচিসংসদ', 'উলটপুরাণ,' ইত্যাদি গল্পে। নন্দবাবু বন্ধুকে দেখে তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে কোঁচায় পা আটকে উল্‌টে পড়ার পর সান্ধ্য আড্ডার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে যে চিকিৎসা সঙ্কটে পড়লেন তাতে অ্যালোপ্যাথ,

হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজ এই তিনটি শ্রেণীর মানুষই নিজেদের শ্রেণীতে ছদ্মবেশী হাতুড়েকে খুঁজে পাবেন সন্দেহ নেই। অ্যালোপ্যাথি মতে নন্দবাবুর রোগটা 'cerebral tumour with strangulated ganglia'। ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। হোমিওপ্যাথি মতে, অ্যালোপ্যাথিক বিষ তাড়ানো ওষুধ আগে দরকার। ব্যারামটা কী তা গুরুগম্ভীর হোমিওপ্যাথ বলেন না। সানিয়ে জিজ্ঞেস করাতে উত্তর আসে ঃ তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরবে নাকি ? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনসিয়্যাল ক্যালকুলাস হয়েছে, কিছু বুঝবে ? কবরেজের কাছে যেতে সে লক্ষণ মেলাতে লাগলো। লক্ষণ মেলেনি সেই বিখ্যাত উত্তর আসে ; ঢ্যন্তি পার না। এবং রোগও ঠিক হয়ে যায় ঃ উদুরি। 'বিরিঞ্চি বাবার' সেই অবিস্মরণীয় ভণ্ড সাধু যে একই সঙ্গে গোটমা বুড্ডা, যীশাস্ ক্রাইস্ট আর বৈবস্বত মনু অর্থাৎ 'বিবু'র বন্ধু ; জগৎশেঠের মায়ের শ্রাদ্ধে যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর সঙ্গে এক পাতে বসে খেয়েছে, যে এই বিচিত্র কাল-প্রবাহ উল্টে পাল্টে যে কোনো কালে নিজে পোঁছে যায় কিংবা অপরকে পোঁছে দেয়, সেই বিরিঞ্চিবাবার যখন খোলস খুললো তখনও তিনি মচকান না ; বলেন, 'তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।' কিন্তু মনে হয়, পরশুরামের হাতে, গুরুদেবের এই 'থাবড়া খাওয়া' সহ্য হয়ে গেছে কেননা পঞ্চাশ-ষাট বছর বাদেও তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা ক্রমশঃ দলে ভারি হচ্ছেন। 'কচিসংসদে' তেমনি সমকালীন তারুণ্যের পাগলামিতে দ্বি-মুখী আক্রমণ করা হয়েছে ঃ একদিকে লালিমা পাল (পুং), অন্যদিকে কেষ্টোর হাইকোর্টশিপ। 'মহাবিদ্যা' গল্পে অতি গম্ভীর ভঙ্গিতে চুরিবিদ্যের মহিমা-কীর্তন করা হয়েছে, ডাকাতি, চুরি, জোচ্চুরি—চমৎকার পারস্পরিক পার্থক্যে পরশুরামের বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ে। শেষপর্যন্ত মহাবিদ্যার অর্থ দাঁড়ায় ঃ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সংসারের মঙ্গলের জন্যে কিছু 'কেড়ে নেওয়া' নয়—ওটা আপত্তিকর—'আদায় করা'। কিন্তু শুধু চুরি নয়, একটু অধিকার আদায়ের ইঙ্গিত বা আশঙ্কাও এ গল্পে আছে। মজুর পাঁচু মিঞা জগদ্গুরুকে যখন বলেছে ঃ আমার কি করলেন ধর্মাবতার ? তখন জগদ্গুরু বলেছে ঃ তুমি এখানে এসে ভাল কর নি বাপু। তোমার গুরু রুশিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য ধরে থাকো। রাজনীতিজ্ঞ মিস্টার গুহা বলেছে ঃ দশ হাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস ? ইউনিয়ন খুলে এমন হুড়ো লাগাবো যে এখনি তোদের মজুরি পাঁচগুণ হয়ে যাবে। তখন ব্যবসাদার মিস্টার গ্যাব বলেছে ঃ সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এসো না। তখন রাজনীতিজ্ঞ গুহা চুপি চুপি বলেছে, 'তবে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করবো কি ?' সাম্যবাদের প্রভাবে আমাদের দেশে বিশের দশকের মাঝামাঝি যে ট্রেড ইউনিয়নিজম্ ছড়াচ্ছে তার নেতৃত্বের চরিত্র এখন থেকেই পরশুরামের কলমেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু 'উলট পুরাণ' শ্লেষধর্মী রূপক। ইয়োরোপ অধিকার করেছে ভারতীয়রা—এই উল্টো উদ্ভট ছবিতে ভারতের রাজনৈতিক চেহারা ধরা পড়েছে। খাঁ সাহেব গবসন টোডি আমাদেরই রায় বাহাদুরদের প্রতিনিধি, স্যার ট্রিবুসি টার্নকোটরা এক ধরনের স্বার্থসন্ধানী রাজনৈতিক নেতার প্রতিনিধি—যাঁদের সংখ্যা এখন অনেকগুণ বেশি, 'ভোমস্টাট' প্রাসাদের প্রিন্স্ ভোম নেশাখোর অপদার্থ সামন্তরাজাদের নিখুঁত ছবি। কৌতুক রসে এই ব্যঙ্গের জ্বালা কমে গেছে—বাথরুমে গবসন টোডির আম খাওয়ার ছবি, ফ্লকির পাঁচকে 'ফ্যাঁচ' উচ্চারণ করা কিংবা ট্রিকুমির বক্তৃতা কৌতুকের নির্মল হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত। লন্ডন শহরে

দুর্বৃত্তা নারীরা যখন পুরুষদের বিপর্যস্ত করেছে তখন পুরুষজাতির মুখপাত্র 'দি মরার ম্যান' কাগজে বিবরণ বেরিয়েছে ঃ দুর্বৃত্তা নারীগণ প্রকাশ্য দিবালোকে···নিরীহ পুরুষগণকে থামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেয়ারের উড়িয়া পুলিশ তখন কি করিতেছিল ? তারা·· নারীগুন্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল 'হী-হ-হ-হ-হ।' ···মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গানিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জেন্টরা তাঁদের অপমান করিয়া বলিয়াছে—'এ সাহেব অ; ওপাকে যিব তো ডাণ্ডা খিব।' তীব্রতম শ্লেষ এইভাবেই রমণীয় কৌতুকে পরিণতি পেয়েছে। নিছক বুদ্ধির তীক্ষ্ন ধারালো অস্ত্র নয়, কৌতুক রসের প্রলেপে ধারে কাটার জ্বালা পরশুরাম বুঝতে দেন নি।

সমাজ নিরীক্ষায় এই বুদ্ধি-দীপ্ত ধারালো কৌতুক পরশুরামের গল্পের একটি ধারা। অন্য ধারাটি বৈঠকী গল্পের ধারা—প্রধানতঃ ত্রৈলোক্যনাথ এযুগের যে ধারার সূচনা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ কিছুটা প্রাচীন বৈঠকী গল্পের ভঙ্গিতে দীর্ঘ গল্পচক্রের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। পরশুরাম আধুনিক ছোটগল্পের ছোট পরিসরের মধ্যে সেই বৈঠকী আমেজই এনেছেন। এর নিদর্শন লম্বকর্ণ; স্বয়ম্বরা, দক্ষিণরায়, মহেশের মহাযাত্রা, ভুশণ্ডীর মাঠে ইত্যাদি। ['ভুশণ্ডীর মাঠে' ত্রৈলোক্যনাথের বৈঠকী ভঙ্গিতে লেখা ব্যঙ্গ ও রূপকের মিশ্রণ। গল্পের বক্তব্য শেষ অধ্যায়ে। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী হাজির হয়ে যে উৎকট ভৌতিক দাম্পত্য সমস্যা পাকিয়েছে তার সমাধানকে লেখক শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাড়ুজ্যে; নরেশ সেন ও যতীন সিংহ—এই চারজন তৎকালীন নীতি-শ্লীলতার কলহকারী সাহিত্যিকদের ওপর বরাত দিয়ে বেঁচে গেছেন।] কিছু মৃদু তিরস্কারের ব্যঙ্গ এসব গল্পে অবশ্যই আছে; কিন্তু বৈঠকী আমেজটাই মুখ্য যা যে কোনো বিদেশী হাস্যরসিকের গল্পে অনুপস্থিত। বিশুদ্ধ আনন্দদানের জন্যেই এগুলি লেখা। অবশ্য 'নীলতারা', 'রটন্তীকুমার', 'ভরতের ঝুমঝুমি' ইত্যাদি গল্পে বৈঠকী আমেজ নেই; কেবল বিশুদ্ধ আনন্দ-উপভোগের দিকটাই বড়।

আবার পরশুরামের গল্পের আর একটি উদ্দীপ্ত ধারা— প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার ভিত্তিতে লেখা অবিস্মরণীয় বেশ কিছু গল্প ঃ জাবালি; হনুমানের স্বপ্ন; পুনর্মিলন, প্রেমচক্র। জাবালি পরশুরামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। লোকায়ত দর্শনের নির্ভীক প্রতিনিধি শালপ্রাংশু জাবালি সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ বুদ্ধির অসামান্য দৃষ্টান্ত। গল্পটির মধ্যে দেবতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ এবং নৃত্যপরা ঘৃতাচীর পিঠে জাবালির স্ত্রীর ঘেঁটী বলে ঝাঁটা মারার কৌতুক শেষ পর্যন্ত সংস্কারমুক্ত প্রজ্ঞার প্রশস্তিতে গম্ভীর হয়ে গেছে। যেন পরশুরাম তাঁরই বাস্তববাদী যুগের এক প্রতিনিধিকে এনে গল্পের মধ্যে হাজির করেছেন। জাবালি বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক চেতনার নির্মোহ, সত্যসন্ধ; নির্ভীক ইহকালনিষ্ঠার ভাবমূর্তি। 'প্রেমচক্র' গল্পের বক্তা মামা মামীর ধমকে গল্প থামিয়ে দিলেও পৌরাণিক গাম্ভীর্যে ইয়ার্কির ফোড়ন দিয়ে তাতে আবার ব্যঙ্গ চিত্রের রস মিশিয়ে প্রেমের একটা তত্ত্বে পৌঁছেছেন। তত্ত্বটি হলো ঃ শুধু পেছনে পেছনে দৌড়লে হতাশ হতে হয়, উদাসী বাবা না সাজলে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না।

তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে পরশুরামের ক্ষুরধার অথচ কৌতুকস্নিগ্ধ সজাগ কলম হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার জেগে উঠলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটলগ্নে, যখন যুদ্ধের রক্তপাতের নেপথ্যে মন্বন্তর, লোভ, চোরাকারবার, মুনাফাশিকার এবং রাজনৈতিক ক্ষিপ্রতা

দেশের আবহাওয়াকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। 'দশকরণের বানপ্রস্থ' লিখে পরশুরাম দেখালেন বানপ্রস্থ নিয়েও দশকরণ সন্ন্যাস পেলেন না। দশকরণ কোটিকরণ হয়ে আবার একীকরণ হয়ে গেলেন। এক সঙ্গে সব দেহ মনের সুখ দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। সংসারের দায়িত্বে পড়ে মটকায় চড়ে ভাবতে লাগলেন—'এ কি রকম মুক্তি, লোকে ছাড়তেই চায় না, নাইবার খাবার অবসর নেই।' বিপর্যস্ত সংসারের দায়িত্ব দশকরণের মতো এইভাবেই পরশুরাম আবার কাঁধে নিলেন। হাস্যরসে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য এলো পারিপার্শ্বিকতার চাপে। সমসাময়িক কাল রূপকে মূর্ত হলো 'তৃতীয় দ্যূতসভা'য়। রাজনৈতিক কুটতাকে তীব্র শ্লেষে আঘাত হানলেন। স্যাটায়ারিস্টের তীব্র ঝাঁজে আগের মতো আর কমেডিয়ানের সহনশীলতা সহানুভূতির উত্তাপ নেই। সমাজ ও জীবনের তীব্র অনিশ্চয়তায় ক্রোধ এবং অশ্রু মিশে যেমন ছোটগল্পের প্রাচুর্য ঘটেছে সবদেশেই, তেমনি মহাযুদ্ধের সংকটে দেশব্যাপী সর্বাত্মক বিকৃতির পটে পরশুরামের কৌতুক-রসে নিখাদ স্যাটায়ারিস্টের ঝাঁজ এসে গেল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, পরশুরাম রামায়ণ মহাভারতের বানপ্রস্থ ছেড়ে জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন। কিন্তু গন্ডেরিরাম, বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, স্যার ট্রিক্সি টার্ণকোটের স্রষ্টা তো জীবনের মধ্যেই ছিলেন, আর জাবালি, হনুমানের স্বপ্ন, পুনর্মিলন কিংবা প্রেমচক্রের মতো গল্প তো পৌরাণিক রূপকেই সমকালের সত্য-যাচাই এর চেষ্টা। তবে তফাৎটা কোথায়? জীবনেই ছিলেন, জীবনে রইলেন। কেবল মহৎ রসিকের কপালে ভ্রূকুটি দেখা গেল। দেখা গেল ভোলত্যের এর তিক্ততা, থ্যাকারের নগ্ন নির্মমতা। বিচলিত পরশুরাম লিখলেন 'গামানুষ জাতির কথা'—এক অনাগত ভবিষ্যতের কাহিনী—যেদিন গামা রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর মানুষজাতি নির্মূল হয়েছে আর ইঁদুরেরা ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষ হয়ে গেছে। মানুষের প্রতি অসহ্য ঘৃণায় যেমন সুইফটের লিলিপুট, তেমনি পরশুরামের গামানুষ—মানুষ-ইঁদুর, লোভে স্বার্থে সন্দেহে বিকৃত মানুষের রূপ। গল্পের শেষে বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা ফেলে ব্যোমচন্দ্র গামানুষকে পৃথিবী থেকে লোপ করে দিলে। শেষ ঘোষণায় শোনা গেল দুরাত্মা অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে বসুন্ধরার দুঃখ নেই। দশবিশ লক্ষ বছরে তাঁর ধৈর্য-চ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি আবার গর্ভধারণ করবেন। অর্থাৎ পরশুরাম এখানে বেশ কিছুকালের জন্যে মানুষের বিলুপ্তি কল্পনা করেছেন। 'তিন বিধাতা' গল্পেও ব্রহ্মা শয়তানকে এই কথাই বলেছেন। সুস্থ সমাজ কী করে গড়া যায় তা নিয়ে তিন বিধাতা—ব্রহ্মা, গড, আল্লা আলোচনায় বসেছেন। যদি সুস্থ সমাজ তৈরী হয়ে যায় এই ভয়ে জগতের মাতব্বররা শয়তানকে পাঠালেন বিধাতাদের সুখে রাখতে। কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে পার্সেন্টেজে বনলো না। তাই তিনি রায় দিলেন—শয়তান তার মানুষ মক্কেলদের দিয়ে চুরি-ডাকাতি বাটপাড়ি যা খুশি করতে পারেন, কারণ নতুন করে পরে মানুষ সৃষ্টি হবে।

'গামানুষ জাতির কথা' বা 'তিন বিধাতা'র মতো চরম dystopian গল্প পরে আর নেই ঠিকই, কিন্তু সমকালের রাজনীতি, নানা মতবাদ ও দেশপ্রেম সম্পর্কে পরশুরাম প্রায় নৈরাজ্যে পৌঁছেছেন। 'শোনা কথা,' 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি,' 'গন্ধমাদন বৈঠক,' 'রামরাজ্য' ইত্যাদি গল্পে। রামরাজ্যে হনুমানজী প্রভাবিত মিডিয়ম ভূতনাথ নন্দী অজ্ঞানে পেছন থেকে ধস্তাধস্তিরত কংগ্রেসী কানাই গাঙুলি এবং বামপন্থী ভুজঙ্গ ভঞ্জকে লাথি মেরে ধরাশায়ী করে দিয়েছেন। তারপর ক্ষমা চেয়েছেন। একটি উপকাহিনী আছে মহাবীরের মুখে—গোনর্দ দেশের কথা। গরুদের মধ্যে চালাক গরুরা গণতন্ত্রে

শাসন ক্ষমতায় এসে কীভাবে প্রভুত্বের লোভে ক্ষমতা অপব্যবহার করলে, অন্যদের মধ্যে প্রভুত্ব জাগিয়ে বিদ্রোহের রাস্তা করে দিলে। তারপর মারামারি করে গোনদ দেশ গোভাগাড়ে পরিণত হলো। অব্যর্থভাবে জর্জ অরওয়েলের 1984-এর কথা অবশ্যই মনে পড়বে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের হাতে ভবিষ্যৎ তৈরি হওয়া সম্ভব নয়; যেহেতু আজ যে রক্ষক; কাল সে ভক্ষক। 'গন্ধমাদন' বৈঠকে একটু নরম সুরে গামানুষের গল্প বা তিন বিধাতার মতো মানবজাতিনাশের সংবাদই শুনি। বিষ্ণুর কাছে অনুরোধ করতে হচ্ছে, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও। 'নইলে আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।'

দলীয় মতবাদের ওপর পরশুরাম আস্থা হারিয়েছেন বোঝাই যায়। 'বালখিল্য-গণের উৎপত্তি' গল্পে একটি বিশিষ্ট মতবাদকে 'গর্ভস্থ অজাত অপগণ্ডগণের ঐক্য' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে, 'পিতামাতা গুরুর শাসন মানবো না' বলে যাদের বাণী শোনা গেছে, বিশ্বামিত্রকে দিয়ে বাদুড়ীদের বক্ষলগ্ন করে দুধ খাইয়ে যাদের শান্ত করা হয়েছে তাতে নৈরাজ্যবাদী শিল্পীর অসংযত কণ্ঠ শোনা গেছে। 'দ্বান্দ্বিক কবিতা'তেও এই রকম মতবাদ নিয়ে ঠাট্টা ঃ মার্কসীয় বৈষ্ণভিজম্, তান্ত্রিক ফ্যাসিজম্, মার্কিন অদ্বৈতবাদ। মানুষের ওপর আস্থা না হারালে এইরকম বিশ্বাসহীনতায় পেঁাছোনো যায় না। হাস্যরসিকের প্রসন্নতা একেবারেই নেই। কোনো আদর্শবাদের আভাসও নেই। কিন্তু 'সরলাক্ষ বোস', 'একগুঁয়ে বার্থা', 'শিবামুখী চিমটে', 'ধুস্তরী মায়া', 'পরশপাথর', 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক কিংবা অদ্ভুত রসের গল্পে তাঁর কুঠারে অতটুকু মরচে পড়েনি, আগের মতোই ঝকঝকে। 'সরলাক্ষ বোস' গল্পে সরকারী শাসন যন্ত্র গৌণ ব্যাপারে মহাগুরুত্ব দিয়ে বিভাগ খুলে বসা, বিচিত্র সব বিভাগ যেমন বানর নির্বাসন অধিকর্তা কিংবা কুক্কুটাণ্ড-বিবর্ধন পরীক্ষা-সংস্থা-অবধুত্তক বা অফিসার ইন-চার্জ অব হেনস্ এগ এনলার্জমেন্ট এক্সপেরি-মেণ্টাল স্টেশন, আত্মসম্মান বিকিয়ে চাকরি বজায় রাখার চেষ্টা, বিদেশী ডিগ্রির জৌলুষ দেখিয়ে চাকরি বাগাবার চেষ্টা কিংবা ওই একই উদ্দেশ্যে প্রভাবশালীর আত্মীয় হবার জন্যে ছলাকলা করা ইত্যাদি নানান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সামাজিক তক্মার প্রতি মোহ নিয়ে প্রচণ্ড বিদ্রূপ পরশুরামের অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তিরই প্রমাণ। এই সবের মধ্যে থেকে যে স্বার্থপর মূর্খতা দেখতে পাই তাকে পরশুরামের ভাষাতেই বোধ হয় মোক্ষমভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ 'ভারতবাসী যেমন গরুকে মাতৃবৎ দেখে তেমনি বাঁদরকে ভ্রাতৃবৎ দেখে।' 'ষষ্ঠীর কৃপায়' উদ্ভটরসের সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সমস্যার একটি চমৎকার কাহিনী তিনি পরিবেশন করেছেন। তেমনি তথাকথিত নীতিবোধের তির্যক উদাহরণ হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচার-পতির ব্যঙ্গচিত্র ফুটেছে 'আতার পায়েসে'।

উচ্চাঙ্গের হিউমার মানুষকে যে উদ্বোধিত করে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্টিফেন লীকক বলেছিলেন, কার্ডিনাল নিউম্যান এ বিষণ্ণ সংসারের গুমোট আবহাওয়ায় লীড, কাইণ্ডলি লাইট বলে আলোর জন্যে কেবল চীৎকারই করেছিলেন, কিন্তু ডিকেন্স্ তাঁর মিস্টার পীকউইকের মাধ্যমে সেই আলোই দিয়ে গেছেন আমাদের। স্থূল রুচিবর্জিত উচ্চাঙ্গের হিউমার ক্রোধ আর জ্বালাকে প্রচ্ছন্ন রেখে মানুষের মনে সেই প্রসন্ন কৌতুকের আলোই ছড়িয়ে দেয়। পরশুরামের রচনার প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ কজ্জলী, গড্ডালিকা, হনুমানের স্বপ্ন পর্যায়ে ব্যঙ্গরসের মধ্যে প্রসন্ন কৌতুকের আলোই চোখে পড়ে। পরশুরাম স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারমুক্ত জাবালির ব্যক্তিত্বের আদর্শে সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতিকে কৌতুকস্নিগ্ধ তিরস্কার করে গেছেন। তারপর দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্যোগের দিনে পরশুরামের সেই আদর্শ কিছুটা ভারসাম্য হারিয়েছিল। পামানুষ; বালখিল্য বা খাশিক কবিতার সেই কেন্দ্রচ্যুতি বা আস্থাহীন নৈরাজ্যই চোখে পড়ে। এই সময়কার গল্পে খানিকটা ব্ল্যাক হিউমারের স্বাদ পাওয়া যায়—উদ্ভট বীভৎসতার জগতের কিছু চরিত্র যারা একাধারে হাস্যকর, বীভৎস, নিষ্ঠুর এবং নিরর্থক। কিন্তু শেষ পর্বের গল্পে পরশুরাম কেবলই যে dyctopia-র দুঃস্বপ্ন দেখেছেন বা অন্ধকারের হাসি দেখেছেন তা নয়। নইলে নীলকণ্ঠ গল্পে গান্ধীবাদ-মার্কসবাদে বীতশ্রদ্ধ; ভেজাল বউ পেয়ে প্রবঞ্চিত আত্মহত্যায় উদ্যত নীলকণ্ঠ তবলদারকে বিষ খাইয়ে বিষেও ভেজাল বলে বাঁচিয়ে দিলেন কেন? নীলকণ্ঠ হাঁফ ছেড়েই বা বাঁচলো কেন? 'যশোমতী' গল্পে এককালের প্রেমিক-প্রেমিকাকে পঞ্চাশ বছর বাদে সামনা সামনি এনে দুটি মনকে আত্মিক সম্পর্কের প্রসন্নতায় রমণীয় করে তুললেন কেন? আর 'সাড়ে সাত লাখ' গল্পের হেমন্তকে দিয়ে বলিয়ে দিলেন কেন যে; ওস্বার্থলেস লোকদের উচ্ছেদ করে নিষ্কামভাবে লোকহিতে লেগে যাও? ভোলত্যারের কাঁদিদ বার্ণাড শ'র ব্ল্যাক গার্ল সার্চ ফর গড কিংবা বঙ্কিমের কমলাকান্ত—যে কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিকের মতোই পরশুরাম পরোপকারের সামাজিক আদর্শটিকে পারিপার্শ্বিক দুর্যোগের মধ্যে নিজেরই ল্যাবরেটরিতে তৈরি চাঙ্গায়নি সুধা খেয়ে বোধহয় বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

আসলে হাস্যরসিক পরশুরাম মাঝে মধ্যে সমাজ-সংসারের বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ও আদর্শহীনতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভ্রুকুটি করলেও মূলতঃ তিনি জীবনরসিক; সমাজ-সংসারের চাল-চলনের সজাগ দ্রষ্টা। 'তিন বিধাতা' গল্পে ব্রহ্মাকে দেখে আল্লার অ্যাসিস্টেণ্ট পীর সাহেব নারদকে বলেছিল—এঁর তো চারো তরফ চার মুহ্। বিছানায় শোন কি করে?

নারদ বলেছিল। শোবার জো কি! ভর রাত ঠায় বসে থাকেন। ইনি ঘুমুলে তো প্রলয় হবে।

মনে হয়; প্রজ্ঞাবান পরশুরামের কৌতুকের আড়ালে একই সঙ্গে লুকিয়ে ছিল সত্যসন্ধ জাবালি এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা—প্রলয়ের দুশ্চিন্তায় যিনি নির্ঘুম বিষম রাত কাটাতেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন

ধূর্জটি প্রসাদ দে

বিশ্বের দ্বিতীয় দশকে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা ছিল লক্ষণীয়; সমাজও সেই সময় নিরন্তর ভাঙ্গাগড়া ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে। ঠিক সেই বিতর্কিত মুহূর্তে একদল মুষ্টিমেয় মুক্তদৃষ্টি সম্পন্ন বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবি এবং চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটে যারা শুধু বাঙালী মুসলমান সমাজ কেন, গোটা বাঙালীর সমাজচিন্তায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার মাধ্যমে। এই গোষ্ঠীর একজন অন্যতম সদস্য সুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক কাজী আবদুল ওদুদ এঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'নজরুলের অভ্যুদয়ের পরে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা'; আর তাদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি,' Emancipation of the intellect; এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে—কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তফের লেখক রোমা রোঁলার কাছ থেকে, পারসিক কবি সাদীর কাছ থেকে, আর হজরত মোহম্মদের কাছ থেকে।[১] এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রধান পরিচালক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন আর তাঁর সংগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; আবদুল করিম (সাহিত্য বিশারদ), শেখ হবিবর রহমান (সাহিত্যরত্ন), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, এ. এফ. এস. আবদুল হক, আনোয়ার হোসেন, আবদুল কাদের, এ. জেড. নুর আহমদ; ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার; ডঃ সুশীলকুমার দে, অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পরিমলকুমার ঘোষ (সম্পাদক, দীপিকা; বিশ্বভারতী সম্মিলনী, পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ); অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি ইত্যাদি।[২] ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ মোঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 'তার এগার দিন পরে এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ—আমাদের চুলপাকা নবীন গল্পনিপুণ শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়'।[৩] বলা আবশ্যক এই সাহিত্য সমাজ কিন্তু শুধু মাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের প্রচেষ্টাকে আবদ্ধ করে রাখেন নি। উপরে উল্লিখিত হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের নাম এবং 'শিখা'র প্রথম বর্ষের সম্পাদক আবুল হুসেনের উক্তি প্রমাণ করে যে 'এ সমাজ কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য আর সেই সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪] এছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, অধ্যাপক আবুল হুসেনের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং জনুদেশে জাতিধর্মনির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা;

ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।[৫] তবে উদ্দেশ্যের বিবৃতি দিয়েই এঁরা কিন্তু ক্ষান্ত হন নি, উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা মনে করেছেন যতক্ষণ অবধি না মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজ, জীবনকে সরস, সুন্দর ও 'বৈচিত্র্যবিপুল' করে তুলতে পারবে, যুগযুগান্তের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা জাগিয়ে তুলতে পারবে ততক্ষণ অবধি তার মুক্তিই বলা যাক বা উন্নতিই বলা যাক কোনো কিছুই সার্থক হবে না। আর এই উন্নতিকে সর্বতোমুখী করে তোলবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বুদ্ধিজীবিদের প্রচেষ্টার যাঁরা নিজেদের চিন্তাধারাকে একমুখী করে সমাজের নিস্পন্দ জীবনের উথর আঘাত হানবেন, জীবনকে সম্পদপূর্ণ ও আনন্দে ভরপুর করে তুলবেন, আর সমাজের জানার ক্ষুধা, বোঝার ক্ষুধা সৃষ্টি করে প্রাণের সৃষ্টি করবেন। তবে সাহিত্য সমাজ ও তার মুখপত্র 'শিখা' কিন্তু শুধু জ্ঞানের চর্চা আর সমাজ সচেতন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বাংলার মুসলমান সমাজের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণতার চিত্র, গলদের দিককে এঁরা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। এঁদের প্রচেষ্টা ছিল সমালোচনার মধ্য দিয়ে আঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজ চরিত্রের দুর্বলতার দিকগুলো প্রকাশ করা, যাতে সমাজ তার ত্রুটির সংশোধনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। 'শিখা'র প্রথম বর্ষের প্রকাশক আবদুল কাদের 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ সেইজন্য জানিয়েছিলেন যে বাংলার মুসলমান সমাজের কিছু অপ্রিয় সত্যের উদ্ঘাটনই হচ্ছে এই 'শিখা' পত্রিকা আর সাহিত্য-সমাজের মূল উদ্দেশ্য।[৬] আর এই অপ্রিয় সত্যের উদ্ঘাটন করতে গিয়েই তাঁরা সমকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের যে দুটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃশ্যমান সমস্যা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবোধের সঠিক উপলব্ধি এবং ধর্মকে সমাজোন্নয়নের উপযোগিতায় ব্যবহার করার সম্মুখীন হন। এঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এই দুইটি সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট চিন্তাধারার অবতারণা করা এবং সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত কর্মসূচীর আলোচনা এবং বাস্তবানুগ পদ্ধতি সম্পর্কে মত বিনিময় করা। এই সূত্রে বলা দরকার যে সাহিত্য-সমাজের জন্মের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ভাষা ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। কারণ ছিল সমাজের এক বৃহৎ গোষ্ঠির প্যান-ইসলামিক ভাবধারা, যার প্রকোপে পড়ে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের একটি বৃহৎ অংশ বহির্ভারতীয় সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে অসমর্থ হয়েছিল। সেদিনের বাঙালী মুসলমান সমাজের এই অংশটি দেশের মাটির সংগে, জন্মভূমির সংস্কৃতির সংগে নিবিড় সম্পর্ক উপেক্ষা করেছিল। তাদের মনোভাবের এক ছন্দোবদ্ধ রূপ দিতে গিয়ে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম নামে এক কবি সমসাময়িক 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় লিখলেন—

> 'কি আসে যায় আজমী ভাষায় ভাবটিতে মেরে আরবের
> আমি বঙ্গবীণার সুরে বাজাই ছন্দ সুদূর হেজাজের।'

শুধু তাই নয় বাঙালী মুসলমান তার ভাষার দিক থেকে যাতে তার মুসলমানি হারিয়ে না ফেলে এই দাবীতে তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কলকাতার সমসাময়িক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'সাহিত্যিক'-এ মোহাম্মদ গোলাম মওলা নামে এক লেখক **Oriental Association** কে আবেদন জানিয়েছিলেন যে তারা যেন আরবী বাংলা **transliteration** এর একটি **uniform** পদ্ধতি স্থির করে দেয়।[৮] এমন কি এরা বলতে দ্বিধা করেনি যে 'বাঙালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা'[৯] (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে

বাংলার মুসলমানের আরবী ফারসীর প্রতি এই অস্বাভাবিক টানের আপেক্ষিক কারণ ছিল ধর্ম; মুসলমানের ধর্মগ্রন্থগুলো প্রায় সবই আরবীতে লিখিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে শুধু মাত্র ধর্মীয় কারণই মুসলমানকে বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানকে তার মাতৃভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে সাহায্য করেনি। কারণ কিছু আকবর (২য়, অনুচ্ছেদ ২৪) এ স্পষ্টই বলা হয়েছে 'পণ্ডিতগণ আল্লাহ্ এর গুণাবলী পারসিক ভাষায় বর্ণনা করতে সক্ষম।'[১০] প্রখ্যাত ইসলাম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আবুল মুন্ তাঁহার মতে 'পারসিক' শব্দটির অর্থ আরবী নয় এমন কোনো ভাষা,[১১] এমন কি অপর একজন পণ্ডিত আল গজালী মনে করেন এর অর্থ যে কোনো ভাষা।[১২] এই একই কথা বলেছেন আবু হানিফা এবং তাঁর দুই শিষ্য আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মদ।[১৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমানের আরবীর প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পায়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজের অবিসংবাদী নেতা আমীর আলী এই উক্তি করেছেন যে, 'আরবী ভাষায় প্রার্থনা করবার একটি যুক্তিনির্ভর কারণ আছে। এই নয় যে এই ভাষা আমাদের ধর্মপ্রচারকের ভাষা বরং বলা যেতে পারে এই ভাষা ইসলামের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর মাধ্যমে ঐস্লামিক ঐক্য রক্ষিত হচ্ছে, এই ঐক্যের চেয়ে বড় শক্তি আর কি হতে পারে?[১৪] সেদিনের বাংলার মুসলমান সবকিছু পরিত্যাগ করে এই ঐস্লামিক ঐক্যের কথাই সর্বাগ্রে ভেবেছিলো।)

সাহিত্য সমাজের সভ্যরাও উদ্যোক্তারা কিন্তু চেয়েছিলেন এই মনোভাবের অবসান হোক, বাংলার মুসলমান যাতে তাদের নিজেদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এই ছিল তাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তসদ্দুক আহমদ সেইজন্য খানিকটা উদ্বেগ মিশ্রিত সুরে এই বক্তব্য রেখেছিলেন যে, 'বাঙালা সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবহমান কালের অবহেলার জন্য তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এরূপ গঠিত হইয়াছে যে তাহাতে আমাদের নিজস্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ধর্ম, আমাদের পূর্বতন ইতিহাস, আমাদের সমাজ, আমাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বাংলা সাহিত্যের অপর উপাসকগণের হইতে বিভিন্ন। অথচ বাঙালা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র সাহিত্য। এই অবস্থায় সেই সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় কি?'[১৫] কিন্তু এই অবহেলার কারণ কি ছিল? বাংলার মুসলমান কিসের জন্য নিজের দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে অবহেলা করে আরবী, ফারসী আর উর্দু নিয়ে মেতে ছিল সেই অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে কি গভীর আঘাত পেয়ে বাংলার মুসলমান বাংলার বৃহত্তর সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। এই সত্যটির কথা রবীন্দ্রনাথ তার 'লোকহিত' প্রবন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন 'বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হতে দিই নাই।'[১৬] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সাহায্যে, এই বেদনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবুল হুসেন প্রমুখ সেদিনকার মুসলমান বুদ্ধিজীবিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দুর আর্যশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মুসলমানকে ঠেলে দিয়েছে ইরাণ, তুরাণ আর আফগানিস্থানের দিকে, সুতরাং প্যান ইসলামিজমের চিন্তা যে মুসলমানের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানের খুব সুপরিকল্পিত তা হয়ত নয়। এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের জোর চাহিদা যে মুসলমানী

বজায় রাখতে হবে তার কারণও অতিরিক্ত হিন্দুয়ানা' 'বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া।'[১৭]

এই বিড়ম্বনা আর প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও সমাজের সভ্যরা কিন্তু নিজেরা বুঝতে চেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সংগে অন্যান্যদেরও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্যের চর্চা এবং নিজের মাতৃভূমিকে মর্যাদা দেওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই। বাংলার মুসলমান যদি এই সত্যকে অস্বীকার করে নিজের অস্তিত্বকে বাস্তবায়িত করবার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে যায় তাহলে চিরদিনই Identity-Confusion এর ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খেতে হবে। এই কারণেই আবুল হুসেন ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'বুলবুল' পত্রিকায় 'বাংলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ' নামে এক নিবন্ধে বাংলার মুসলমান সমাজকে আহ্বান করে বলেছিলেন 'বাঙালার মুসলমানকে এখন এই মনে করতে হবে যে এই বাঙালা দেশ আমাদের।' আর সমাজের প্রথম বছরের সভাপতি তসদ্দুক আহমদ যা বলেছিলেন তার থেকে স্পষ্ট আর জোরদার বোধহয় আর কিছু হয় না কেননা তার মতে 'বাঙালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মাকেই অস্বীকার করিতে হয়।'[১৮] এই প্রসংগে যে প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে তা হচ্ছে এই যে বাংলার মুসমান কি উপায়ে সংস্কৃতি আর সাহিত্য চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করবে। একটা খুব সহজ উপায় হয়তো ছিল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় হিন্দুদের অনুবর্তী হওয়া। কিন্তু সে মুহূর্তে তা সম্ভব ছিল না, এমন কি বাঞ্ছনীয়ও নয় তার কারণ মুসলমান হিন্দুয়ানার আস্ফালনের জন্যই হোক বা তার নিজের অস্তিত্বের সচেতনতার জন্যই হোক এই ধরণের আত্মলোপের পক্ষপাতী ছিল না। এ ছাড়া এক ধরণের Cultural Cringe এর চিন্তা বহু আগে থেকেই তাদের সমাজ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় সমাজ আন্দোলনের গোড়ার দিকের অন্যতম একজন নেতা 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের ভীতিমিশ্রিত চিন্তাতে, যিনি মনে করেছিলেন আরবী, পারসী, আর উর্দুর আলোচনা এদেশ থেকে উঠে গেলে বাংলার মুসমান তার তথাকথিত জাতীয়ত্ব হারিয়ে সম্পূর্ণ হিন্দু হয়ে পড়বে এবং ক্রমে বৌদ্ধদের মতো তাদের অস্তিত্ব হিন্দুদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।[১৯] বলাবাহুল্য সে যুগে এই চিন্তা শুধুমাত্র রেয়াজুদ্দিন আহমদের চিন্তা নয়, গোটা মুসলমান সমাজের চিন্তা। তবে সাহিত্য সমাজের উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ এবং সুদূরপ্রসারী, সেইজন্য তারা আরবী, উর্দুর মোহাবেশ কাটাতে পেরেছিলেন কিন্তু এরাও তাদের স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি চান নি। তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের ইঙ্গিত নয় বরং মুসলমানের উন্নতি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার, যে স্বাতন্ত্র্যবোধকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মুসলমান নিজের প্রকৃতিতে মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।[২০] এই সত্য কার্যকর করবার জন্য সাহিত্য সমাজের নেতা আবুল হুসেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন মিলিত হোক। শ্রদ্ধেয় পি. সি. রায়ের এই শুভ ইচ্ছাকে অভিনন্দন জানিয়েও তিনি মনে করেছিলেন যে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ পৃথক থাকুক।[২১] আর সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি তসদ্দুক আহমদ আবুল হুসেনের চিন্তাধারার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দিয়ে বলেছিলেন 'যদি আমরা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমরা মুসলিম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি।'

স্বাতন্ত্র্যের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংগে জড়িত ছিল আরো একটি সমস্যা; যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের নীতি আর নিয়ম পালনের সমস্যা, সে নিয়ম আর নীতি এই স্বতন্ত্র্যের অভিযানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেদিনের মুসলমান সমাজের অনেকের মনে উদয় হয়েছিল যে, নামে সাহিত্য সমাজ তাতে আবার ধর্ম কেন? এর জবাব দিতে গিয়ে সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনের সভাপতি খান সাহেব আবদুর রহমান খান বলেছিলেন যে, 'মুসলমানের ধর্ম তাহার সমস্যা জীবনব্যাপী একটি সমস্যা। তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সম্বন্ধ এরূপভাবে জড়িত যে তাহাদের বিচ্ছেদ কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং কোন মুসলমান সাহিত্যিক সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে সাহিত্য সেবায় ব্রতী হইলে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য।'[২১] আসলে সাহিত্য সমাজের উদ্যোক্তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তবে সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাঁদের যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ব্যাপারেও তাঁদের সেই বন্ধনমুক্ত উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মের নীতি ও নিয়ম গুলো পালনের সার্থকতা সংক্রান্ত চিন্তা এবং আলোচনার ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত না হলেও প্রচেষ্টার স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কিছু কিছু দেখা যায়। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'সবুজপত্রে' তরিকুল আলম তার 'আজ ঈদ' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙালী মুসলমানের না বুঝে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের সমালোচনা করে বলেছিলেন 'ধর্মের মানে মুক্তি না হয়ে এমন দাসত্ব কেন? আর যে সে দাসত্ব নয়—মনের দাসত্ব; শরীরের দাসত্ব থেকে মুক্তির তবুও আশা থাকে, কিন্তু এ মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি কোথায়?' সাহিত্য সমাজের সভ্যরা এই মুক্তির কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন, কাজী আবদুল ওদুদ এই গোষ্ঠীর পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে এদের আন্দোলন ছিল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, এদের বার্ষিক পত্র 'শিখার' মুখবাণী সেইজন্য ছিল এই যে 'জ্ঞান সেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' আর ওদুদের মতে আন্দোলনের ভাবধারা তাঁরা বিভিন্ন মহান ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি থেকে গ্রহণ করলেও মূলতঃ এরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ও মেয়েদ খলিফাদের এবং আবু হানিফা, ইবনে খলদুন ও আল-মামুন ইত্যাদি ব্যক্তির চিন্তাধারার দ্বারা, যাঁরা সকলেই ধর্মকে দেখতে চেয়েছিলেন চলিষ্ণু জীবনের একটা প্রতীক হিসেবে যে মুক্ত বুদ্ধিকে অবলম্বন করে নিয়ত এক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নিজেকে সার্থক করে তুলবে। ১৮৪৮ সালে পণ্ডিত প্রবর রেনান বলেছিলেন Islamism will perish; সেদিনকার মুসলিম বাংলার চিন্তা নায়ক সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল হুসেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বললেন 'বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যতিরেকে মুসলিম কালচার যে অচিরে বিলুপ্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি?'[২৪] কিন্তু এখানেই প্রশ্ন ওঠে যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে বাংলার মুসলমান সমাজের দিকে তাকিয়ে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি কেন মুক্তির কথা, বিশেষ করে বুদ্ধির মুক্তির কথা ভেবেছিলো? তার কারণ তারা আতঙ্কের সংগে দেখেছিলো কি ভাবে ইসলাম শুধুমাত্র দুষ্পরিবর্তনীয় কিছু আদেশ নিষেধের সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলোর সাহায্যে কিছু ধর্মপুরোহিত সমাজজীবনকে চেপে মেরে ফেলবার উপক্রম করছে; জীবনের সহজগতিকে রোধ করছে। জীবন এগিয়ে চলেছে, সমাজেরও পরিবর্তন হয়েছে আর ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় সমাজকে ধারণ করা তা হলে এই

পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে ধর্মের বিধিবিধানগুলোকে পরিবর্তন করা দরকার। এই সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই যে বাংলার মুসলমান সমাজ, শুধু বাংলা কেন ভারতের প্রায় সর্বত্রই মুসলমান তেরশ বৎসরের পুরনো আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে জীবনের সংগে ধর্মের যে নিবিড় সম্পর্ক তাকে অস্বীকার করে বসেছে। এমন কি বিশের দ্বিতীয় দশকের শেষে এসেও বাংলার মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক নেতা বলতে দ্বিধা করেন নি যে 'মুসলমান মাত্রকেই ইসলাম ধর্মের মূল নীতিগুলি বুঝিয়া হউক না বুঝিয়া হউক বিশ্বাস করিতে হয়। এই বিশ্বাসকে ঈমান বলে।'[২৫] সাহিত্য সমাজের মুখপাত্রদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম যাতে জীবনমুখী হয়ে ওঠে তার প্রচেষ্টা করা, সমাজকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ইসলাম মানুষের জন্য, মানুষ ইসলামের জন্য নয় এবং সবশেষে যা আবুল হুসেন তার 'মুসলিম কালচার ও তার স্বরূপ' নিবন্ধে বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ ইসলামের Rationalism, যা কিনা মুসলিম কালচারের দার্শনিক ভিত্তি সেই সম্পর্কে অবহিত করা। সেইজন্য তারা নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন 'আমরা বুদ্ধিকে সিকেয় তুলে রেখে ফিকাহ আওড়াচ্ছি। তাতে আমরা উন্নতি করবো কেমন করে?'[২৬] তবে তার মানে এই নয় যে তারা ইসলামকে অস্বীকার করেছিলেন বা কোরাণকে দূরে ঠেলে রেখেছিলেন, বরং তাঁদের বুদ্ধির মুক্তিবাদের অনুপ্রেরণা ছিল 'ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহিদ মানব চিত্তের মুক্তির বাণী,'[২৭] আর কোরাণের অন্তর্নিহিত সত্য তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল যে 'কোরাণ মানুষের প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন সুতরাং প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানুষের বুদ্ধি যে ব্যবস্থা ইঙ্গিত করে তা কোরাণ-সম্মত হবে তাতে সন্দেহ নেই। এজন্যই কোরাণের সার্থকতা।'[২৮]

বিশের দ্বিতীয় দশকের এই আন্দোলন যে সেদিনকার বাংলার মুসলমান সমাজের বুদ্ধিজীবিদের নাড়া দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল কিনা সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। তবে কাজ যে কিছু হয়েছিল তা স্বীকার করতেই হবে। শিখা প্রকাশিত হবার পরের বছর আবুল হুসেনের পরামর্শে ও প্রেরণায় ঢাকা, সাতরওগা, ইংনলসিয়া প্রেস থেকে মুন্সী আহমদ আলী প্রকাশ করেন মাসিক 'জাগরণ'—যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল নবজাগরণের দুঃসাহসী মন্ত্র। এই সাহিত্য-সমাজের অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মীরা ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা মুসলিম হলের বর্ধমান হাউসে মোতাজেলা-দলের প্রধান নায়ক আল-মামুনের নামানুসারে আল মামুন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রতিষ্ঠিত হয় Anti-Purda League; বাঙালী মুসলমান মেয়েদের মধ্যে একমাত্র ফজিলতুন্নেসা নিষেধ আর পর্দার বেড়া ডিঙ্গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. উপাধি পেয়েছিলেন; Anti-Purda League এবং সাহিত্য সমাজ তাকে অভিনন্দন জানায়।[৩০] তবে এঁদের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সমাজের পরিবর্তন বিরোধীরা যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বেশী এবং সমাজে যাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম তাঁরা সাহিত্য সমাজের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। প্রথমেই আপত্তি তোলা হয় শিখাতে প্রকাশিত একটি ছবিকে নিয়ে। 'শিখা'র প্রথম পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত একটি ছবির একপাশে একটি মসজিদ ও তার মধ্যে কোরাণ শরীফ এবং আর এক পাশে আগুনের শিখার উপস্থিতি লক্ষ্য করে অনেকেই ঘোর আপত্তি তুলে বলেছিলেন যে এই ছবির মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে মসজিদ এবং কোরাণকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শিখার দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদক অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে ছবির তাৎপর্য রীতিমতো ব্যাখ্যা করে

বোঝাতে হয়েছিল যে, আগুনের শিখা আসলে জ্ঞানের অগ্নিশিখা যা নবজাগরণের সূচনা করবে, আর তার পাশে মসজিদের ভিতর কোরাণের উপস্থিতির অর্থ এই যে ইসলামের এই নবপ্রজ্বলিত শিখায় কোরাণ আর মসজিদের সত্যরূপ প্রকাশ পাবে।[৩১] ধর্মকে নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা এঁরা অধিকাংশই সহ্য করতে পারেন নি। সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মিলনে একজন সমালোচক আবদুর রব চৌধুরী আলোচনাকারীদের সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, যতই ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করা হোক না কেন ধর্মের উপর আঘাত হানা চলবে না।[৩২] ঐ একই সম্মিলনে অধ্যাপক আব্দুল হাকিম সম্মিলনের কার্যসূচী দেখে আপত্তি তোলেন। সূচী অনুসারে কোরাণ আবৃত্তির পর একটি গান গাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু তার মতে গান দ্বারা কোরাণের অবমাননা হতে পারে এবং সেই কারণেই গানটি একটু দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।[৩৩] তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পরে এই সাহিত্য সমাজে সাধারণ ও বার্ষিক সব অধিবেশনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম হলে' নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে এই সাহিত্য সমাজ ধর্মবিরোধী।[৩৪] শুধু সাহিত্য সমাজ কেন প্রতিক্রিয়াশীল আর ইসলামের ধ্বজাধারীদের আঘাত এসেছিল এই সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল হুসেনের উপর, যিনি বলতে পেরেছিলেন 'তাখাল্লাকু বি-আমলাকিল্লাহ অর্থাৎ তোমার মধ্যে খোদার গুণ সৃষ্টি করো।...সাধনার দ্বারা তুমি মুহম্মদের মত কেন, তার চেয়েও বড়ো হতে পার।'[৩৪] এই দৃষ্টিভঙ্গি আর মতবাদ পোষণের মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল তারই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লাঞ্ছনা আর অপমান সহ্য করে, যার জন্যে শেষপর্যন্ত তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কাজ ছেড়ে দিতে হয়। এইখানেই শেষ নয় ১৩৩৬ আশ্বিনের 'শান্তি' পত্রিকায় তার 'আদেশের নিগ্রহ' নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বুদ্ধিজীবি মহলে এটি সম্পর্কে প্রবল বাদানুবাদ শুরু হয়। সমাজের রক্ষণশীল শক্তিশালী গোষ্ঠী মনে করতে থাকে যে ঐ প্রবন্ধটি ইসলামবিরোধী। শেষপর্যন্ত ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রবিবার রাত সাতটায় ঢাকা 'আহসান-মঞ্জিল' আঞ্জুমান অফিসে বিশেষভাবে আহূত এক সভায় আবুল হুসেনকে হুমকির মুখে এক ক্ষমাপত্র লিখে দিতে হয় যে 'ঐ প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়াছি, সেজন্য আমি অপরাধী'।[৩৫] সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং 'শিখা' প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক ছোলতান ইত্যাদি পত্রিকা বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে এবং এই সমালোচনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সমাজের দুইজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও অধ্যাপক আবুল হুসেন ঢাকা বালিয়াদীর জমিদার খান বাহাদুর কাজেম-উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর সাথে আলোচনার জন্য তার বৈঠকখানায় মিলিত হন। আলোচনার শেষে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সোমবার আবুল হুসেনকে উপরিউক্ত ক্ষমাপত্রের মতো একটি ক্ষমাপত্রে ঘোষণা করতে হয় 'আমি খোদার নিকটে মাফ চাই এবং সমাজের নিকটও আশা করি আমার অপরাধ মার্জিত হইবে।'[৩৬] আবুল হুসেনকে শেষপর্যন্ত এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের মূল্য দিতে হয়েছিল তার জীবন দিয়ে। '১৯৩২-৩৩ সালে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রখ্যাত সমাজসেবী সৈয়দ নওসের আলীর দলের মনোনীত এক প্রার্থী ছিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই নির্বাচন দ্বন্দ্বে আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয় কর্মীরা প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন মোহাম্মদী প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকার বিরূপ উদ্ধৃতি-সমূহ। ফলে ধর্মভীরু ভোটদাতাদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়ে আবুল হুসেন পরাজয়

বরণ করেন। সেই প্রতিযোগিতার পেরেশানি ও পরাজয়ের গ্লানি তাঁর স্বাস্থ্যে যে ভাঙন আনে তারই জের ক্রমে ক্যানসার রূপে প্রকট হয়।'[৩৮]

এই সাহিত্য সমাজের বার্ষিক পত্র 'শিখা' প্রকাশিত হয় পর পর পাঁচ বৎসর এবং এর বাৎসরিক অধিবেশন হয়ে চলে আরো সাত বৎসর, শেষে দশম বর্ষের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র এর সভাপতিত্ব করেন।[৩৯] কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশের সাম্প্রদায়িক অবনিবনার মধ্যে সাহিত্য সমাজের মতো অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারেনি।[৪০] তবে এই সমাজের একজন অন্যতম সদস্য আবদুল ওদুদের মতে এই সমাজ 'সেই দিনে বাংলার শিক্ষাগত মুসলমানদের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাবই বিস্তার করেছিল।··· বাংলার জাগরণের একটি অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিসর কিন্তু বেগবন্ত ধারা যে এই দল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য প্রবাহিত করতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।'[৪১]

উল্লেখ পঞ্জী

১। বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩ পৌষ পৃ. ১৯৪-৯৬

২। বার্ষিক বিবরণী, 'শিখা', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংস্করণ, সম্পাদক, আবুল হুসেন, চৈত্র, ১৩৩৩

৩। ঐ ; পৃ. ২১-২

৪। ঐ ; পৃ. ২৭

৫। ঐ ; পৃ. ২২

৬। শিখা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকের নিবেদন।

৭। আত্ম পরিচয়—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, 'ইসলাম-দর্শন' পঞ্চম বর্ষ, কার্তিক ১৩৩২, প্রথম সংখ্যা পৃ. ৪

৮। ইসলাম ও ললিতকলা—মোহাম্মদ গোলাম মওলা, 'সাহিত্যিক' প্রথম বর্ষ, মাঘ ১৩৩৩ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৯৬

৯। মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার—কেনচিৎ মর্মাহতেন হিতকামিনা, 'নবনূর', ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১০ পৃ. ১৬৮

১০। The Muslim Creed:its genesis and historical development—A. J. Wensinck, Cambridge, 1932, chapt. VIII p. 196

১১। ঐ ; chapt. VIII p. 236

১২। M. Asin Palacios. Fl Justo Medio. p. 387

১৩। Jawahir ul-Akhlati : Durrul-Mukhtar, Bab us-Salat (chapt. on prayer); Sprit of Islam—Syed Ameer Ali. Chirlstophers London. 1955, part-II, chapt. II, p. 186.

১৪। Sprit of Islam part. II, chapt. II P. 186-87

১৫। 'শিখা', প্রাগুক্ত সভাপতির অভিভাষণ পৃ. ৯

১৬। লোকহিত, কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড—প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২২৪

১৭। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা—আবদুল ওদুদ, 'শিখা' প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৮। 'শিখা', প্রাগুক্ত, সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ৭

১৯। সম্পাদকের মন্তব্য, যোগ কালনুর—আবদুল করিম, 'ইসলাম প্রচারক', ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৯ পৃ. ২১

২০। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনাবলী প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৪

২১। সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য—আবুল হুসেন, 'নব্য-বাংলা', চৈত্র ১৩৩৯ সন।

২২। সভাপতির অভিভাষণ, শিখা, প্রাগুক্ত পৃ. ৯

২৩। সভাপতির অভিভাষণ, 'শিখা' দ্বিতীয় বর্ষ ১৯২৮ খ্রীঃ পৃ. ১৭

২৪। মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি—আবুল হুসেন 'বুলবুল' বৈশাখ ১৩৩৪ সন।

২৫। ইসলাম ও অন্ধবিশ্বাস—শেখ হবিবর রহমান, সাহিত্য রত্ন, 'ইসলাম-দর্শন' ৫ম বর্ষ, আশ্বিন ১৩৩২ পৃ. ৯

২৬। ফিকা-ফোবিয়া—আবুল হুসেন 'সওগাত' ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৩৫ সন

২৭। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা—আবদুল ওদুদ, 'শিখা', প্রথমবর্ষ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩

২৭। ফিকা-ফোবিয়া প্রাগুক্ত।

২৯। আবুল হুসেনের চিন্তাধারা—আবদুল কাদির, 'সওগাত', চৈত্র ১৩৪৭ বুদ্ধির মুক্তিবাদ ও আবুল হুসেন—আবুল ফজল, 'সংকল্প' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১

৩০। বুদ্ধির মুক্তিবাদ ও আবুল হুসেন—আবুল ফজল প্রাগুক্ত।

৩১। দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণী—সম্পাদক (কাজী মোতাহার হোসেন) 'শিখা', দ্বিতীয় বর্ষ পৃ. ২৪

৩২। বার্ষিক সম্মিলনের বিবরণ (১৯২৬ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ১২ টায় মুসলিম হল, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত) 'শিখা', প্রথম বর্ষ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪

৩৩। ঐ ; পৃ. ১

৩৪। বাংলার জাগরণ—প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৫

৩৫। সত্য—আবুল হুসেন 'তরুণ পত্র' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সন

৩৬। নোটিশ—ঢাকা ইসলামিয়া আঞ্জুমান ১১/১২/২৯ ইং

৩৭। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' ২১শ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা ১৫ই ভাদ্র ১৩৩৫ সাল শুক্রবার।

৩৮। ভূমিকা—আবদুল কাদির, আবুল হুসেনের রচনাবলী—আবদুল কাদির সম্পাদিত ঢাকা ১৩৮৩ পৃ. ২১

৩৯। বাংলার জাগরণ—প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৫

৪০। ঐ ; পৃ. ১৯৫

৪১। ঐ ; পৃ. ১৯৬

মানভূম তথা পুরুলিয়ার লোকসংগীত

অরুণকুমার-মুখোপাধ্যায়

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পহেলা নভেম্বর ভূগোলের পাতা থেকে 'মানভূম' নামটা লুপ্ত হয়ে যায়। রাজনীতির কুটিল বিচিত্র স্বার্থে ভারতের মানচিত্র বদল হয়ে যায়, কিন্তু মন-চিত্র বদলায় নি, বদলানো যায় না।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের সূত্রে যে-সব অংশ নিয়ে মানভূম অঞ্চল যে-সব অংশ ব্রিটিশের শাসনাধীনে আসে। সেইসময় পাঁচেট ও ঝালদার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় সরকারী নথীপত্রে। অষ্টাদশ শতাব্দে মানভূম অঞ্চলকে শাসন করতে বৃটিশ সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। ঘাটশিলার (ধলভূম) রাজা জগন্নাথ ঢল আর কুইলাপালের জায়গিরদার সুবল সিং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তা দমন করতে লেফটেনান্ট ফাগুর্সন ও লেফটেনান্ট নানকে নাজেহাল হতে হয়। বিদ্রোহ দমন করার জন্য রঘুনাথপুর ও ঝালদায় দুটি সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়।

"১৮০৫ সালের ১৮ নং রেগুলেশন অনুসারে জঙ্গল মহালের সৃষ্টি হয় —এতে তেইশটি মহাল ও পরগণা ও তৎসহ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য রঘুনাথপুর ও ঝালদায় দুটি সামরিক ঘাটি স্থাপিত হয়। ১৮৩২ সালে মানভূম জেলায় 'গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহে'র সঙ্গে সঙ্গে সিংভূম, রাঁচী, পালামৌ জেলাতে ব্যাপক বিদ্রোহ ও অশান্তি সুরু হয়।

সুতরাং শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য জঙ্গলমহল ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৩ সালের ১৩নং রেগুলেশন অনুসারে মানভূম জেলার সৃষ্টি হয় এবং মানবাজারে জেলার সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। সেই সময় মানভূম জেলায় ধানবাদ ও পুরুলিয়া মহকুমাসহ সুপুর, রায়পুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর মহল এবং ধলভূম মহকুমা অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন মানভূম জেলার আয়তন হয় ৭৮৯৬ বর্গমাইল। পরে ১৮৩৮ সালে জেলার সদর দপ্তর মানবাজার থেকে স্থানান্তরিত করে জেলার কেন্দ্রস্থল পুরুলিয়ায় স্থাপন করা হয়।

১৮৩৩ সালে মানভূম জেলা গঠনের বারো বৎসর পরে আবার জেলার অঙ্গচ্ছেদ সুরু হয়। ১৮:৫ সালে ধলভূম পরগণাকে মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরও এক বৎসর পরে শেরগড়, চৌরাশী, মহিষাড়া, চৌলিয়াসা ছাতনা, নালিচান্দা, বর্ণখন্ডী বড়পাড়া থানাগুলি এবং বন চাষ ও পাড়ার কিছু অংশবিশেষ বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। তারও পরে ১৮৭১ সালে শেরগড় এবং পাঁড়রার কিছু অংশ বর্ধমানে স্থানান্তরিত করা হয়।

এর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সুরু হয়। এই বিদ্রোহে পঞ্চকোটের তদানীন্তন রাজা নীলমণি সিং যোগদান করেন। পুরুলিয়ার ট্রেজারী আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয় এবং জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। আদালত ভস্মীভূত করা হয়। বিদ্রোহ কিছু পরিমাণে শান্ত হয়ে এলে তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ওকস রাণীগঞ্জ থেকে

পুরুলিয়া
(মানভূম)
পুরুলিয়া
কংসাবতী নদী
দারকেশ্বর নদী
বাঁকুড়া
জামসেদপুর
মেদিনীপুর

সৈন্যসামন্ত আনিয়ে বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হন এবং পঞ্চকোট রাজাকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরণ করেন। ১৮৫৯ সালে রাজা মুক্তিলাভ করেন।

শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ১৮৫৪ সালের ৩০নং অ্যাক্ট অনুসারে গভর্ণর জেনারেল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের এজেন্টকে 'কমিশনার' এবং পুরুলিয়ার প্রধান সহকারীকে ডেপুটি কমিশনার আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৭৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এক নূতন সরকারী আদেশ অনুসারে সুপুর, রায়পুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভেলাইদহ ও ফুলকুসমা পরগণা এবং শ্যামসুন্দরপুরের রায়পুর সাতড়া ও সিমলাপাল থানাসহ সমগ্র অঞ্চল বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে মানভূম জেলা ৭৮৯৬ বর্গমাইল এলাকা থেকে কমে ধানবাদ ও পুরুলিয়া এই দুই মহকুমা নিয়ে ৪০০০ বর্গমাইল এলাকায় পরিণত হয়।

১৮৭৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মানভূম জেলার আর অন্য কোনপ্রকার অঙ্গহানি না হলেও ১৯০৮ সালে ধানবাদ ও রাণীগঞ্জ এই দুই প্রতিবেশী মহকুমা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠন করার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন থাকে—কিন্তু শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়নি। তবে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গের কার্জনী প্রস্তাব সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও ছয় বৎসর পর ১৯১১ সালে তা কার্যকর করা হয় এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে জোরপূর্বক বাংলাভাষী মানভূম জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন সুরু হয়······কিন্তু কিছুকাল পরেই এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯১১ সালের পর ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মানভূমের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দান করেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হলে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী উগ্র ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে বঙ্গভাষাভাষী মানভূমের অধিবাসীদের 'বিদেশী' জ্ঞানে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে, স্কুল কলেজে ভর্তির প্রসঙ্গে প্রভৃতি নানান বিষয়ে 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' দাবী করেন। অবশ্য এই ভেদনীতি মানভূমে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হলেও—সাধারণভাবে সমগ্র বিহারের বাংলা-ভাষীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই ভেদনীতির ফলে মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির আন্দোলন······পুনরায় সুরু হওয়ার পরিস্থিতি দেখা দেয়।

অবিভক্ত বাংলার সুরাবর্দী মন্ত্রীসভার আমলে সমস্যা-কন্টকিত মানভূমের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে এবং সুরাবর্দী সাহেব মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তি দাবী করেন। এই দাবী যখন খুবই জোরদার ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন মানভূমের বঙ্গভুক্তির ঘোরতর বিরোধী বিহারের বিশিষ্ট সর্বভারতীয় নেতা সুরাবর্দী সাহেবকে সতর্ক করে দেন যে, 'হিন্দু অধ্যুষিত মানভূম জেলা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হবে।' এই সতর্কীকরণের ফলে সুরাবর্দী সাহেব মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির দাবী চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী মানভূমের জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে দমন করে হিন্দীভাষী অঞ্চলে পরিণত করার জন্য এক উগ্র দমননীতি গ্রহণ করেন।······এই দমননীতির বিরুদ্ধে সমগ্র জেলায় দুর্বার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে

বাংলাভাষা রক্ষার জন্য বিখ্যাত 'টুসু সত্যাগ্রহ' আন্দোলন ও বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদে এবং মানভূমের বঙ্গভুক্তির দাবীতে সহস্রাধিক সত্যাগ্রহীর ঐতিহাসিক 'বঙ্গ সত্যাগ্রহ' অভিযান করা হয়।

ইতিমধ্যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দেশব্যাপী দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' (১৯৫৫) গঠন করলেন, সেই কমিশন মানভূমের বঙ্গভুক্তির প্রশ্নে সুবিচার করেন নি। মানভূমকে দ্বিখণ্ড করে ধানবাদ মহকুমার সমৃদ্ধ কোলিয়ারী অঞ্চল সহ পুরুলিয়া সদর মহকুমার চাস ও চন্দনকিয়ারী থানা (প্রস্তাবিত বোকারো ইস্পাত কারখানার জন্য নির্বাচিত স্থান) বিহারের অন্তর্ভুক্ত রাখার এবং পুরুলিয়া সদর মহকুমার বাকী ১৯টি থানা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। কিন্তু ভারত সরকার 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনে'র ঐ সুপারিশকে আরও সংশোধিত করে পটমদা থানার বিশ পঁচিশ বর্গ মাইল এলাকায় অবস্থিত ডিমনা নালা থেকে টাটা কারখানায় জল সরবরাহের কাল্পনিক বাধা ও অসুবিধার যুক্তিতে প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল বিশিষ্ট পটমদা, ইচাগড় ও চাণ্ডিল থানা বিহারের অন্তর্ভুক্ত রাখার আদেশ দেন। ১৯৫৬ সালের বিহার-পশ্চিমবঙ্গ (ভূমি হস্তান্তর) আইন অনুসারে ৪০০০ বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট মানভূম জেলাকে তিন খণ্ড করে ধানবাদ মহকুমা সহ চাস-চন্দনকিয়ারী থানা নবগঠিত ধানবাদ জেলারূপে বিহারে থেকে যায় এবং পটমদা-চাণ্ডিল-ইচাগড় থানা সিংভূম জেলায় যুক্ত করে বিহারে রাখার ব্যবস্থা হয়, আর মানভূমের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ষোল থানা বিশিষ্ট পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে 'মানভূম' নাম লুপ্ত হয়ে যায়।"[১]

পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের কনিষ্ঠতম জেলা। সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জেলা। পুরুলিয়ার অপরিসীম অর্থনৈতিক দুর্গতি আজো ঘোচেনি। তবু পুরুলিয়ার মানুষের কণ্ঠে আজো গান শোনা যায়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পুরুলিয়া সমৃদ্ধ। কংসাবতী নদী ও দামোদর নদের তীরে রয়েছে প্রাচীন জৈন ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্যে উল্লেখ্য - বলরামপুরে জৈনমন্দির ও তীর্থঙ্করদের প্রস্তর মূর্তি, বড়াম বা দেউলঘাটার তিনটি মন্দির (শিব, সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা পার্বতী, মহিষাসুর অষ্টভুজা দুর্গার মূর্তি-সমৃদ্ধ), বুধপুরের পাঁচটি শৈব মন্দির, ছড়রার সাতটি মন্দির, পাকবিড়রার জৈন তীর্থঙ্করের বিশাল মূর্তি, পাড়ার রাধারমণ মন্দির, তেলকুপীর মন্দির (পাঞ্চেৎ জলাধার নির্মাণের ফলে নিমজ্জিত), সুইসার মন্দির, পঞ্চকোটের গড়। ছো, নাচনী, দাঁড়, নাটুয়া বা নাট, সাঁওতাল প্রভৃতি নাচ মানভূমের সংস্কৃতির অঙ্গ।

লোকসংগীতে সমৃদ্ধ মানভূম সম্পর্কে বলা যায়, এর জীবনের প্রতি স্তরে জড়িয়ে আছে গান। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে লোকসংগীতের যে নিবিড় সম্পর্ক তার পরিচয় পাই মানভূমের লোকসংগীতে। করম, ভাদু, টুসু গান গাওয়া হয় ঋতুচক্রের সুরে সুর মিলিয়ে। ভাদ্রের শুক্লা একাদশীতে শুরু হয় করম-গান, সারা ভাদ্র মাস জুড়ে গাওয়া হয় ভাদু গান, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে শুরু হয় টুসু গান, ঝুমুর গান, সাঁওতালী গানের সুরে ব্যক্ত হয় ভূমিপুত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

পুরুলিয়া জেলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ তপশিলীজাতি (হরিজন) ও তপশিলী উপজাতি (আদিবাসী) সম্প্রদায়ভুক্ত। এই দুই সম্প্রায়ের লোক জেলার কোনো বিশেষ এলাকায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বাস করে না। জেলার সর্বত্র তারা ছড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে বাস করে। তবে রঘুনাথপুর,

পাড়া, জয়পুর, পুরুলিয়া ও নিতুড়িয়া থানার কিছু অংশে তপশিলী জাতি এবং বান্দোয়ান, বরাবাজার, বলরামপুর, বাগমুণ্ডি ও সাঁতুড়ী থানা এলাকায় তপশিলী উপজাতির লোকেদের বসতি চোখে পড়ে। তপশিলী উপজাতির লোকে এই জেলার পাহাড় ও বনাঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বাস করে। এই জেলার তপশিলী জাতির মধ্যে বাউরী, রাজোয়াড়, মুচি, ডোম, হাড়ি বা মেথর এবং তপশিলী উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল, ভূমিজ, ওঁরাও, মুণ্ডা, খেড়িয়া ও কোরা শ্রেণীভুক্ত লোকের সংখ্যাই বেশি।

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলায় ২৬২৮৫৮ জন তপশিলী জাতিভুক্ত আর ২০০৮৪৩ জন তপশিলী উপজাতিভুক্ত লোক বাস করে। প্রায় পাঁচ লাখ। পরবর্তী দুটি আদমসুমারিতে এই সংখ্যার বিশেষ বদল হয় নি। ১৯৬১ সালে পুরুলিয়া জেলার মোট লোক সংখ্যা ১, ৩৬০, ০৬১।[২]

পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে এক কথায় বলা যায় মিশ্র সংস্কৃতি বা বিপরীতধর্মী সংস্কৃতি। এখানে তার সংহত রূপ দেখা যায়।

"পুরুলিয়ার সাধারণ হিন্দুদের অথবা হিন্দুসমাজভুক্ত বিশেষ কোন জাতির সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে একমুখিনতা নাই বললেই চলে। হিন্দু সমাজের বাইরেকার কতকগুলি আদিবাসী শ্রেণীগোষ্ঠীর বিপরীতমুখী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ চিত্তাকর্ষকভাবে এখানকার সমাজ বিবর্তনে বিধৃত হয়েছে। পুরুলিয়ার ভূমিজ সংস্কৃতিকে তার একটি বিশেষ উদাহরণরূপে ধরা যেতে পারে। অপরাপর তপশিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী—যথা, বাউরী (১১০,০০০), ভাঙ্গী (১৪,০৮০), মহলী (৫,০৭৩), কুরমালী (১,০১৬), কোড়া (১১৪২) এমন কি মুণ্ডা (১২,৪৫৬), ওঁরাও (৫,২৬৬) এবং সাঁওতাল (১,৭৭,০০০) সম্প্রদায়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ভূমিজদের (৩৯, ০০০) বিষয়টি নানা দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। পুরুলিয়ায় ভোগতা (৯৮৬), ঘাসী (৪, ৬৪৮), নট (৮৯৫), বেদিয়া (১১৯১), বিরহোড় (১০০), চেরো (৫৫৯), গোঁদ (৭৩৫), শবর (২১৮১), খোন্দ (৫১), সৌষ পাহাড়ীয়া (২৪) ইত্যাদি আরও কতকগুলি সম্প্রদায় রয়েছে। এরা সকলে পুরুলিয়াকে নৃতত্ত্ববিদদের একটি যাদুঘরে পরিণত করতে অবদান জুগিয়েছে।"[৩]

পুরলিয়ার লোকসংগীতের বৈচিত্র্যের নিদর্শনরূপে এখানে বিভিন্ন উৎসবের গান উদ্ধার করছি।

পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যে সব উৎসব হয় তার কতকগুলি ঋতু-উৎসব। যেমন, শস্য বপনের পূর্বে আষাঢ় মাসে 'এরাসম' (মুরগী বলি দিয়ে পূজা), ভাদ্রমাসে 'হড়িয়াড় সিম' (ফসল সবুজ হলে মুরগী বলি দিয়ে পূজা), শস্য ওঠার পর মাঘী পূজা। তা ছাড়াও 'করম' বা 'জাওয়া' পরব হয় ভাদ্র মাসে। এই করম পরবে যে-সব গান গাওয়া হয় তার বিষয়বস্তু শস্যলাভের আনন্দ। মেয়েরা সন্ধ্যায় পরস্পরের হাত ধরাধরি করে নাচে ও গান করে—

ধান ফুল ধান ফুল যায় ছয় মাস রে
যায় ছয় মাস
পড়ত ভাদর মাস আনব ঘুর‍্যায়।

কুমারীরা অবাধ স্বাধীনতা পায় করম পরবে। খুশিমতো নাচে গায়। তাই

বিবাহিতা মেয়েদের মনে দুঃখ জাগে, কী করে যে কুমারীদের সঙ্গে যোগ দেবে। প্রাণ কেঁদে ওঠে, রাগ হয় গুরুজনদের উপর।

আমড়া রে আমড়া বিছাত
ডাল থাকতে ডগায় ফল ধরে
বাবা গো বাবা উদরা দেশ থাকতে বিদেশ বিইহা দেল।

বিদেশে তার শ্বশুরবাড়ী। সেখান থেকে কীভাবে আসবে। আসার পথে বাধা। বাধা কাটিয়ে ঘরে ফিরতে মন চায়, পরবে যোগ দিতে উন্মুখ হয়।

লহর লহর পরবে দাদা লেগে আইল
ননদ কুমারী ছেঁকল ডহর
ছাড়ু ছাড়ু ননদ কুমার হামর ডহর
আজ বড় শুভদিন ঘুরহ পরব।

করম পরবের সময়েই 'জাওয়া' রাখা হয়। কুমারী মেয়েরা ছোট ছোট বাঁশের টুপায় ও ডালায় বালি দিয়ে তাতে নানারকম শস্যবীজ (কুখি, জুনার, মুগ, বুট, মটর) তেল হলুদ মাখিয়ে বুনে দেয়। প্রথমে শালপাতার থালায় হলুদ মাখানো বীজগুলি ছড়িয়ে দেয়, তারপরে ডালায় বুনে দেয়। একে বলে 'জাওয়া' রাখা। তারপর সব টুপা ডালা এক জায়গায় জমা করে মেয়েরা গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচে আর গায়—

উত্তরে বুনলম মাই গো পশ্চিমে বুনলম গো।
পাওলম জাওয়া তৈরী হার।

পাঁচ দিন বা সাতদিন ধরে 'জাওয়া' রাখা হয়। সকালে ডালায় হলুদ-জল দেয়। সন্ধ্যায় জাওয়া নাচ ও গান হয়। গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ঈর্ষা দ্বেষ। কুমারীরা ফুলপাতা শস্য সবদিকে লক্ষ্য করে গায়—

আকন্দ ফুলে ডালি লোভে লো সখী
তারে নাচে লো সখী।
ঝিঙা লতে কাল্লা লতে বীজ লাগলি
মাইরী বাঁশ লাগলি
তথে লাজ না লাগে লো মুচকী হাঁসুলী।[৪]

বৈশাখী-পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ে যায় সাঁওতালেরা শিকারের মেলায়। পূর্ণিমা তিথিতে সকালে পাহাড়ী ঝর্ণায় স্নান সেরে শিকারে যায়। শিকার সেরে বিকালে নিজ নিজ আখড়ায় নাচ গান করে। এই উপলক্ষে যে-সব গান গাওয়া হয় তার বিষয়বস্তু প্রেমিক প্রেমিকার মিলন বিরহ কথা।

গাতিঞ দ আলো দিয়া সেঁদে রাতেয়—
চালাও অকান
সেঁদে রারেয় শিকার অচয়েন
গাতিঞ জালাও একান
লিলুগে ধুঁয়া অটাং অ
গাতিঞ মিনায় গেয়ারে।

(হে প্রিয়বর! তুমি অযোধ্যা-শিকারে গিয়েছ। সেখানে গিয়ে নিজেই শিকার হয়ে গেছ। তোমার শবদাহের নীল ধোঁয়া আকাশে উড়ছে। তবুও আমার বিশ্বাস তুমি

রয়েছ, আবার নিশ্চয় ফিরে আসবে, মিলন আমাদের হবেই।)

পূর্ণিমার থৈ-থৈ জ্যোৎস্নায় রাতভোর মাদল বাজিয়ে নাচ গানের পর সকালের দিকে শুরু হয় ঘরে ফেরার পালা।[৫]

কার্তিকী অমাবস্যার পরের দিন থেকে মানভূমে শুরু হয় সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ পরব বাঁদনা-পরব (বাঁদনা-বন্দনা, 'সহরায় পরব' নামেও পরিচিত)। গোরু-মোষের বন্দনা বা স্তুতিমূলক নানা লৌকিক প্রথা অনুষ্ঠিত হয় এই পরবে। কৃষি-সভ্যতার অঙ্গ গোরু-মোষ পরিবারের অঙ্গীভূত—এই বিশ্বাসে প্রাণিত হয়ে এই পরবে সাঁওতালেরা গোরু-মোষের সেবা করে পাঁচদিন। তখন পাঁচদিন পাঁচ রাত (মঁড়েসিঞ মঁড়ে ঞিদা) আনন্দ করে। এ পরবে সাঁওতালেরা ভগ্নী ও কন্যাদের আমন্ত্রণ জানায়, বন্ধুদেরও ডাকে। সবচেয়ে বড় কাজ হল গোরু-মোষের শিঙে তেল দেওয়া, তাদের যত্ন করা। পাঁচদিনই প্রতি সন্ধ্যায় গোরু-মোষের শিঙে কুচ্‌রী বা কচড়ার তেল দেয়। পাঁচটি দিনের পাঁচটি নাম—উম, বংগাবুরু, ঘুন্টাউ, ঘুন্টিতোং, জালে।

"কালী পূজা, গোয়ালা পূজা, গো-পূজার দিনগুলিকে একই সঙ্গে মানভূমের মানুষ আদিকাল থেকে বাঁদনা-পরব বলে জেনে আসছে। এই সনাতন হিন্দুধর্মের দেশে সর্বত্র এই পূজা অনুষ্ঠিত হলেও মানভূমের মতো এত রূপ রঙ নিয়ে বাঁদনা-পরব অন্য কোথাও অল্পই উদ্‌যাপিত হতে দেখা যায়।"[৬ক]

বিজয়াদশমীর সন্ধ্যা থেকেই বাঁদনা-পরবের আগমনী অহিরা গান মানভূমের মাঠে ঘাটে গোচারণে ধ্বনিত হতে থাকে। মাদল ঢোল ধামসা করতালের ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস। পরবর্তী অমাবস্যার দিন পর্যন্ত বাঁদনা-পরবের প্রস্তুতি। ঘরবাড়ি পরিষ্কার, গোয়াল ঘর পরিষ্কার, জামাকাপড় পরিষ্কার চলতে থাকে। গুঁড়িগোলা জলে হাত ডুবিয়ে মেয়েরা দেওয়ালে হাত-ছাপ দেয়।

অমাবস্যার দিন সন্ধ্যায় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা পাটকাঠির মশাল জেলে গ্রামের প্রান্তে 'ইঁজই-পিঁজই' খেলতে ছুটে যায়। মশাল নিয়ে নাচে, আর 'ইঁজই রে, পিঁজই রে, ব্যানাবুড়ির বান কাটইরে' বলে চিৎকার করে। বাড়ির মেয়েরা পিঠা বানায়। গোরু-মোষের শিঙে তেল দেয়। গোয়ালের কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন এঁকে ঘি ভর্তি প্রদীপ দিয়ে "জাগর" জ্বালানো হয়। তা সারারাত জ্বলে। ঢোল ধামসা মাদল করতাল বাজিয়ে গাই জাগাতে "ঝাঁগড়ের দল" বার হয়। এই দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে "অহিরা গান" গেয়ে "গাই জাগায়" কোনো বাড়িতে ঢোকার সময় ঝাঁগড় দল গাইতে থাকে—

অাঁধারি রাতি থানাঞ না পাছি
হাঁসুতাঞ হাসুতাঞ কনু দিগে বাছি
ছাড় ছাড় বামুনারী, আমারি আঙ্গনীয়া।

মাদলে বায়েন বোল তোলে—'তিং দাং দাং তিং দাং / তাখিটি তাং তাং তাখিটি তাং'। গায়েন গালে হাত দিয়ে গান ধরে—

অহি রে—জাগ হো লক্ষ্মী জাগ হো ভগবতী
জাগে-ত অমবস্যার রাত রে বাবু হো
জাগে-ত পতিফল, দেবে গো মা লছুমন
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই-য়-রে।

অহিরে—আমরা ত যাতে ছিলি
　　কুঁলি ন কুঁলি রে বাবু হো
　　তরি গেয়াই আনল ঘুরাঞ।
　　তরি যে গেয়াভালা বড় পুণ্যবান রে—
　　পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই-য়-রে।
অহিরে—ঈশ্বর মহাদেবে বলে পাঠাল রে
　　ঘারে অহিরা গেয়া জাগাতে রে বাবু হোঃ
　　গেইয়া যদি না জাগাবি/মহা পাপে পড়াবি/
　　মহাদেবে জুড়ায় বাথান রে। ৬ক

সাঁওতালেরা বাঁদনা-পরবের প্রথম দিন (উম) সকালে ঘরদোর সাফ করে, জামা-কাপড় ধুয়ে নেয়। নিজেরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়। একে বলে 'উম নাকড়া'। গ্রামের বাগালেরা (রাখাল) ঐ দিন এক জায়গায় গোরুগুলিকে নিয়ে যায়। লায়ার পুজো পাঠ শেষ হলে গোরুগুলোকে তার উপর দিয়ে চালিয়ে পার করে। মাদল নাগড়া ধামসা বেজে ওঠে। বাজনার সঙ্গে লায়াকে সকলে ঘরে পেঁছে দেয়। উপলব্ধি করে সহরায় যেন ঘরে এসে পেঁছিল। আনন্দে মেয়েরা গেয়ে ওঠে—

　　তিহিঞ দনা দাই না নায়কে দনা দাই
　　হাতী লেদোন সহরায় দাইনায় ইউরির আদের ফেৎ।
　　এতম তিরে লটা দাং ফঁয়ে তিরে হাটা তায়
　　হাতী লেকান সহরায় দাইনায় ইউরির আদের ফেৎ॥

(লায়া ডান হাতে জলের ঘটি আর বাঁ হাতে নতুন কুলা নিয়ে হাতীর মত বাঁদনাকে সাদর আহ্বান জানাল।)

পাঁচ দিন রাত উৎসবের শেষে সবাই চোখের জল ফেলে, বিশেষ করে ভগিনীরা। সময় হল তাদের শ্বশুর বাড়ি ফিরে যাওয়ার। আবার শুরু হয় একঘেয়ে জীবন, প্রত্যাশা থাকে মনে বৎসর শেষে ফিরে আসবে বাঁদনা-পরব, মনে লালন করে আর একটি সোনালী হেমন্ত।"

আঘন-সাঁকরাত (অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি) থেকে পোষ-সাঁকরাত (মকর-সংক্রান্তি) পর্যন্ত টুসু-পরব। এই লোক-উৎসবটি মানভূমে জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে। 'আসছে মকর দুদিন সবুর কর'—ডাঙা ডহর জোড় চাটান বসতি জনপদ এই উৎসবের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। নাচে গানে সচকিত হয়ে ওঠে সব জোড়, সব নদী—কাঁসাই, কুমারী, সুবর্ণরেখা, দামোদর। মানভূম হয়ে ওঠে গানভূমি। টুসু ফসল তোলার উৎসব। শস্য সংগ্রহের বার্তা নিয়ে সে নিয়ে আসে পাকা ধানের গন্ধে। কেউ বলেন টুসু 'পোষ-লক্ষ্মী।' 'তুষ-তোষলা ব্রত' নামেও সে অন্যত্র অভিহিত। পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির দিন নতুন ধানের তুষ, গোবর, সরষে ফুল ইত্যাদি নানা উপকরণ একটি মাটির সরায় রেখে কুমারী মেয়েরা টুসু-ব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং মকর সংক্রান্তির ব্রাহ্ম মুহূর্তে নিকটবর্তী জলাশয়ে বা নদীতে বিসর্জন দেন। [কেবল মানভূমে নয়, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানেও টুসু গান গাওয়া হয় অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি থেকে পোষ-সংক্রান্ত পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায়।]

টুসু-পরব মানভূমবাসীর একান্ত নিজস্ব উৎসব। গানের বিষয়বস্তু মুখ্যত কুমারী-মনের আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া প্রেম প্রীতি হাসি-ঠাট্টা এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে টুসু গান হয়ে ওঠে নানা সামাজিক ভাবনার বাহন। "একদা যা

ছিল কিশোরী কুমারী মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া মাত্র, নানা পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে এই ছড়া হয়েছে গান এবং সেই গানের বিষয়-বস্তুতে আজ আর প্রার্থনার লেশমাত্র নাই। …টুসুকে এখন আর কামনা পূরণের দেবীরূপে দেখা যায় না, পরিবর্তে টুসু এখন মাতা, কন্যা, ভগ্নী, সহচরী বান্ধবীরূপা সমাজেরই একজন অন্তরঙ্গ নারীমাত্র।"[৭]

টুসু এখন সমাজের সকল স্তরের মানব মানবীর সব রকম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশবাহন। টুসু আর দেবী নয়, মর্তের মানবী হয়ে উঠেছে।

তরা (তোরা) যতই সাজা
তদের (তোদের) টুসুর চইখ (চোখ) গলা পিঁয়াজ ভাজা।

টুসুকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত ভালবাসা—

তখে (তোকে) নিয়ে যাব চাঁইবাসা
অ ভালবাসা —আরে অ ভালবাসা।

কালো জলে টুসুরাণীকে না ভাসিয়ে কুমারীর মনে পড়ে তার কালাকে—প্রেম চরিতার্থতা লাভ করতে চায় মিলনে—

কাল দেখ্যে নাম হলাম জল
জল হল মর (মোর) এক গলা।
অ প্রাণনাথ ছাইকে তুল
রঙ দেখবার লয় বেলা ॥
সে কি অমনি যাব
অই ছুঁড়িদের হাড় কুটে দালান দিব ॥ ধুয়া ॥

টুসুকে উপলক্ষ করেই প্রেমিকার অভিমান প্রকাশ পায়, ভালবাসার তিরস্কার ব্যক্ত হয়। প্রেমিক যখন ঠেঁটি (মোটাকাপড়) দিয়ে প্রেমিকাকে ভুলাতে চায় তখন প্রেমিকা টুসুগানে ভালবাসার তিরস্কার জানায়—

সাড়ী দিবার কথা ছিল
ঠেঁাঠ দিয়ে ভুলাইল
লাজে না অ্যাল
ছুঁড়া বেড় কাট্যে চলে গেল।

পেঁচা-নোলক দেবার প্রতিশ্রুতি প্রেমিক না রাখায় তাকে তিরস্কার—

কই দিলিরে পলাপেঁচা কই দিলিরে আগবালা
নুলুক দিবার কথা ছিল কই দিলিরে খালভরা।

টুসুকে দেবী বলে দূরে না রেখে মানবী বলে তার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক পাতায় পূজারীর দল। টুসুমণি, টুসুরাণী বলে তাকে ডাকে। টুসুকে নিয়ে খেতে যায় নানা জায়গায়।

চল টুসু চল খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বড়তলা
ফিরবার বেলা দেখায় আনব কয়লাখাদের জল তুলা ॥
গেঁতা মাছের কাঁটা।
ঐ ছুঁড়িরা খাবি লো ভাইয়ের মাথা ॥ ধুয়া ॥
আবার টুসু যাবেন দক্ষিণ পাটনে।
আমার টুসু দক্ষিণ যাবুহেন

সঙ্গে চাকর ছ'জনা।
ফিরবার বেলা দেখায় আনব
কালি মাটির কারখানা॥
ঝ'রার (ঝরিয়ার) বিজলি বাতি
বিনা তেলে জ্বলছ্যে ল সারারাতি॥ ধুয়া॥

টুসু পুরুলিয়া শহরেও আসে। দেখে যায় আজব দৃশ্য—

পুরুল্যাতে দেইখে' আইলাম
মায়্যাতে দকান মেলে।
এমনি মায়্যার দকান মেলা
মরদকে ফাঁদে ফেলে॥
বাজার যাত্যে যাত্যে
ময়রায় বলে লে গ' জিলিপি জল খাত্যে॥ ধুয়া॥

কেবল রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া-পুরুলিয়া নয়, টুসুমণিকে কলকাতা দেখানোরও প্রলোভন দেখানো হয়—

তলে পাটা উপরে পাটা
তায় বসেছ্যে দারোগা।
রাস্তা ছাড় – রাস্তা ছাড়
টুসু যাবেন কহলকাতা।
সারী সাবাশ করি
তর বুকেতে কুটব ল চিড়ার ঢেঁকি॥ ধুয়া॥

টুসুকে ঘিরে সীমান্ত বাংলার মানুষের সব বাসনা কামনা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। টুসুর ইচ্ছাপূরণের অছিলায় নিজ নিজ ইচ্ছাপূরণ কামনা ব্যক্ত হয়।

(ক) আঁধার ঘরের কালো সাড়ী জোসনা রাতে পরহ না
হামদের টুসু বাজার বুলে চোর বইলে কেউ মাইর না॥
ছি ছি লাজে মরি
কাল গায়ে পাছ্যা পাইড়া নীল শাড়ি॥ ধুয়া॥

(খ) হামার টুসু খেলা করে খোল কদমের তলে
ডাকলে টুসু ঘর আসে না কাজ করিবার ভয়ে॥

(গ) বাড়ির নামহয় তামাল বন
কোকিল ডাকে ঘনে ঘন।
আর ডাইক না ওরে কোকিল
টুসু ঘুমে অচেতন॥
জড়া পানের খিলি
এতখন তুই কার মুখে ভরা ছিলি॥ ধুয়া॥

প্রথমটিতে গায়িকার অভিসার-অভিলাষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানে সন্তান-বাৎসল্য।

"টুসু পরবকে কেন্দ্র করে সই পাতানোর প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। মকর পরবের উৎসব, মানভূঁইয়া কৃষ্টির প্রসারের উৎসব, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, মিত্রতার বন্ধন, দৃঢ়তর করারও উৎসব।"[৮]

কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর, দামোদর নদ-নদী বা জলাশয়ে টুসুর সরা বিসর্জন দিয়ে 'ফুলপাতা' 'সই পাতা' অনুষ্ঠান হয়।

অ॥ ফুলের সংগে ফুল পাতাব
ফুলকে হামি কি দিব
পয়সা পাব বাজার যাব
ফুলকে ফুলাল তেল দিব॥
বুড়ার ঠকরা (ঠোকর) গালে।
জড়া (জোড়া) ঢেঁকি পড়ছে গো তালে তালে॥ ধুয়া॥

আ॥ ওমা আমি ফুল পাতাব পাহাড় ধারের সরলাকে
হেল্যো দুল্যো আসছে সরলা টুসুর মাথায় ফুল দিতে॥
আমরা জাড়ে মরি
একটা ভুরসী দুলোকে টানাটানি॥ ধুয়া॥

কুমারী মেয়ের প্রেমবাসনা টুসুগানে ব্যক্ত হয়। গানের মধ্য দিয়ে প্রেমিকা তার প্রেমিকের উপর টুসুমণিকে আরোপিত করে।

হামার টুসু ডাঁড়ায় আছে
আমের গাছের ডাল ধইরে।
খরার বেলা আম পাড়ে না
চাঁদ বদনে ঘাম ঝরে॥[৮]

ফলকথা, সমগ্র সমাজের ছবি ফুটে ওঠে টুসুর গানে। টুসুগানে ধরা পড়ে সমাজ-পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দুঃখবেদনা, আশা-অভীপ্সা। টুসুগানের বিষয়বস্তু বহুব্যাপ্ত, বহুবিচিত্র। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, পুরাণের কাহিনী, রাজনীতি, আর্থিক দুরবস্থা, সমাজের পীড়ন, ধনীর শোষণ, নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা, মানবিক অনুভূতির নানা প্রকাশ—সবকিছুই টুসুগানে ব্যক্ত। টুসুপূজা আদিতে ছিল ফসল তোলার উৎসব, আনন্দের উৎসব, কুমারী মনের প্রার্থনা পূরণের উৎসব। উত্তরকালে তা হয়ে ওঠে সমাজের সব স্তরের সকল বয়সের মানুষের অভিলাষের প্রকাশবাহন।

মানভূমের লোকসংগীতের প্রধান ধারা ঝুমুর-গান। এই গানের সংগে জড়িত নাচনী-নাচ। ঝুমুরের উদ্ভব কীর্তন গানের পূর্বে। কীর্তন যেমন ভক্তিধর্মসাধনার অঙ্গ, ঝুমুর গান কখনও তা ছিল না, এখনো নয়। ঝুমুর-গানের দুটি শাখা—উচ্চাঙ্গ (ক্লাসিকাল) ও লৌকিক (ফোক)। এদুটি মানভূমে পরস্পরের পরিপূরক রূপে গড়ে উঠেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৯] ঝুমুর গান বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে বাঘমুণ্ডি ও পাতকুম পরগণায়।

মানভূমের ঝুমুর গানের প্রধান শিল্পী হলেন ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, শিরোমণি হাজরা, জগৎ কবিরাজ, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বিনন্দ সিং। এঁরা কৃষ্ণলীলাত্মক ঝুমুর গান গাইতেন। (এছাড়া পদাবলী আকারের উপাঙ্গ বৈঠক ঝুমুরের চর্চা মানভূমে গত দুশ বছর হয়েছে।) মানভূমের ঝুমুর গান মানুষের গান, সেক্যুলর। "এই শিলা অরণ্যময় প্রাচীন ভূভাগে—মানভূমে—মানবচৈতন্য তখনও সম্পূর্ণ বিদেহ বিমূর্ত হতে পারেনি। প্রকৃতি এখানে বড়ই প্রবলা। ঝুমুরের আদিমতা, তার মাদকতা কাটবার নয়। 'বরং মদের নেশা যায়, তবু ঝুমুরের নেশা যায় না'—এখানের প্রসিদ্ধি।"[৯]

মানভূমের প্রধান ঝুমুর-রচয়িতা গায়কদের সামান্য পরিচয় ও গানের নমুনা এখানে দেওয়া গেল।[৭]

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা (১৭৮০-১৮৬৫। জন্ম দেওঘর কুণ্ডায়। বহুবার মানভূমে এসেছেন। কাশীপুর পঞ্চকোটে এসেছেন। রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিং দেও-র আনুকূল্য পেয়েছেন। লিখেছেন বাংলা, হিন্দী, ব্রজবুলিতে। বেশির ভাগই ঝুমুর)। ভবপ্রীতানন্দের ঝুমুর-গানের নমুনা ঃ

১। দিবা অবসানে নিকুঞ্জ কাননে
　　কে বাজায় মোহন বাঁশি রে⋯⋯

২। বরষা আগত ভেল মেঘেতে বিজুরি খেল
　　মাতি গেল যত শিখিকুল গো
　　　হরিশূন্য হইল গোকুল।

৩। শক্তিশেলে যবে পড়িল লক্ষণ
　　বললেন শ্রীরাম রাজীবলোচন,
　　　ভাসেন নয়ন-নীরে রে।⋯⋯

৪। বৃন্দে বলে কাল-শশী　তুমি হবে কাশীবাসী
　　শুনে হাসি লাগে বদনে॥

বিনন্দ সিং (১৭৭০ জন্ম। মানভূম-সংলগ্ন রাঁচী জেলার সিল্লী-পারমার জমিদার বংশের এক কুঁয়োর অর্থাৎ রাজকুমার)। ভাদুরিয়া ঝুমুর বেশি লিখেছেন। তা ছাড়া লেখেন বৈঠকী ঝুমুর ও পালা ঝুমুর। বাংলা, হিন্দী, সাঁওতাল, ভোজপুরী, মৈথিলী-মিশ্রিত 'পাঁচপরগণিয়া বোলি'তেও লিখেছেন। বিনন্দ সিং-এর উক্তি—

　　বিনন্দ সিং কয়　　যে জন রসিক হয়
　　　অবশেষে দরশন পায়।

বিনন্দ সিং বৈষ্ণব ছিলেন। সেকালের ঝুমুর রচনায় সিদ্ধ হস্ত। সিল্লীর রাজা উপেন্দ্রনাথ সিংদেওর আনুকূল্য পেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী (বীরডিতে বাড়ি। বাগমুণ্ডি ও পাতকুম এলাকায় ঝুমুরিয়াদের মধ্যমণি। মূলত ধ্রুপদাঙ্গ গানের চর্চা করতেন। তাঁর প্রভাবে ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট স্টাইল গড়ে ওঠে—যার বৈশিষ্ট্য ছিল মার্জিত ভাষা, দীর্ঘচরণ, অন্তরঙ্গ ভাব। রসজ্ঞের বিচারে—'যেমনি জ্যেঠ মাসে আম মিষ্ট/তেমনি ভাবে রামকিষ্ট'।)

রামকৃষ্ণের ঝুমুরের নমুনা ঃ

১। কাঁচ মরকত নবীন নীরদ সুকোমল তনু শ্যামল।
　ভুরু দুটি আঁকা ঈষৎ বাঁকা বাঁকা আঁখি দুটি ঢল ঢল॥
　　দেখে যা সখি ভরিয়ে আঁখি
　　ওগো রূপে বন করে আছে আলো॥

২। মাধবী কুঞ্জের কূলে আর নব পল্লব আড়ালে
　উদাস নয়ন দুটি আরোপি চাঁদের পানে
　　কেন পাখী ডাকো রে পঞ্চম তানে
　　অতীতের সুখস্মৃতি জাগিছে মনে নিরজনে।

৩। পরের পরাণ বঁধু কেন কি কারণে হেথা আগমণ
বুঝেছি সকল কেন কর ছল খাটিবে না আর মিছা খাটো।
যাও যাও আর দিও না পোড়া গায়ে লবণের ছিটা ॥

স্বীকার্য, মানভূম লোকসংগীতের বিচারে গানভূম।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১. অশোক চৌধুরী, 'মানভুম থেকে পুরুলিয়া' ["পুরুলিয়া মেলা ১৯৭০" স্মারকগ্রন্থ]

২. মানভূম জেলার আয়তন (৪৯১৪ বর্গ মাইল) লোকসংখ্যা ঃ

১৮৮১—১, ০৫৮, ২২৮। ১৮৯১—১, ১৯৩, ৩২৮

মানভূম জেলার আয়তন (৪১৪৭ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ঃ

১৯০১—৭৭৭, ৮০১ ১৯৩১—৯৭২, ০৭৭

১৯১১—৮৮৪, ৩৭২ ১৯৪১—১, ০৮৮, ২০১

১৯২১—৮৩১, ৪৯৭ ১৯৫১—১, ১৬৯, ০৯৭

পুরুলিয়া জেলার আয়তন (৪৫০০ বর্গ মাইল) লোকসংখ্যা ঃ ১৯৬১—১, ৩৫০, ০৬১

৩. পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক রূপরেখা—বিনয় ঘোষ ["পুরুলিয়া মেলা ১৯৭০" স্মারকগ্রন্থ]

৪. পুরুলিয়ার করম পরব - বিশাখা মাঝি, ছত্রাক, শারদীয়া ১৩৮৪।

৫ অযোধ্যা পাহাড়ে সাঁওতালদের শিকার মেলা—সিরাজুল হক, তদেব।

৬. সাঁওতালদের বাঁদনা-পরব—বিশাখা মাঝি, ছত্রাক, শারদীয়া ১৩৮৫।

৬ক. মানভূমের বাঁদনা-পরব—সৃষ্টিধর মাহাত। ছত্রাক, টুসু সংখ্যা ১৩৮৭।

৭. ডঃ সুধীর করণ।

৮. মানভূমের টুসুগানে সমাজ ও সংস্কৃতি—পিনাকীরঞ্জন রক্ষিত। ছত্রাক, টুসু নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২-৮৩।

৯. মানভূমি ঝুমুর,—সুবোধ বসুরায়, ছত্রাক, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯১১)- এইচ. কুপলাণ্ড

২. স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্ট অভ বেঙ্গল (সপ্তদশ খণ্ড)—হাণ্টার

৩. ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অভ বেঙ্গল—ই. টি ডালটন

৪. মানভূমের সেটলমেন্ট রিপোর্ট (১৯২১)—বি. কে. গোখেল

৫.+৬. মানভূমের নৃতাত্ত্বিক আলোচনা (ইংরেজি)—রিজলি ও ডাল্টন

৭ বাংলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত (ইংরেজি)- জে. ডি. বেগলার (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া)

৮. মানভূমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সরোজরঞ্জন চৌধুরী

৯. কালচারাল প্রোফাইল অভ পুরুলিয়া—বিনয় ঘোষ

১০. তুষুব্রত ও গীতি সমীক্ষা—ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

১১. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য—ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত

১২. সীমান্ত বাংলার লোকযান—ডঃ সুধীর করণ

১৩. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সুদৃশ্য বাঁধাই

১ম খণ্ড : টা. ২০·০০

২য় খণ্ড : টা. ৩৩·০০

স্বল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট আছে

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ১১·৩৩

২য় খণ্ড : টা. ৯·০০

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

স্বপ্ন

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : চার টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক—পৌষ
১৩৮৮

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক—পৌষ
১৩৮৮

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

মধ্যযুগের আলো-ছায়ায় দেবমানব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাপ্রভুকে প্রণাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আহবানে বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দনাথ স্মারক বক্তৃতা মালার প্রবর্তকদিগের দাক্ষিণ্যে দুটি প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর অপার অমেয় মহিমার অতি স্বল্পাংশ তুলে ধরবার জন্য আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর সারস্বত প্রয়াস। "চৈতন্যলীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান। তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তিহোঁ কৈল পান॥" এ-কথা বলেছিলেন চৈতন্যচরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে। আমরাও এই অনুপম বাগ্‌ভঙ্গির অনুসরণে স্মরণ ও বন্দন করি আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ গৌর-প্রবক্তা বহুশাস্ত্রপারঙ্গম ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দনাথ মহোদয়কে, যিনি সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সারস্বত অধ্যবসায়ে তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞাপ্রেমের পরিচয় রেখে গিয়েছেন মহাপ্রভু-সম্পর্কিত নানা মৌলিক গ্রন্থে এবং তাঁর সম্পাদিত বিশদ টীকা-সম্বলিত বৈষ্ণব চরিতগ্রন্থে। শাস্ত্রজ্ঞানহীন এবং ভক্তির রাজ্যে দীনাতিদীন হয়েও আমাদের এই অসম সাহস শুধু বিষয়ের আকর্ষণে ও কৃপার প্রত্যাশায়। "অনুমানে প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে। কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥" "জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্না। ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥"

আমাদের সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আমাদের তিনি সব-চেয়ে আপনার জন, সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এমন করে এতখানি ভালবেসে ভালবাসার বার্তাকে পরম বার্তা বলে মানুষের হৃদয়ের দুয়ারে কে আর পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছেন? "তারা বলে গেলো 'ভালবাসো,' অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মুখ্য লক্ষ্য যাঁর জীবন ও বাণী তিনি আমাদের সুস্বত্তম দেবমানব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 'প্রেমা পুমর্থো মহান্' প্রেমই পরম পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ নয়। সর্বাভিনন্দনীয় এই নবীন জীবনদর্শনটি কার? 'চৈতন্য-মত-মঞ্জুষা'-কার উত্তর দিয়েছেন। "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মত-মিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত এটি, তাই আমাদের কাছে মতটির এত সমাদর।

আমাদের কালের 'কবিমনীষী' বিশ্বসভায় 'মানুষের ধর্ম' শুনিয়েছেন। আর এক যোগী মনীষী দিব্য জীবনের বার্তা রেখে গিয়েছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, এই দুটি বার্তাই অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মহাপ্রভু বহন করে এনেছিলেন। Religion of Man এবং Life Divine একই গ্রন্থের একটি পত্রের দুই পৃষ্ঠা। মহাপ্রভুর লোকব্যবহারে ও জীবনাচরণে মানুষের ধর্ম, গম্ভীরায় গুহাগৃহবাসকালীন দিব্যোন্মাদে দিব্যজীবন বিধৃত। উনিশ শতকে সংঘটিত রিনেশাঁ বা জীবনজাগৃতির চেয়ে মহাপ্রভুর আনীত নামপ্রেমবাহিত উন্নততর মূল্যবোধ-সম্পন্ন জীবনজাগৃতি ব্যাপকতর ও গভীরতর ভাবে সমাজের সর্বস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। প্রকটকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভক্তের অন্তরে তিনি অবতারী নরলীল স্বয়ং-ভগবান্। গৌরাঙ্গদেবের ভক্তস্বভাব নিয়ে তাঁর কালের লোকের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের কোনও বিচ্ছেদ ঘটেনি। গৌরাঙ্গতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের মন উন্মুক্ত। তাঁর প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি পোষণ করবার জন্য আমাদের আকুতি অকৃত্রিম, একথা স্বীকার না করলে জ্ঞানখলতার পরিচয় দেওয়া হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালা ও প্রকাশিত গ্রন্থের নামে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি পরিভাষাটি গ্রহণ করেছিলাম ('শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি') পরিভাষাটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্র-সংস্কৃতি কথাটি পরিভাষা রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সমাজের উচ্চস্তরের উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু ভূমানুভূতির কবির গভীর মনন ততখানি আমাদের বাস্তব জীবনে তেমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয় নি। জীবনায়নে আমরা "অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়।" প্রভাবের দিক্ দিয়ে চৈতন্য-সংস্কৃতি উপরিচর নয়, সর্বস্তরের তলাবগাহী গোপনচারী। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি কাব্যে নাটকে-গানে-নৃত্যে অভিনয়ে তত্ত্বভাবনায় রূপপরিগ্রহ করেছে। চৈতন্য-সংস্কৃতিও বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতাখ্যানে, কীর্তন-সঙ্গীতে ও নৃত্যে, মৃদঙ্গবাদনে, ভাবাবেশময় অভিনয়ে, গভীর ভক্তিদর্শনের আলোচনায় বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বৈষ্ণব সাধনাকে আমরা হরি চরণোদ্ভবা ত্রিপথগা ভাগীরথী বলে থাকি। এর তিনটি ধারা, সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক ও আধ্যাত্মিক। পদলালিত্য ছন্দোগৌরব ও ভাবমাধুর্যে এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। নানা সুর তান লয় আখর তুক, বিচিত্র নৃত্যভঙ্গী, মৃদঙ্গবাদন, নৃত্যগীত বাদিত্রাত্মক তৌর্যত্রিক বিদ্যায় এর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। রাগানুগা ভক্তির ভজনাঙ্গীয় সাধনা এর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে জীবনচর্যায় বাস্তবায়িত করেছিল। আমাদের শাস্ত্রে তিনটি প্রস্থান ছিল, শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষদ্, স্মৃতিপ্রস্থান বা গীতা এবং ন্যায়প্রস্থান বা বেদান্ত। এই প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব চতুর্থ রসপ্রস্থান জুড়ে দিয়ে প্রস্থানচতুষ্টয় স্থাপন করলেন বৈষ্ণবাচার্যেরা। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, বিশেষ করে শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীব এবং চৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামী এই রসপ্রস্থানের মুখ্য নির্মাতা। বৈষ্ণব রসদর্শন প্রাচীন রসশাস্ত্রের সঙ্গে ভজনাত্মক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব মিলিয়ে মানুষের অন্তর্লোক দিব্যায়িত করে তুলল। এই বিশাল গোস্বামিশাস্ত্রের উৎস হল শ্রীচৈতন্যের দিব্যচেতনাময় উন্মুক্ত জীবনের সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা ও উপদেশাবলী।

মহাপ্রভুর দানসম্পর্কে সাধারণ মানুষেরও একটি অন্তরঙ্গ ধারণা আছে। "নাম এনেছে নাম এনেছে নাম এনেছে রে। প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে রে।" গুরুদত্ত দীক্ষাকালীন নামে তাঁর জীবন ও তত্ত্ব একসঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁর সমগ্র চৈতন্যের বিষয় (God-Consciousness) এবং যিনি শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ। তাই বন্দনায় "কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।" চেতনায় এবং অবচেতনায় সকলের অন্তরে তাঁর সম্বন্ধে একটি অনুভব কাজ করে এসেছে। তিনি মানুষের জন্য এক নূতনতর এবং লোভনীয় মূল্যবোধের প্রবর্তন করেন, যাকে Spiritual Romanticism বলা যায়। মার্ক্সীয় দর্শন বিত্তোৎপাদন ও ধনবন্টন সুশৃঙ্খল করে সমাজসভ্যতাকে নতুন করে গড়তে বলেছে। কিন্তু ব্যষ্টিমানুষের অন্তর্লোক সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় এই পথে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে মানুষের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস সার্থক হতে পারেনি। সমস্যার জটিলতা ও শ্রেণীবিদ্বেষ বেড়েই চলেছে। ধনের মানুষ (The Economic Man), কামনার মানুষ (The Sensuous Man) এবং বলের মানুষ (The Man of might) সমগ্র মানুষ বা আসল মানুষ নয়। মানুষের সত্যতর ও পূর্ণতর পরিচয় আত্মিক মানুষে (The Man of Spirit), প্রেম ও আনন্দের মানুষে (The Man of Love and Bliss); তাই বৈষ্ণব দর্শনে অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, এমন কি মোক্ষশাস্ত্রকেও 'এহো বাহ্য' বলা হয়েছে। প্রেমই পরম পুরুষার্থ।

এই সহজ অথচ গভীর অনুভব শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমাজের উচ্চনীচ, পণ্ডিতমূর্খ ধনি-দরিদ্র, কিঞ্চন-অকিঞ্চন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, শাসক-শাসিত, পাপি-পুণ্যাত্মা, বেদান্তি, নৈয়ায়িক-স্মার্ত-মীমাংসক, তান্ত্রিক-যোগাচারী সকলকে মিলিয়েছিল। এই অনুভব নিয়ে গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-আসাম, মিথিলা-মথুরা-বৃন্দাবন, দ্রাবিড়-দ্বারাবতী-রাজস্থান-গুজরাত অর্থাৎ ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে একটি সাংস্কৃতিক ভাব-পরিমণ্ডল বা সত্যকার বৃহত্তর বঙ্গ গড়ে উঠেছিল। ভাষা, আচার-ব্যবহার ও শাসন ব্যবস্থার বৈষম্য এই নামপ্রেম-বাহিত সমচিত্ততার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ব্রজবুলি ভাষার উৎস ও উদ্ভব যাই হোক না কেন প্রাদেশিক ভাষা সমূহের সমসূত্রে যুগপৎ ব্রজবুলির প্রসার ও সৌষ্ঠবময় প্রকাশ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই ঘটেছিল। চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা এবং ব্রজবুলির মুখ্য লেখক গোবিন্দদাস যথার্থ ঐতিহাসিক বিবেকের পরিচয় দিয়ে একটি গৌরচন্দ্রিকা-পদে বলেছেন—

"বরণ-আশ্রম　　কিঞ্চন-অকিঞ্চন
　　কারো কোনো দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি　　দুলহ প্রেমধন
　　দান কয়ল জগজনে॥"

সামরিক-প্রতিভাধর উৎকল-নরপতি প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে নবদ্বীপের ছিন্নবসনধারী নামগানরত সাধুপ্রকৃতিক খোলাবেচা শ্রীধর এবং নিঃস্ব ভিক্ষাজীবী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবেতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়ে'র সঙ্গে তাঁর শোণিতমোক্ষণকারী প্রহারক জগাই-মাধাই স্থান পেয়েছে। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক-বেদান্তী বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে শ্রমজীবী কাঠকাটা জগন্নাথ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। চৈতন্য-ভাগবতে উদ্ধৃত উদ্ভট শ্লোক, "মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।" এই পরম আশ্বাসজনক মূল্যবোধটি বোধ হয় শ্রীচৈতন্যের দান।

প্রকটকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভক্তের অন্তরে তিনি নরলীল ভগবান। চিরকালের মানুষের ব্যথার ভার বুকে বয়ে প্রেমাশ্রুর সুরধনী বাহিয়ে দিয়ে প্রেমের ঠাকুর ধরার ধূলিতে নেমে এসেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে তিনি অদ্বয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ, 'রসরাজমহাভাব দুই এক রূপ।'

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

স্বরূপ দামোদরের কড়চায় 'রসরাজ-মহাভাব দুই এক রূপ,' এই রহস্য-গভীর ও রহস্য-মধুর অনুভূতির প্রথম প্রকাশ

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যংপ্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতম্ নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্॥"

মহাপ্রভুর গম্ভীরাবাসকালীন এই অন্তরঙ্গতম পরিচয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন নয়রহস্য-মধুর তিনটি বাঞ্ছায় উল্লেখ করেছে,

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রণয় কত গভীর এবং তিনি কি-ভাবে এই প্রেম আস্বাদন করেন. শ্রীরাধার আস্বাদ্যমান হয়ে কৃষ্ণের মাধুর্য কত বেড়ে যায় এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণানুভব-জনিত সুখ কত নিবিড় এই তিনটি আস্বাদন-বাঞ্ছা-পূরণের জন্য শচীগর্ভরূপ সিন্ধু থেকে গৌররূপ চন্দ্র আবির্ভূত হলেন। প্রেমানুভবের এই সূক্ষ্মতা নিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"স্বমাধুর্য রাধাপ্রেম দোহে হোঁড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥

দাক্ষিণাত্যের বিদগ্ধ ভক্ত-রাজপুরুষ রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ অনুপ্রাণনায় সাধ্যসাধন তত্ত্ব-সম্পর্কে ভাববিনিময় করে পুলকিত বিস্ময়ে অধ্যাত্মভাবনার এই হেঁয়ালিটি প্রকাশ করেন।

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা॥

বৃন্দাবন ও নবদ্বীপলীলার এই পারম্পর্য ও পরস্পর পরিপূরকতা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় পল্লবিত করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের নান্দী-শ্লোকে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পদকর্তা গোবিন্দদাস ব্রজবুলির সুমধুর ঝংকার তুলে গৌরচন্দ্রিকায় বলেছেন

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর-শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিমন-মোহন ধাম॥
জয় নিজ-কান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী লোচনমঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূচিত-আমোদ॥

গৌরাঙ্গ-তত্ত্বসম্পর্কে গোস্বামি শাস্ত্র শ্রুতি ও পুরাণেতিহাস থেকে বহু প্রমাণবচন আহরণ করেছেন। তার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরব। মুণ্ডক শ্রুতির একটি বচন—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

দ্রষ্টা যখন দেখেন সুবর্ণবর্ণ কর্তাপুরুষ ঈশ্বরকে, যিনি ব্রহ্মেরও উৎস, তখন জ্ঞাতা দর্শনকারী সব পাপপুণ্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিরঞ্জন হয়ে পরম সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হন। মৈত্রায়নী-উপনিষদ্ দু-একটি শব্দের রদবদল করে একই কথা বলেন—

"যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায় সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যোতি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ শ্লোক—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

শ্লোকটি নব যোগীন্দ্র-সংবাদ থেকে নেওয়া। যাঁরা মেধাবী তাঁরা সঙ্কীর্তন-মুখ্য উপচারে যজ্ঞ করেন। উপাস্যের এখানে তিনটি বিশেষণ। কৃষ্ণবর্ণ অর্থ 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ (কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী) সর্বদা বর্ণনা করেন। অন্তরে কৃষ্ণচৈতন্যময় এবং বাহিরে কৃষ্ণনামগুণলীলা গানে রত, 'ত্বিষা অকৃষ্ণম্' অর্থাৎ কান্তিতে অকৃষ্ণ বা গৌর। 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্' তাঁর অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং অস্ত্র অর্থাৎ অসুর মারণ বা আসুরভাব দূরীকরণের সহায় তাঁর পার্ষদবৃন্দ।

চতুর্যুগের পৌনঃপুনিক আবর্তনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাগবত আর একটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন—

"ইত্থং নৃ-তির্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈর্লোকানবিভাবয়সি
হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।"

ভিন্ন ভিন্ন যুগে তুমি নর, তির্যগ, ঋষি, দেবতা, মৎস্য প্রভৃতি রূপে অবতরণ করে লোকসমূহের রক্ষা কর এবং লোকস্থিতির প্রতিকূল অসুর সংহার কর। যুগধর্মও তুমি পালন কর। কিন্তু কলিকালে তুমি পীত বা গৌর বর্ণে আচ্ছাদিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলে। এই সঙ্গে নন্দ-মহারাজের প্রতি গর্গাচার্যের ১০ম স্কন্ধের ৮মাধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকটি বিবেচ্য;

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥"

এখানে অনুমান করা হয়, কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বে অপর কোনও চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব ঘটেছিল। মহাভারতের দানধর্মে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রের একটি শ্লোক এই—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশান্তঃ নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ ॥"

শ্রীচৈতন্য-সম্পর্কিত এই শ্লোকের মর্মানুবাদ কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

তপ্ত হেমকান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নব মেঘ জিনি কণ্ঠ যে গম্ভীর ॥

দেখ্যাবিন্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল চৈতন্যগুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন॥
শান্ত-দান্ত কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ চন্দনভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্তন॥"

কনক-গৌর দেবমানবের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি সংক্ষেপে সুধীসমাজে তুলে ধরব। 'চৈতন্য চন্দ্রামৃতে' প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রশ্ন তুলেছিলেন—

"প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরম-রস-চমৎকার-মাধুর্য-সীমা
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার॥"

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এর প্রতিধ্বনি তুলেছেন—

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥"

নিত্যতত্ত্ব শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ না দেখিয়ে, আমরা খ্রীষ্টীয় সংবতের সূচনায় গাথা-সপ্তশতী-কার হাল শ্রীরাধা ও ব্রজবৃত্তান্তের যেটুকু আভাস দিয়েছেন তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করব। সপ্তশতীর প্রথম শতকের একানব্বই-সংখ্যক শ্লোক—

"মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥

এর সংস্কৃত রূপান্তর—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজঃ রাধিকায়া অপনয়ন।
এতাসাং বল্লবীনামন্যানামপি গৌরবং হরসি॥

অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের ছন্দোবদ্ধ রসাল মর্মানুবাদ—

"রাধিকার চোখে পড়ে ধূলিকণা রসিক রসিকা জানে না সে খেল।
কানুর হৃদয়ে সাড়া জেগে ওঠে দূরে করে দিতে নয়ন শেল।
বল্লবীজন ঈর্ষাকাতর বিবর্ণ হয় তাদের মুখ।
রাধা হরে নেয় গরিমা তাদের জাগে অন্তরে জয়ের সুখ।"

প্রাকৃত 'গোরঅ' শব্দ সংস্কৃত 'গোরজঃ' এবং 'গৌরব' দুয়েরই রূপান্তর। এই অর্থদ্বৈত নিয়ে সপ্তশতীকার সুন্দর শ্লেষ রচনা করেছেন। গোষ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ধেনুবৎসের চরণোত্থিত ধূলিকণা শ্রীরাধার চক্ষুপীড়ার সঞ্চার করেছে। মুখমারুতের দ্বারা অর্থাৎ ফুৎকারে তার অপসারণের ছলে শ্রীকৃষ্ণ তার কপোলসান্নিধ্য সম্ভোগ করছেন। শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষের এই পরিকল্পনা, গোপীজনবল্লভের এই রাধাপক্ষপাত। বল্লবীজনের জয়-পরাজয়ের এই সুন্দর অভিমান সত্যই কি বৈষ্ণবীয় রাধাতত্ত্বের সূচনা করে না? গাথা সপ্তশতীকার রাধাতত্ত্ব-সংবলিত নিম্বার্ক দর্শনের পূর্ববর্তী। সপ্তশতীর আর একটি শ্লোকে পাওয়া যায়—

"অজ্জা বি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।
কহ্নমুহ-পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিতাং বহু-বহূহি॥"

এর সংস্কৃত রূপান্তর—

"অদ্যাপি বালো দামোদর ইতি জল্পিতে যশোদয়া
কৃষ্ণমুখপ্রেষিতাক্ষং নিভৃতং হসিতং ব্রজবধূভিঃ।"

পার্বতীবাবুর বাংলা পদ্যানুবাদ—

"আমার গোপাল　　আজিও বালক
তাকে নিয়ে মোর শতেক জ্বালা।
মার কথা শুনে　　কানুমুখ চেয়ে
গোপনে হাসিছে ব্রজের বালা॥"

কৃষ্ণ যশোদা ও ব্রজবধূর এই চিত্র বাৎসল্য ও মধুরের পাশাপাশি সমাবেশ। 'অখিলরসামৃত-মূর্তি'কে নিয়ে এই রসবৈচিত্র্য কি আমাদেরি কুটির-কাননে' ফোটা ফুল না বৃন্দাবনীয় ভাবকুসুম?

রীতিবাদী আলঙ্কারিক বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'-তে ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার' থেকে (অষ্টম শতকের বাঙালী নাট্যকার) একটি শ্লোকের উদ্ধার করেছেন।

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসম্
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্
তৎপাদপ্রতিমা-নিবেশিত-পদস্যোদ্ভূতরোমোদ-গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥"

কালিন্দী-পুলিনে কেলিকুপিত শ্রীরাধা বাষ্পাকুললোচনে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করে চলেছেন। তাঁর অনুগমন করছেন কংসনিসূদন শ্রীহরি। দয়িতার পদাঙ্ক দেখে রাসবিহারী শ্রীহরি তাতে পাদন্যাস করে অগ্রসর হচ্ছেন, আর তাঁর অঙ্গে রোমাঞ্চের সঞ্চার হচ্ছে। রাসকেলিকোপ অশ্রু রোমাঞ্চ সব মিলে কি এখানে একটি ভাগবতীয় আবহের সৃষ্টি হয়নি? শ্রীরাধার

ক্রমবিকাশের সুধী গবেষক যখন এতে প্রাকৃত প্রেমের আবিষ্কার করেন তখন তিনি হয়ত ভুলে যান, এটি নান্দী শ্লোক,

"দেবদ্বিজনৃপাদীনামাশীর্বাদ-পরায়ণাঃ।
নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্নান্দী প্রকীর্তিতা।"

ভারতীয় রস-দার্শনিকের 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ' রস-সংজ্ঞা এবং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ফিক্‌টের 'Poetry is the expression of a religious idea' অনেকখানি কাছাকাছি। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'কমলা বক্তৃতামালা' "শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি" এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত 'বিমানবিহারী মজুমদার স্মারক বক্তৃতায়' Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya এবং তন্নামক প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ে এ-বিষয়ের সাধ্যমত আলোচনা করেছি।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং রূপ-'গোস্বামীর পদ্যাবলী'র অন্তর্গত বহু প্রকীর্ণ কবিতায় ভাগবতীয় আবহের সঞ্চার দেখা যায়। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাঁর অমর কাব্য 'গীত গোবিন্দের' আদিতে মিনতি জানিয়েছেন,

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুর কোমলকান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥"

আমাদের নীরস বঙ্গানুবাদ।

"হরির স্মরণে চিত হয় যদি বিহ্বল,
ভাগবতী-লীলারসে জাগে যদি কুতূহল,
মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী,
শোন তবে জয়দেব-বিরচিত কথাগুলি॥"

নানাভণিতায় জয়দেবের এই অধ্যাত্মচেতনা-সূচক অনুনয় ব্যক্ত হয়েছে।

"শ্রীজয়দেবকবেরিদম উদিতমুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।"

'উদারম্,' 'সুখদম্,' 'শুভদম্,' 'ভবসারম্' প্রতিপদ গীতা-ভাগবতের গূঢ়ার্থক ব্যঞ্জনাময় এবং কাব্যময় অনুরণন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুসরণে একালের সাহিত্য-বিচারকেরা জয়দেবের অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা অপেক্ষা তাঁর আদিরসাশ্রিত ধ্বনিমাধুর্যের উপর জোর দেন বেশী। মধুসূদন কিন্তু একটি চতুর্দশপদীর স্বল্প পরিসরে জয়দেবের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার স্বীকৃতি দিয়েছেন। "মাধবের রব কবি ও তব বদনে। কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি জানে মনে।"

মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী পরিকরবৃন্দের সমর্থনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পর মৈথিল রাজকবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলার অজস্র পদ রচনা করেছেন। তাঁদের ভাব ভাষা ও বস্তু সম্পর্কে মতানৈক্যের অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের অনুভব-বাহিত অধ্যাত্ম-চেতনার প্রতি আমাদের মন ও মত উন্মুখ। অন্যথা বৈষ্ণবের-দেওয়া পাষণ্ডী আখ্যাটি আমাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে। রূপগোস্বামীর রসপর্যায় নির্মাণের পূর্বেও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মোটামুটি একটি রসপর্যায় অবলম্বন করে পদ রচনা করে গিয়েছেন। মানবীয় প্রেমের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব অবলম্বনে বিভাবিত ভগবদ্-ভজনের রসপর্যায় সেটি "তিমির দিগ্‌ভরি / ঘোর যামিনী/ অথির বিজুরি পাঁতিয়া। / বিদ্যাপতি কহ / কৈছে গোঙায়বি / হরি বিনে দিন রাতিয়া॥" রবীন্দ্রনাথের আস্বাদিত এবং বিশ্লেষিত এই পদ এবং "দেই তুলসী তিল / দেহ সমর্পিলু / দয়া জনু ছোড়বি মোয়।" প্রার্থনার এমন চিত্তদ্রবকারী পদের পরিপ্রেক্ষিতে মহাপ্রভুর বিদ্যাপতি-পক্ষপাতের কারণ অনুমান করা যায়।

চণ্ডীদাস-সমস্যার কণ্টক-বন পরিহার করে আমাদের নিজস্ব একটি কথা এখানে বলব। চণ্ডীদাসের অত্যুৎকৃষ্ট কতকগুলি পদ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সাহচর্যে আস্বাদনের বিষয় ছিল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অধ্যাপনাপর্বের প্রথম দিকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নতুন করে আমরা গোস্বামি-শাস্ত্র-অধ্যয়নের অধ্যবসায়ে ব্রতী হয়েছিলাম। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব'-নাটকের "নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী" শ্লোকাংশ পেয়ে চমকে উঠি। অনিবার্য অনুমান হয়। চণ্ডীদাসের "না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো"-কলিটির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, ভাবগত এবং আক্ষরিক। এখানে ঋণের সম্পর্ক। কে উত্তমর্ণ ? কে অধমর্ণ ? আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস উত্তমর্ণ। চণ্ডীদাসের স্বতঃস্ফূর্ত অত্যুৎকৃষ্ট "সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম" পদের সংহত সংস্কৃত রূপান্তর রূপের শ্লোকটি। 'না জানি'—'নো জানে' 'কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ—কতেক মধু।' শ্যাম-নামে আছে গো'র বদলে 'কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'। বিদ্যাপতির ব্যবহৃত মাধব, চণ্ডীদাসের শ্যাম এবং কৃষ্ণনামমূর্তি মহাপ্রভুর সমকালীন এবং প্রভাবিত রূপগোস্বামীর কৃষ্ণনাম। যাঁরা বলেন রূপ গোস্বামীর সংস্কৃতপদের বঙ্গানুবাদ বা অনুকৃতি চৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পূর্ব-রাগের পদ, তাঁদের কাছে তুলে ধরব যদুনন্দন দাসের একটি পদ "মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম"। এখানে 'শ্যাম' নয় রূপ গোস্বামীর শ্লোকে ব্যবহৃত কৃষ্ণনাম (কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী)। শ্লোকের প্রারম্ভিক তুণ্ড শব্দটি দিয়ে এই পদের আরম্ভ। চণ্ডীদাসের পদটি স্বতঃস্ফূর্ত, যদুনন্দনের পদটি অনস্বীকার্যভাবে রূপগোস্বামীর শ্লোকের অনুকৃতি, পদাবলীর রসগ্রাহী পাঠক একথা স্বীকার করবেন। আমরা অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে প্রশ্ন করে আসছি, চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত একটিও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক বা গৌরচন্দ্রিকার পদ কেন মিলছে না ? চৈতন্যোত্তর যুগের কোনও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কি গৌরচন্দ্রকে বাদ দিয়ে পদরচনা করেছেন ? আর একটি কথা, নরহরি, গোবিন্দ প্রভৃতি নামধারী একাধিক পদকর্তার কেউ হারিয়ে যান নি, কিন্তু চণ্ডীদাস নামধারী চৈতন্যযুগের একজন প্রথম শ্রেণীর পদকর্তা কি করে হারিয়ে গেলেন ? চণ্ডীদাসের দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব সম্পর্কে কোনও সংস্কার বৈষ্ণব সাহিত্যে (তথা-কথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারের পূর্বে) ছিল না কেন ?

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মহাপ্রভুর পরে রচিত, অথবা আদ্যোপান্ত পরিবর্তিত বাংলা-সাহিত্যের সুধী কালপঞ্জীকারেরা বলছেন। কথাটি মানতে কষ্ট হয়। আমাদের সম্প্রতি-প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ভূমিকায় এবং 'পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাংলা

সাহিত্য' গ্রন্থে 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী অকৃত্রিম মনে করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। প্রাক-চৈতন্য যুগে মহাপ্রভুর জন্য একটি ভাবভক্তির আবহ কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর, "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" হরি কৃষ্ণ ও রাম এই তিনটি নিখিল ভারতের ভগবদবাচক নামের পূর্বাপর-বিন্যাসে (permutation এবং combination-এ) বিরচিত। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনীতে পাওয়া যায়, আগে ভগীরথ চলেছেন পশ্চাতে 'স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তী' ভগবতী ভাগীরথী। ভগীরথের ' শিঙ্গায় বলে রাম ডমরু বলে হরি।" বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণময় যোদ্ধা, বহু ভাষাবিৎ বহু সাহিত্যরসিক মধুসূদন স্বল্প-পরিসর একটি চতুর্দশপদীতে কৃত্তিবাসের মর্মকথাটি ধরেছিলেন. "গাওগো রামের নাম/মধুর সুতানে,/কবিপিতা বাল্মীকিকে/তপে তুষ্ট করি।" মেঘনাদবধের প্রারম্ভিক বাণী-বন্দনায় তিনি বলেছেন ""তব বরে চোর-রত্নাকর কাব্যরত্নাকর কবি।" চ্যবন-ঋষির পুত্র দস্যু-রত্নাকর 'মরা-মরা' (বর্ণ-বিপর্যয়ে নামাভাসে রাম-রাম) জপ করে ঋষি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পাদন-সহায়ক হিসাবে আশুতোষ চৌধুরীর চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত নিজাম ডাকাইতের পালাটির ইংরেজি অনুবাদ করবার ভার পেয়েছিলাম। নিজাম ডাকাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, দিল্লীতে তার সমাধি আছে। যদুনাথ সরকার তার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পীরের কৃপায় ইসিম-জপ করে সে আউলিয়ায় পরিণত হয়েছিল। কৃত্তিবাসের রত্নাকর-কাহিনী এর প্রভাবে কল্পিত বলে আমাদের বিশ্বাস। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে সম্প্রতি-প্রদত্ত সংস্কৃতি-সমন্বয়-সম্পর্কিত তিনটি ইংরেজি বক্তৃতায় আমরা বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির আদিতে সুফী প্রভাব আলোচনায় একথা বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছি।

নামমন্ত্রের প্রাকচৈতন্য জপকর্তা হরিদাস ঠাকুরের ভক্তিতীর্থ-পরিক্রমার বিবরণে কৃত্তিবাসের ফুলিয়ার কথা এসে গিয়েছে। বেনাপোলের তুলসীবনান্তরালস্থ কুটীরে প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম জপকার্যে রত থেকে তিনি পাষণ্ডী ধনীর প্রেরিত পতিতার প্রলোভন জয় করে তাকে সাধুজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলমান শাসনকর্তার আদেশে বাইশ বাজারে ঘুরিয়ে দেওয়া বেত্রাঘাত অঙ্গে ধারণ করে তিনি বলেছিলেন, "খণ্ড খণ্ড হউ দেহ বাহিরায় প্রাণ।/ তথাপি মুখে না ছাড়িব কৃষ্ণনাম॥"

প্রহারকারীর জন্য তিনি ভগবানের করুণা প্রার্থনা করেছিলেন, "মোর দ্রোহে এসবার নহু অপরাধ"। খ্রীস্টের ক্রুশদণ্ডদাতার জন্য এই প্রার্থনা মনে পড়ে। তবে এ-কালের খ্রীস্টধর্মাবলম্বী খ্রীস্টের ঐতিহাসিকতায় সংশয় পোষণ করেন। কিন্তু 'যবন হরিদাস' বা হরিদাস ঠাকুর ইতিহাস। হরিদাসের ভক্তিতীর্থ পরিক্রমার প্রথমেই কৃত্তিবাসের ফুলিয়া, পরে পরে মালাধরের কুলীনগ্রাম সপ্তগ্রাম অদ্বৈতের শান্তিপুর। শ্রাদ্ধকার্যে ব্রাহ্মণকে দেয় দানের অগ্রভাগ অদ্বৈতাচার্য যবন হরিদাসকে অর্পণ করেন বৈষ্ণবের বিশ্বাস, পূর্বে অদ্বৈত-যাজী অদ্বৈতাচার্যের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহাপ্রভু এসেছিলেন। "অদ্বৈত-হুঙ্কারে-সুরধুনী তীরে/ত্বরিতে আইলা নাগররাজ।" অদ্বৈত মহাপ্রভুর পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী বয়োজ্যেষ্ঠ। নিত্যানন্দ প্রভুও সাত বছরের বড়ো। অবধূত-রূপে নানাতীর্থ পর্যটন করে তিনি মহাপ্রভুর প্রকাশ কালে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। প্রবীণ নামজপসিদ্ধ হরিদাসও এই সময়ে নবদ্বীপে এসে শ্রীবাস-অঙ্গনে অন্তঃপুরে কীর্তন সহচররূপে গৃহীত হন। মহাপ্রভু প্রভাতী গেয়ে নবদ্বীপবাসীর নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ প্রভুকে উপদেশ দেন।

কিন্তু তাঁর দেওয়া প্রভাতী-কীর্তনের 'ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম' এর পরিবর্তন করে এঁরা গৌরাঙ্গভজনার প্রবর্তন করে গাইতেন 'ভজগৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম'। মহাপ্রভুর ভক্ত-পার্ষদ ও মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু রুক্মিণীর কাছে এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপ্রোক্ত নানা শক্তির আবেশে অদ্ভুত নৃত্য করেছিলেন। তাতে নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর যথাক্রমে বড়াই বুড়ী ও বৈকুণ্ঠের কোটালের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল রেখে এর বর্ণনা করেছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টককে পল্লবিত দৈন্যবিনয়ের মূর্তবিগ্রহ হরিদাস ঠাকুর নীলাচল বাসকালে মন্দিরে জগন্নাথদর্শনে যেতেন না। মন্দিরের পথেও বেরুতেন না, তাঁর অশুচি স্পর্শ ভক্তের অঙ্গকলুষিত করতে পারে এই আশঙ্কায়। গম্ভীরাগৃহের অদূরে সিন্ধব কুল মূলে নামজপরত এই মহাসাধক বাস করতেন। বৃন্দাবন থেকে এসে রূপ সনাতনও হরিদাসের অতিথি হতেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে এসে দেখা দিতেন। হরিদাসের নির্বাণের পর তাঁর দেহ স্কন্ধে বহন করে মহাপ্রভু নামগান ও নৃত্য করেছিলেন। তাঁর পূত দেহাবশেষ সমুদ্রবালুকায় প্রোথিত করে স্বহস্তে তাঁর সমাধি দেন।

সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত-সমূহে যে-সমস্ত ঘটনার উল্লেখ নেই এমন কতকগুলি ঘটনা এবং সে-সম্বন্ধে আমার চৈতন্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণা এখানে ব্যক্ত করব। মহাপ্রভুর সমকালে নবদ্বীপ নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির আলোচনার খ্যাতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। 'সম্বর্ত বিষ্ণু-হারীত' প্রভৃতির বিধানের কালোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে এ-যুগের স্মার্ত সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। অষ্টা বিংশতি তত্ত্বকার রঘুনন্দন মহাপ্রভুর সময়ের লোক। গৌতমের ন্যায়দর্শনের সূক্ষ্মতাবিধান করে নবদ্বীপের নৈয়ায়িক ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচায়ক নব্যস্মৃতির প্রবর্তন করেন। নব্যন্যায়ের অন্যতম প্রবর্তক রঘুনাথ শিরোমণির মনক্ষোভ দূর করবার জন্য বিশ্বম্ভর নিমাই তার স্ব-রচিত সূক্ষ্মতর ন্যায়ের গ্রন্থ ভাগীরথী-সলিলে নিক্ষেপ করেন। এ-কাহিনী সুপ্রচলিত। বৈষ্ণবচরিতকারেরা সকলেই বলেছেন। নিমাই পণ্ডিতের ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকির ভয়ে ঘট-পটিয়ারা সব তার কাছ থেকে দূরে থাকত। মুরারি গুপ্ত ও অপরাপর শ্রীহট্টীয় নৈয়ায়িককে তিনি চালেন প্রচুর। সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ কৃষ্ণনামপ্রদ দেবমানব তাঁর শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে বলেছেন,

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ দুর্দৈব
মীদৃশং মমাপি ইহাজনি নানুরাগ ঃ॥

কৃষ্ণনামমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবানের সকল নামের মাহাত্ম্যই অঙ্গীকার করেন। ভক্ত-পরিকর মুরারিগুপ্তের রামোপাসনা তিনি অনুমোদন করেন। নবদ্বীপবাসীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তান্ত্রিক সাধকের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিশুদ্ধ ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। তন্ত্রশব্দের মূলে তিন্ ও 'ত্রিন্ দুটি ধাতু।' তনোতি বিপদ্লান ভাবান ত্রাণঞ্চ কুরুতে। কৃষ্ণপ্রেমের পথেও মহাপ্রভু অনন্ত ভাববৈচিত্রী প্রকটন করেন। তন্ত্রের কবিভাষ্যকার রামপ্রসাদ সেন তাঁর উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন, "সে যে ভাবের বিষয় ভাবছাড়া তার অভাবে কি ধরতে পারে।" আর একটি গানে তিনি বলেছেন, "ভাব কি

ভেবে পরাণ গেল। /যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল/তার কেন রূপ কালো হল"। বৈষ্ণবীয় গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব এই যে, তিনি 'মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ পরিপ্রকাশ। নবদ্বীপ তন্ত্রানুশীলনেরও একটি কেন্দ্র ছিল। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নবদ্বীপের অধিবাসী এবং সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। মেহারের সর্বানন্দ সর্বানন্দতরঙ্গিণী রচয়িতা এবং পূর্ণানন্দ এর পূর্ববর্তী। তন্ত্রের আনন্দতরঙ্গের তুঙ্গ শীর্ষে মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের ভাব তরঙ্গ বাহিত হয়ে এসেছিল। ন্যায়ের ক্ষুরধার মনীষা, স্মৃতির সমাজচেতনা ও তন্ত্রের ভাবভক্তির পরম পরিণতি মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম।

বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের সমাজচিত্র আঁকতে গিয়ে বলেছেন,

ধর্মকর্ম লোকে সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলী নির্মায় কেহ দিয়ে বহু ধন॥

বিভিন্ন দেবতার এবং দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বকলহের প্রচলিত কাব্য-কাহিনী এখানে সঙ্কেতিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিজয় গুপ্ত এবং তাঁরও বেশ-কিছু আগেকার কবি কানা হরিদত্তের চাঁদ-মনসার বিবাদের কাব্যকথা অবলম্বনে রচিত মঙ্গল গান বা মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে প্রচলিত ছিল। তেমনভাবে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে উল্লিখিত "ত্বং কালকেতু-বরদাচ্ছলগোধিকাসি সা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গল-চণ্ডিকাখ্যা"-র মাহাত্ম্য অবলম্বনে কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি শ্রীমন্তের কাহিনীও অমার্জিত লোকসাহিত্যে মুসলমান শাসনের পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের এই কাব্য কাহিনী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রতিষ্ঠাকামী নিপীড়ক ও শোষক শাসনশক্তির প্রতিবিম্ব পড়েছে মঙ্গলকাব্যের দেবতায়। নিপীড়িত এবং অবদমিত শাসিতবৃন্দ মঙ্গলকাব্যে মেরুদণ্ডহীন ভক্তচরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। মতটি গ্রহণ করবার পথে আমাদের প্রথম বাধা এই যে কাহিনীগুলির উদ্ভবকাল মুসলমান শাসন-প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী। দ্বিতীয়তঃ চাঁদ সদাগর, কালকেতু ব্যাধ, পিতৃহারা শ্রীমন্ত প্রভৃতি চরিত্র অবদমিত অবনমিত মনুষ্যত্বের প্রতীক নয়। এঁরা দোষে-গুণে মধ্যযুগের বাঙালী চরিত্রের সজীব প্রাণবন্ত প্রতিনিধি। বেহুলা-খুল্লনার মতো পতিব্রতা অন্তর্বল-সম্পন্না নারীর চরিত্র বাঙালীর কবি-কল্পনার গৌরব। নিজের উপাস্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে অপরের উপাস্যে দ্রোহবুদ্ধি আধ্যাত্মিক অপরাধ। চাঁদসদাগর পরম শৈব। "যেই হস্তে পূজিয়াছি/দেব শূলপাণি। সেই হস্তে না পূজিব/চেঙমুড়ী কাণী।" পুত্র-স্নেহাতুর অনিষ্টাশঙ্কিনী জননী সনকা 'প্রচণ্ড-মনোহর' দেবতার জন্য অন্তরে বাহিরে শ্রদ্ধার ঘট পেতেছেন। হেঁতালের বাড়িতে চাঁদ সে ঘট গুঁড়িয়ে দেন। ধর্মজগতে এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-জনিত বিদ্বেষ-বুদ্ধি নিন্দনীয়। প্রগতির "যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" রবীন্দ্রনাথের বহু-ব্যাখ্যাত এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত। 'গীতাঞ্জলি'তেও তিনি প্রার্থনা করেন, "সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে।" মঙ্গলকাব্যের দেবতাও প্রচণ্ড মনোহর দেবতার প্রতিবিম্ব বহন করে। মনসা ও চণ্ডী কেউ-ই বিদ্বেষ-পরায়ণ শিবোপাসককে ধ্বংস করেন নি। নানা বাধাবিপত্তি ও দুর্যোগ হেনে তাদের সংশোধন করেছেন। দেবতা এখানে নিপীড়নকারী নন, কৃপালু। চাঁদ সদাগর ও

কালকেতু-শ্রীমন্তও মনুষ্যত্বহীন নিপীড়িত মানুষের ছায়াবহ নন। তাঁরা দোষে-গুণে পৌরুষে ও নৈতিক সাধুতায় মধ্যযুগের বাঙালী চরিত্রের বাস্তবায়িত রূপ। মঙ্গলকাব্যের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র ব্যাসের সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধির দোষ দেখিয়ে ভারত-সংহিতাকার বেদবিভাগকর্তা বেদান্ত-প্রবর্তক ব্যাসের নূতনতর যুগোপযোগী চরিত্র কল্পনা ও কাহিনী বয়ন করেছেন। ব্যাস-কাশী অংশ ভণিতায় তিনি বলেছেন, "যে ভজে দুই রূপে/সে মজে মোহকূপে।/ভারতে নাহি এই ক্লেদ॥" 'ভারতে' অর্থাৎ ভারতবর্ষে ও ভারতচন্দ্রে। শ্লেষ অলংকার। আধ্যাত্মিক দেশাত্মবোধের পরিচায়ক এই শ্লেষালংকারটি। ধর্মজগতের এই অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বুদ্ধি আমাদের মতে, মহাপ্রভুর মধ্যে পরমসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা' তাঁর শিক্ষাষ্টক ভগবদ্বাচক সকল নাম ও নাম ভজনকে অঙ্গীকার করেছে। দাক্ষিণাত্যে তীর্থপরিক্রমায় তিনি সমস্ত দেবতার মন্দিরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেছেন। মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে রচিত মঙ্গল কাব্যগুলিতে পূর্বের অমার্জিত কাহিনী নূতনতর রূপ গ্রহণ করে ধর্মসংস্কৃতির জগতে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে মাতৃদেবতার গুণগান করতে গিয়ে বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী দেবতার কাছে ভণিতায় গোবিন্দ-ভক্তি যাচ্ঞা করেছেন,

"গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে।
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

নিজের পরিচয়ে তিনি ভণিতায় বলেছেন,

"গোবিন্দ-পদারবিন্দ-বিগলিত মকরন্দ
তাহে অলি শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

তাঁর কাব্যে মানসিংহ-প্রশস্তিতে তিনি বলেছেন, "ধন্যরাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।" মানসিংহের ব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল, গ্রাউজ মথুরার ইতিহাসে বলেছেন। আকবরের সভা-গায়ক মিঞা তানসেনের গুরু বৃন্দাবনে ভক্তিভজন করতেন। আমাদের মনে হয় আকবরের দীন্ এলাহি বৃন্দাবনের পরোক্ষে মহাপ্রভুর প্রভাবিত।

নিদাঘ-তপ্ত দীর্ণ মৃত্তিকার বুকে যেমন বর্ষার বারিধারা নেমে আসে তেমন কুতর্ক-কর্কশ জাতীয় চিত্তে সহজ অথচ সুগভীর প্রেমানুভূতির ধারা বয়ে গিয়েছিল। "কত বিদগধ জন/রস-অনুমগন / অনুভব কাহু ন পেখ। / কহে কবিবল্লভ/প্রাণ জুড়াইতে/লাখে না মেলল এক॥/ বিদ্যাপতির এই অতৃপ্তি মিটিয়ে চণ্ডীদাসের "কোটিকে গোটিক মিলে" দুঃখের পূরণ করে যখন মহাপ্রভু প্রকটিত হলেন তখন বৈষ্ণব জগতের প্রাপ্তিজনিত আনন্দের প্রকাশ করেছেন গৌরচন্দ্রিকার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা গোবিন্দদাস।

"কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম-কলপ-তরু সঞ্চরু সুরধনী-তীর উজোর।"

শ্রীচৈতন্যের জন্ম পরিবেশ এবং প্রকটকালের প্রথমার্ধ অর্থাৎ চব্বিশ বছরের গৃহী-জীবনের (১৪৮৬-১৫১০) কিছু আলোচনা এখন করা যেতে পারে। শোনা যায় প্রাচ্য ভারতের অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র শ্রীহট্ট হতে যে যুগপাবন বৈষ্ণব পরিবারটি বিদ্যানুশীলনের জন্য নবদ্বীপে আসেন তাঁরা তারও পূর্বে উৎকলবাসী ছিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নীলাচলবাস শচীমায়ের ইচ্ছায় হয়ে থাকলেও পূর্বতন উৎকল-সম্পর্কটিও গূঢ়ভাবে কাজ করে থাকতে পারে। উপেন্দ্র মিশ্রের বিদ্যাভিলাষী পুত্র জগন্নাথ মিশ্র (মিশ্র পুরন্দর)

নবদ্বীপে এসে নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। নামগুলির আড়ালে তাঁদের পারিবারিক বৈষ্ণব-পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। নবদ্বীপের গৃহে বিষ্ণু খট্টা ও স্মার্ত বিধানে নারায়ণসেবা প্রচলিত ছিল। নিমাইয়ের জন্মপূর্ব হতেই পরিবারটি নিরামিষাশী বৈষ্ণবাচার-পরায়ণ ও স্বল্পে সন্তুষ্ট এবং ব্রাহ্মণোচিত যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। নবদ্বীপ-পরিকরদিকের আহারে ও আচরণে এই বৈষ্ণবাচার দেখা যায়। চণ্ডীদাসের "জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জিয়ে" এবং বিদ্যাপতির "পাখীক পাখ মীনক পানি" এমন দু একটি প্রয়োগে ছাড়া সমগ্র-বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌড় বঙ্গীয় মৎস্যালোলুপতার কলঙ্ক ছাপ ফেলে নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নিজের বৈষ্ণব মানসিকতা সত্ত্বেও মীনমাংসত্যাগী পূর্বপুরুষের পরিচয়ে খুল্লনার রন্ধন-বর্ণনায় এবং 'পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে' আত্মপরিচয়ে আমিষাভিলাষের পরিচয় দিয়েছেন। মহাপ্রভুর ভোজনে রুচি ও আনন্দের সংগে সংযম ছিল। "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।" তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। শচীর রন্ধনে তাঁর সন্ন্যাসী সন্তান উপস্থিত হ'তেন, ভক্তরা বিশ্বাস করতেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রায় রাঘবের ঝুলি' নানা সুখাদ্যে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর কাছে যেত। জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্তগণকে পরিবেশন ও নিজে গ্রহণ করে তিনি পরম আনন্দ পেতেন। তাঁর ভিক্ষার জন্য অতি সুন্দর সুচিক্কণ চাল ছোট হরিদাস মাধবীর নিকট থেকে আহরণ করে বর্জিত হয়েছিলেন।

মৃতবৎসা শচীদেবীর সর্বশেষে দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর নিমাই। দুটি নামেই গীতা-ভাগবতের প্রভাবচিহ্ন-মুদ্রিত। চৈতন্য-ভাগবতকারের "গীতা-ভাগবত যেহে / পড়ে বা পড়ায়।/ ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি / তাহারো জিহ্বায় ॥/ একথা যুগ সম্পর্কে যতখানি সত্য মহাপ্রভুর পরিবার সম্পর্কে ততখানি সত্য নয়। অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ও অপরাপর পার্ষদবৃন্দের পারিবারিক বৈষ্ণবাচার ও ভক্তিভাবুকতা সুপ্রকট। হরিদাস ঠাকুরের জন্ম ও পালন-পরিবেশ রহস্যাবৃত হলেও তাঁর নামপ্রেম ও বৈষ্ণবাচার অত্যদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর। ফাল্গুনী-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তে গঙ্গাস্নানরতদের-কীর্তনের সাধ সুবিদিত। শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন (১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪০৭ + ৭৮ + ১ = ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে)। নিমাইয়ের অগ্রজ মেধাবী বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে বেদান্ত ও অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৈশোরেই বৈরাগ্যসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। বহু সন্তান-শোকাহত পিতামাতা তাঁকে গৃহস্থ করবার আয়োজনে মন দিলে বিশ্বরূপ অতর্কিতে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করে করে শঙ্করারণ্য নামে সংসার ত্যাগ করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসোত্তর দক্ষিণ-পরিক্রমার অন্যতর উদ্দেশ্য সন্ন্যাসী-অগ্রজের সন্ধান হতে পারে। সংসারাশ্রমের কিশোর দুটি ভাইয়ের সৌভ্রাত্রের মধুর ছবি চরিতকার এঁকেছেন। মা ভাত খেতে ডেকেছেন। অদ্বৈতের অদূরস্থ নবদ্বীপের টোল থেকে বিশ্বরূপের হাত ধরে তাঁর ভুবনভুলানো ভাইটি বাড়ী নিয়ে আসছেন। শচীমায়ের অভিযোগ ছিল বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে অদ্বৈতাচার্যের দায়িত্ব ছিল। বিশ্বম্ভর মায়ের বিরূপ ধারণাকে বৈষ্ণবাপরাধ মনে করে পরম মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের এই অপরাধ খণ্ডন করিয়ে তাঁর অন্তরে ভক্তি সঞ্চার করেছিলেন। বৈষ্ণবাপরাধে মলিনচিত্তে ভক্তি সঞ্চার হয় না, এ-কথা যুক্তিগ্রাহ্য সত্য। মহাপ্রভুর চরিত্রে মানবিকতা ও আদর্শনিষ্ঠার কঠোরতার অপূর্ব সমাবেশ।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণে শোকসন্তপ্ত দম্পতি সবে-ধন নীলমণি নিমাইয়ের বিদ্যাভ্যাস বিলম্বিত করেন। যিনি বিদ্যাবধূমু এবং বিদ্যাবধূ-জীবনমু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনমু একসঙ্গে বরণ করেন। তাঁর বিদ্যাভ্যাসে বিলম্ব-কালের মধুর দুরন্তপণার আলেখ্য ভাষা চরিতকার

অঙ্কিত করেছেন। গংগার ঘাটে বালক নিমীলিতনেত্র শিবপূজকের মৃত্তিকা-শঙ্কর লিঙ্গ মূর্তি চুরি করতেন। গীতাধ্যান-রত 'কেহ বলে চোরাইলা মোর গীতাপুঁথি।' জলে ডুব দিয়ে আকণ্ঠনিমগ্ন কোন স্নানার্থীর পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেন, ঢিল ছুঁড়ে জলাহরণ-রতার মেটে কলসী ভেঙে দিতেন, কারো এলো চুলে ওকড়ার বিচি দিয়ে টান দিতেন। বর্ষীয়সী বলেন "কেহ বলে চাহে মোরে / বিভা করিবারে।" শচী-মা মিঠে কথায় সকলের অভিযোগ মিটিয়ে খুশি করেন। পিতা তাড়না করতে গেলে অভিযোক্তা নিজেই নিবারণ করেন। আমাদের মনে হয়, জীবনের সবটুকুই যাঁর ভালবাসা হয়ে ফুটবে তিনি শৈশবের দুরন্তপণাটুকুকেও যেন ভালবেসে ফেলেছিলেন। "ভক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী / সকলি অশান্ত।/ কৃষ্ণপ্রেম নিষ্কলঙ্ক / অতএব শান্ত॥"/ অশান্তপণার নির্মোক ছেড়ে' সন্ন্যাসকৃচ্ছ্রমঃ শান্তঃ নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ সুবর্ণবর্ণ পুরুষের দীপ্ত প্রকাশের এ-যেন পূর্বাভাস।

একটু বয়স হলেই নিমাই যখন পড়তে শুরু করলেন তখন "কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ পড়ে।" তখন থেকে বিদ্যা তার 'অগ্রে ধাবতি ধাবতি।' পিতা জগন্নাথ এই সময় দেহরক্ষা করেন। শোকসন্তপ্তা জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে তরুণ পড়ুয়া সংসার-নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে কলাপ ব্যাকরণ দিয়ে যে বিদ্যার শুভ সমারম্ভ তৎকালে অনুশীলিত কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে অত্যল্পকালের মধ্যে নিমাই তাতে পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। একালের পাণ্ডিত্যাভিমানী সুধীদের কেউ কেউ তাঁকে শুধু কলাপী বৈয়াকরণ বলে তাঁর সর্বশাস্ত্র-দর্শিতায় সংশয় প্রকাশ করেন। সেকালের দুর্জন গৃহী ও সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক-বেদান্তী বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে, রূপ ও সনাতনকে প্রদত্ত শিক্ষায়, রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের গভীর ভাবানিমগ্নে তিনি অপার অমেয় শাস্ত্রজ্ঞান ও অনন্য-সাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন। কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়ের কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্বম্ভর নিমাই কর্তৃক গঙ্গামহিমার শ্লোকের দোষোদ্ঘাটন যাঁরা বর্ণনা করেছেন সেই সমস্ত রচয়িতার স্বকপোলকল্পিত মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণ করেছেন ; এ-কথা মনে করার কি কারণ থাকতে পারে ?

কেশব কাশ্মীরী-পরাজয়ের কাহিনীটি এই। অশ্বমেধের অশ্বের মতো নানা বিদ্যাপীঠের জয়পত্র ললাটে ধারণ করে কেশব কাশ্মীরী এলেন প্রাচ্যভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে। জ্যোৎস্নাবতী-সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাদানে রত। শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণে মাত্র তাঁর অধিকার এই মনে করে কাশ্মীরী তাঁর প্রতি 'যুদ্ধং দেহি' সাটোপ আহ্বান জানান। ঔদ্ধত্য পরিহার করে তরুণ ব্যাকরণিয়া দিগ্বিজয়ীকে সম্মুখবর্তিনী প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী-বর্ণনার অনুরোধ করেন। কাব্যপ্রতিভাধর কাশ্মীরী ঝড়ের মতো রচিত শ্লোকের পর 'শ্লোক রচনা' এবং আবৃত্তি করে গেলেন। প্রশংসমান শ্রুতিধর নিমাই পণ্ডিত প্রথম শ্লোকটির অস্খলিত পুনরাবৃত্তি করে তার দোষোদ্ঘাটনের সঙ্গে অলঙ্কার-ঘটিত গুণদোষ বিশ্লেষণ করলেন। শ্লোকটি এই।

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততং যদ্ আভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপত্তি-সুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্য-চরণা
ভবানীভর্তুর্যা-শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥"

নিমাই পণ্ডিত বিনম্রভাবে শ্লোকে অলঙ্কার-ঘটিত পঞ্চদোষ প্রদর্শন করলেন।

প্রথম দোষ অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ শ্লোকের প্রতিপাদ্য বাক্য, ইদং গঙ্গায়া মহত্বম্। গঙ্গায়া মহত্বং এখানে বিধেয়। বিধেয় আগে বলে অনুবাদ 'ইদম' পরে বলায় অর্থে বাদ ঘটেছে। 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' প্রয়োগে দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়, সমাসবদ্ধ হওয়ায় লক্ষ্মীর সমতা-রূপ শব্দার্থ ক্ষয় করেছে। তৃতীয় মহাদোষ বিরুদ্ধ মতি। 'ভবানী-নামটি' ভব বা মহাদেবের গৃহিণীর। 'ভবানীভর্তুঃ'—প্রয়োগে মনে হয় যেন ভবপত্নীর দ্বিতীয় ভর্তা। 'বিভবতি' ক্রিয়াপদে বাক্যসমাপ্তি হয়েছে। পুনরায় 'অদ্ভুতগুণা'-বিশেষণ চতুর্থ দোষ। পঞ্চম দূষণ, প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ পদে যথাক্রমে ত-কার, র-কার এবং ভ-কারের পুনঃপুনঃউল্লেখ জনিত শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পাদে অনুপ্রাস নেই। চরিতামৃতের এই কাহিনীতে অবিশ্বাস করলে প্রজ্ঞানের অমেয় ভাণ্ডার সভ্যাসক্ত-বৈষ্ণব কবিদার্শনিক কবিরাজ গোস্বামী এবং সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিনিবেশসম্পন্ন শ্রোতা শ্রীরূপ সনাতন দাস গোস্বামীকে অকারণ মিথ্যার আশ্রয়গ্রাহী মনে করবার দুষ্কৃতি ভাজন হতে হয়।

বিশ্বম্ভর প্রথমাপত্নী লক্ষ্মীদেবীকে গঙ্গার ঘাটে দেখে ঘটকের মাধ্যমে মা-কে জানিয়ে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে সাংসারিক সচ্ছলতা বিধানের জন্য তিনি পূর্ববঙ্গে বিদ্যাদান ও অর্থোপার্জন করতে যাত্রা করেন। বিদ্যাসাগর উপাধিতে পরিচিত তাঁর রচিত কলাপ ব্যাকরণের টীকা সেখানে পড়ানো হত। পূর্ববঙ্গবাসকালে তিনি তপনমিশ্রকে নামসাধনার উপদেশ দেন। তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ('পরে ষড় গোস্বামীর একতম ভট্ট রঘুনাথ') তাঁর সেবা করেছিল। তপনমিশ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর কাশীতে মিলন হয়। পূর্ববঙ্গ বাসে স্বল্পকালে তিনি পিতৃপুরুষের পূর্বনিবাসে শ্রীহট্টের দক্ষিণে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামে সাধারণ্যে বৈষ্ণব প্রবণতার এটি একটি কারণ হতে পারে। তাঁর প্রবাসকালে লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে বা বিরহ-কাতরতায় প্রাণত্যাগ করেন। মায়ের আগ্রহে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। গৃহ-জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে এই সময়ে তিনি অধ্যাপনা করতে থাকেন। পিতাকে পিণ্ডদানের জন্য অতঃপর তিনি গয়াযাত্রা করেন। গয়ায় বিষ্ণুপদ দর্শন ও ভাবনায় অধীর হয়ে তিনি কৃষ্ণান্বেষণে গৃহত্যাগ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি এই সময়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন। সঙ্গীরা অনুনয় করে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু নবদ্বীপের বিদ্যার দীপ্তিশালী বিচারপটু সেই নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনাকালে সূত্রব্যাখ্যায় কৃষ্ণকথার অবতারণা করে অশ্রু প্লাবন বহিয়ে দিতেন। পুঁথিতে ডোর বেঁধে পণ্ডিত নাম কীর্তন শুরু করলেন। হাতে তালি দিয়ে তিনি শিখান "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দনাম-শ্রীমধুসূদনঃ নাম কীর্তন করেন। প্রথমে রুদ্ধদ্বার শ্রীবাস-অঙ্গনে নাম কীর্তনের শুভ সমারম্ভ। কীর্তন পাঠকের সংখ্যা তখন অল্প, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস চন্দ্রশেখর। তান্ত্রিক ও পাষণ্ডীগণ কীর্তন বিরোধিতা করেন। কিন্তু মন্ত্রশান্ত মহাভুজঙ্গমের মতো সমস্ত প্রতিকূলতা অচিরাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই সময়ের দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একটি কাজী-দখল, অপরটি জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার। কাজী দখল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Civil Disodedience)-এর পরিচায়ক। মহাত্মা গান্ধীর চারশো বছর আগে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল। রাষ্ট্রপতি মুসলমান। কাজীর কীর্তন-নিষেধ লঙ্ঘনের অপরাধে বৈষ্ণব জনতার প্রাণদণ্ড

হলে কোনও প্রতিকার বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ হত না। রক্ষণশীল হিন্দু প্রজাদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ কাজীর কীর্তন নিষেধ প্রচারিত হলে বিশ্বম্ভরের আদেশে সমস্ত নবদ্বীপ শত শত সন্ধ্যা দ্বীপে উদ্ভাসিত ও আম্রপল্লবে ও মঙ্গল ঘটে সুশোভিত হল। শত শত মৃদঙ্গ-মুখরিত এই কীর্তনোৎসাহ এবং নিরীহ বৈষ্ণব জনতার নিভীকতা প্রত্যক্ষ করে কাজী বিস্মিত হলেন। কাজী কীর্তনপ্রবর্তক নিমাই পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে ভাব-বিনিময় হল এবং গ্রাম সম্পর্কে কাজী চাচা হলেন। কীর্তন-নিষেধের আদেশ প্রত্যাহৃত হল। শুধু তাই নয়। স্বধর্মে সুস্থির থেকে মুসলমান কীর্তনে যোগ দিলেন, কীর্তন পদাবলী রচনা করলেন। ভণিতাংশ বাদ দিলে সৈয়দ মুর্তজার বৈষ্ণব রচনা হিন্দু কবির না মুসলমান কবির রচনা ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। মহাত্মাজীর অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রচারের পরে আমরা 'music before mosque' দ্বন্দ্বের সমাধান করতে না পেরে ভারত-বিভাগের সূত্রপাত করলাম। জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের সমসূত্রে মুসলিম জাতীয় আন্দোলনের জন্য Muslim League স্থাপিত হল। কিন্তু মহাপ্রভুর ভেদ-ভুলানো প্রেম-জাগানো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুসলমান আমলে কীর্তনের তালে মৃদঙ্গের বোলে সমস্ত বংগদেশ মুখরিত হল।

আর একটি ঘটনা জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার। মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ হরিদাস নামগানের টহল দিয়ে নবদ্বীপের পথ পরিক্রমা করেন। কুক্রিয়াসক্ত মদ্যপ ব্রাহ্মণ-সন্তান জগাই মাধাইয়ের কাছে এসে তাঁরা কৃষ্ণভজন ও নাম কীর্তনের অনুরোধ জানান। নিতাইকে মাধাই ভাঙা কলসীর কানা মেরে ললাটে ও মস্তকে রুধিরক্ষরণ করেন। রক্তাপ্লুত দেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিতাই বলেন, "মেরেছিস মেরেছিস/ তাতে ক্ষতি নাই।/ সুমধুর হরিনাম / মুখে বল ভাই।/" জগাই ভাইকে নিবারণ করে বলেন নিতাইকে আর মেরো না ও মাধাই। সে-যে মার খেয়ে দয়া করে, এমন দয়াল আর দেখি নাই।" মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করেন।

টোলে পড়ুয়ারা নিমাই পণ্ডিতকে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ করতে লাগল, নাম প্রেমধনদাতা পণ্ডিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে সকলকে নাম প্রেম বিলাবার সংকল্প নিলেন। তাঁর সন্ন্যাসের সংকল্পের কথা অন্তরংগদের কেউ কেউ জেনেছিলেন; শচী-মাও আভাস পেয়েছিলেন। নিমাই গৃহত্যাগ করে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট থেকে সন্ন্যাসদীক্ষা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করলেন। তাঁর যুগপ্রচলিত নানা নাম—নিমাই-পণ্ডিত, বিশ্বম্ভর মিশ্র, শ্রীগৌরাংগ, গৌরচন্দ্র বা গোরাচাঁদ, গৌরহরি নবদ্বীপচন্দ্র, নদীয়ার চাঁদ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, চৈতন্যদেব, মহাপ্রভু। সন্ন্যাসগ্রহণ করে তিনি বৃন্দাবনের পথে ছুটলেন। পথ ভাঁড়িয়ে বাহ্যচেতনাহীন বৃন্দাবনযাত্রীকে নিত্যানন্দ যমুনা বলে গংগার তীর ধরে শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে নিয়ে এলেন। নবদ্বীপ থেকে বিশাল ভক্ত জনতা শচী-মাকে নিয়ে অদ্বৈত গৃহে মিললেন। সেই মিলনোৎসবে বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের পদ "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।/ চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" গাওয়া হয়েছিল। মায়ের আদেশে নিমাই বৃন্দাবনে বাসের সংকল্প ত্যাগ করে নীলাচল-বাসের প্রতিশ্রুতি দিলেন, যাতে প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে বাংলার ভক্তজনতা নিমাইয়ের খবর এনে দিতে পারেন শচী-মাকে। কৃষ্ণলীলার স্মৃতি বিজড়িত বৃন্দাবনের লুপ্ত মাহাত্ম্যের পুনরুদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্র প্রচারের ভার অতঃপর তিনি রূপ সনাতনকে অর্পণ করেন।

নীলাচলের পথে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও সাক্ষিগোপাল দর্শন করে সঙ্গীদের পিছনে ফেলে "জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে" অনুভবের অধীর আগ্রহে নীলাচলে এসে উপনীত হলেন। জগন্নাথ-মন্দিরে এসে আবিষ্টভাবে বিগ্রহ আলিঙ্গন করতে ছুটলেন। পড়িছারা বাধা দেয়। এই অবস্থায় গৌরকান্তি মূর্ছিত সন্ন্যাসীকে বাসুদেব সার্বভৌম আগলিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। মূর্ছাভঙ্গের পর পূর্বাশ্রমের পরিচয় পরিস্ফুট হল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে বেদান্ত শ্রবণের অনুরোধ করলেন। সাতদিন পর্যন্ত সার্বভৌমের মুখে মহাপ্রভু নীরবে বেদান্ত শ্রবণ করলেন। তাঁর নীরবতায় কিছু বিরক্ত হয়ে প্রবীণ বেদান্ত-প্রবক্তা তাঁকে প্রশ্ন করতে বললেন। বিনীত সন্ন্যাসী উত্তর করেন, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সূর্যের মতো স্বয়ংপ্রকাশ, সার্বভৌমের ভাষ্যমেঘ তাকে আচ্ছন্ন করছে। এর পরে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বেদান্তের শঙ্করভাষ্য খণ্ডন করে ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের স্থাপন করেন। সর্বশেষে ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্যাসসূত্রানুযায়ী পারিণামবাদ প্রণবের মহাকাব্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদ এবং জগন্মিথ্যাত্ব খণ্ডন করে 'অপানিপাদ' শ্রুতির আশ্রয় নিয়ে তিনি দেখালেন, মুখ্যার্থে অভিধাবৃত্তিতে শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষ সবিগ্রহ বলেছেন। লক্ষণায় গৌণবৃত্তিতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ। ব্রহ্ম সবিশেষ সচ্চিদানন্দ তনু। "ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার।" হেন ভগবানে তুমি/ কহ নিরাকার।/ স্বাভাবিক যেই ব্রহ্মে/তিন শক্তি হয়।/ নিঃশক্তি করিয়া তারে/ করহ নিশ্চয়। মায়াবাদও খণ্ডিত হল। ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। স্বরূপশক্তির আবার ত্রিবিধ প্রকাশ, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ। সন্ধিনী শক্তি ব্রহ্মের সত্তা-সম্বন্ধিনী শক্তি, যে-শক্তিতে তিনি নিত্য বিদ্যমান এবং সমস্ত সত্তাই যাতে বিধৃত। সংবিৎ-শক্তি জ্ঞান-সম্বন্ধিনী যার দ্বারা তিনি সব জানেন ও সকলকে জানান। হ্লাদিনী শক্তি আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধিনী শক্তি যার দ্বারা তিনি ভালবাসেন, আনন্দ আস্বাদন করেন, এবং সকলের মধ্যে আনন্দ প্রেমা হ্লাদময় অনুভবের সঞ্চার করেন। ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রকাশ প্রাকৃত বা তথাকথিত জড় জগৎ। তটস্থা শক্তি জীব, সমুদ্রের তটভাগ যেমন সমুদ্রও নয় স্থলভাগও নয়। ব্রহ্ম বিশ্বচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। ব্রহ্ম মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। তাই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ দুইই আছে। এই আপাত প্রতীয়মান পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ' নাম দিয়ে তিনি সামঞ্জস্য-পূর্ণ করেছেন। জীব গোস্বামী তাঁর সন্দর্ভগুলিতে এর বিস্তার সাধন করেছেন। ব্রহ্ম অবিকৃত থেকে 'মণি যৈছে প্রসবে প্রসবে হেমভার' জীব ও জগতে পরিণত হন। শঙ্করের বিবর্তনবাদ বিধ্বস্ত হয়ে এই পরিণামবাদ স্থাপিত হ'ল। প্রণববাদ 'তত্ত্বমণি'র স্থলে মহাকাব্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বেদান্তপ্রতিপাদ্যের এই ভক্তিসিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাখ্যা শুনে এবং সমন্বয়কারী ব্যাখ্যাতার ঈশ্বরভাব প্রত্যক্ষ করে স্তব্ধবিস্ময়ে ভক্তিবিগলিত চিত্তে সার্বভৌম তাঁর শরণ নিলেন। চৈতন্যবন্দনার স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোকাবলি তার মুখে প্রকাশিত হল। যার প্রথম দুটি শ্লোক এই।

> "বৈরাগবিদ্যানিজভক্তিযোগ- শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"
> কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
> আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

অতঃপর সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, 'উৎপন্না দ্রাবিড়ে' ভক্তির উৎস-সন্ধান, গৌণভাবে হয়ত সন্ন্যাসী অগ্রজ বিশ্বরূপের অন্বেষণ। রামেশ্বর পর্যন্ত সর্ব হিন্দুতীর্থে সর্ব দেবতার মন্দিরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ। প্রেম প্রচার ও ভক্তির বাধক সিদ্ধান্তের খণ্ডন করে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সার্বভৌমের পরামর্শে তিনি গোদাবরী তীরে ভক্ত রাজপুরুষ এবং বিদগ্ধ প্রেম-প্রবক্তা রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাধ্য তত্ত্ব সম্পর্কে ভাববিনিময় করেন। রায় বক্তা, মহাপ্রভু শ্রোতা এরূপ মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদ্য সিদ্ধান্তগুলি মহাপ্রভু রায়মুখে প্রকটন করেন। এই বহু আলোচিত এবং কতকটা বিতর্কিত বিষয়টির বিশদ আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। আমাদের মনে হয়, 'এহো বাহ্য,' 'এহো হয়,' 'এহোত্তম,' এইরূপ ভঙ্গির মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে সাধ্য ও সাধনতত্ত্বের বিন্যাস করিয়েছিলেন মুখ্যতঃ গীতা ও ভাগবতের সঙ্গে অপরাপর পুরাণ সংহিতার কোনও সিদ্ধান্তকে এখানে খণ্ডন না করে বর্ণাশ্রমাচার, স্বধর্মপালন, কর্মফল ত্যাগ, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি, জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেমভক্তি, পঞ্চরস, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রস এবং অপরাপর রস নিয়ে দ্বাদশটি রস, গোপী প্রেম, রাধাপ্রেম, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ও প্রেমঘটিত বিলাস উপস্থাপনা করা হ'ল। রায় রামানন্দ স্ব-রচিত 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' (ব্রজবুলি) পদটি গান করলে মহাপ্রভু শ্রীহস্তে তাঁর মুখ, আচ্ছাদিত করেন। এ-যেন, "যতো বাক্যং নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, এবং সাধন-ভজন কথা না কহিব যথা-তথা।

দাক্ষিণাত্যে রাস, নৃসিংহ, সিদ্ধবট ঈশ্বরস্বরূপের মন্দিরে যিনি প্রণাম প্রদক্ষিণ ও নর্তন কীর্তন করে সকলের অন্তরে প্রেম সঞ্চার করেন। তাঁকে যাঁরা দর্শন করেছে তাঁরাও কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হয়ে নর্তন-কীর্তন করেছেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি কৃষ্ণবেন্বা নদীতীরে পাঠরত ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থের নকল চাইয়া নেন। 'ব্রহ্মসংহিতা'ও এই সময়ে দাক্ষিণাত্য থেকে তিনি আহরণ করে এনেছিলেন। সম্প্রদায় প্রবর্তক বল্লভাচার্য এর গর্ব খর্ব করে তিনি বিচার যোগে তাঁকে বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের পথে আকৃষ্ট করেন। ভট্টমারীদের কাছ থেকে সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাসকে তিনি ছাড়িয়ে আনেন, গায়ের জোরে বা গালাগালি দিয়ে নয়, কুতর্ক-খণ্ডী বিচার বিতর্কের সাহায্যে। "হরি বলি বাহু তুলি প্রেম দৃষ্টে চায়। করিয়া কলুষনাশ প্রেমেতে ভাসায়।" দাক্ষিণাত্যে বেঙ্কটভট্ট, মতান্তরে তিরুমল্ল ভট্টের গৃহে শ্রীচৈতন্য চাতুর্মাস্য পালন করেন। এই সময়ে ভট্টপুত্র গোপাল তাঁর সেবা করেন। এই সেবাধিকারী বলেই পরে বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টে পরিণত হন। গোপালভট্টের পিতৃব্য ও দীক্ষাদাতা প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যচন্দ্রামৃত রচনা করেন। দাক্ষিণাত্যবাসী হয়েও প্রবোধানন্দ মহাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে নবদ্বীপ-পরিকরগুলির অনুরূপ ছিলেন। মহাপ্রভুর সাধ্য পর্যায়ক্রমে রাধাভাব ও কৃষ্ণভাব দুয়ের অভিব্যক্তি চৈতন্যচন্দ্রামৃত ছাড়া তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ মাধব, বৃন্দাবন মহিমামৃত। রাধারস সুধানিধি, আশ্চর্য রাম প্রবন্ধ। শ্রুতিস্তুতিঃ কামবীজ গায়ত্রী ব্যাখ্যা। গৌরসুধাকর চিত্রাষ্টক, গীতগোবিন্দব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে দেখানো হয়েছে। এই প্রবোধানন্দই কি কাশীর মায়াবাদী বেদান্ত সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী যিনি মহাপ্রভুকে বিদ্রূপ করতে এসে সদলবলে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন? এই অনুমান বিতর্কিত বিষয়। প্রবোধানন্দের গ্রন্থটিতে শ্রীখণ্ডের

নরহরি সরকার ঠাকুরের পল্লবিত 'গৌর-নাগর' ভাবের সমষ্টির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। মহাপ্রভুর প্রতি 'গৌরশ্চৌরঃ—জাতীয় বহু বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। আমাদের খ্যাতিমান ছাত্র বন্ধু অধ্যাপক ডঃ গৌরহরি গোস্বামী তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধে (প্রকাশিতব্য) নবদ্বীপ নীলাচল এবং বৃন্দাবন, তিনটি কেন্দ্রের পরিকরবৃন্দের শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গিতে সমমানসিকতা দেখিয়েছেন। স্বরূপদামোদরের রসরাগ-মহাভাব দুই এইরূপ' অনুভব তার শ্লোকে শ্লোকে বিদ্যমান। তেমন একটি শ্লোক এই।

"বিভ্রৎ কান্তিং কনকাম্ভোজ গর্ভাভিরাসং
একীভূতং বপুরবতু বো রাধায়া মাধবস্য।

দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে উৎকল নরপতি প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর কৃপাপ্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সার্বভৌমের মাধ্যমে মহারাজ মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আর্তি প্রকাশ করেন। নগর কীর্তনে যবে/মহাপ্রভু যায়।/ দীনভাবে মহারাজা পিছু পিছু ধায়॥/ নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী প্রতিপত্তিশালী রাজার প্রেরিত প্রবীণ ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বেশবাসের বিলাস, মাহুয়া বসন ধারণ ও অম্বল সেবা তিনি মেনে নিতেন। "আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধি ভেদপ্রভবাভবন্তি।"

সপ্তগ্রামের ভূস্বামীর বহু লক্ষ টাকা আয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস যখন বৈরাগ্য বুদ্ধি নিয়ে অদ্বৈতগৃহে মহাপ্রভুর পাদাশ্রয় ছুটে এসেছিলেন তখন বালককে ভাগিয়ে দিলেন তিনি এই বলে।

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥"

কিন্তু দুর্বার আর্তি নিয়ে সংসারশৃংখল ছেদন এবং ইন্দ্র সম ঐশ্চর্য অপ্সরাসম স্ত্রী পরিত্যাগ করে রঘুনাথ যখন নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন তখন সস্নেহে তাকে গ্রহণ করে উপদেশ দীক্ষাদানের জন্য স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করেন এবং অত বড় বৈরাগীকে দু' একটি মাত্র সাধারণ উপদেশ দিলেন। "ভাল না খাইবে আর ভাল না পারবে। গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে গ্রাম্যকথা না কহিবে।" এই সহজ সরল উপদেশ সভ্যতাদৃপ্ত আজকার বহির্মুখ মানুষের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। 'জিহ্বার লালচে লোক ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" শ্রমের মর্যাদাবোধ দিয়ে জীবন গীতাভাষ্যে পরিণত করেন। "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।" ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচামার্জনা কার্যে প্রতিযোগিতা করে তিনি সর্বাধিক ধান সঞ্চয় করতেন। বাহ্যভক্তির অভাব মানুষটি আচরণে শুচিতার যথার্থ আদর্শ রেখে গিয়েছেন। অশুচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হন নি। পরিকরদিগের পীড়াপীড়িতে তিনি নীলাচল ত্যাগের কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন। নানা কৌশলে সার্বভৌম মহারাজের আকাংক্ষাটি পূরণ করেন। সপরিবারে প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু বিরক্ত সন্ন্যাসী কখনও মহারাজের প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের সুযোগ গ্রহণ করেন নি, মহারাজের অনুগত রাজপুরুষ রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের রাজ কার্য ত্যাগ করে সর্বদা

মহাপ্রভুর নিবিড় সঙ্গ লাভ করতেন। রামানন্দের ভ্রাতা রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করার অপরাধে প্রতাপরুদ্রের নিকট থেকে প্রাণদণ্ডের আদেশ পান। পিতা ভবানন্দ ও অপরাপর ভাইয়েরা মহাপ্রভুর করুণাপ্রার্থী হন। কিন্তু কুসুম সুকোমল কুলিশকঠোর সন্ন্যাসী রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করে বিষয়ীর নিকট অনুরোধ জানাতে সম্মত হন নি। শেষে অবশ্য প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিকট ব্যাপারটির জন্য অনুনয় গিয়েছে জেনে দণ্ডিতকে ক্ষমা করেন। অদ্বৈতের অনুগত কোন ব্যক্তি অদ্বৈতের অর্থসঙ্কটে প্রতাপরুদ্রের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থের প্রত্যাশা নিয়ে লিপি প্রেরণ করেন। জানতে পেরে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শিখিমাহিতী ভগ্নী সেবিকা বৃদ্ধা মাধবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য সরু চাল সংগ্রহ করার অপরাধে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করেন। ভক্তদের সহস্র অনুনয়ে ও এমন প্রাণীক ভক্তবৎসল মানুষটি প্রকৃতি সমর্পণের অপরাধীকে পুনর্গ্রহণ করেন নাই। অনুশোচনায় হরিদাস প্রয়াগে স জল নিমজ্জনে প্রাণ দেন। হয়ত ভবভূতি বর্ণিত লোকোত্তর পুরুষের মহিমা এটি! অথচ রায় রামানন্দ কর্তৃক 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের গায়িকা ও অভিনেত্রী সেবাদাসীকে স্বহস্তে অঙ্গমার্জনা ও কাচ সজ্জা বিধানে মহাপ্রভু দোষ গ্রহণ করলেন না। মার্কস্ দর্শন অপেক্ষাও মহাপ্রভুর জীবনদর্শন এ-বিষয়ে কঠোর এবং সার্থকতর। ভাগবতের তিনি জীবন্ত বিগ্রহ। "যাবৎ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্বং হি দেহিনাম্। অধিকং যোদ ভিমন্যেত শাস্ত্রেন দণ্ড মহতি।" গৌরিব-নীতিগত মানে কিঞ্চন ও অকিঞ্চনের (Haves and Havenots এর) মধ্যে তিনি কোনও ভেদ করতেন না। ঐতিহাসিক বিবেকসম্পন্ন পদকর্তা গোবিন্দদাস ঠিকই বলেছেন।

"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা শিব-বিহি দুলহ প্রেমধন
দান কয়ল জগজনে॥"

আগেই বলা হয়েছে, কৃষ্ণস্মৃতি-বিজড়িত বৃন্দাবনের লুপ্ত মহিমার পুনরুদ্ধার এবং কুতর্ক-কর্কশ পাণ্ডিত্যাভিমানের যুগে ভক্তিশাস্ত্র রচনা ও প্রচার মহাপ্রভুর অতি প্রিয় কার্য। মায়ের আদেশে তাঁকে নীলাচলে থাকতে হ'ল, যাতে বাংলার রথযাত্রা দর্শনাভিলাসী তীর্থযাত্রীদের কাছে তিনি সন্ন্যাসী সন্তানের সংবাদ পেতে পারেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী। দক্ষিণ পর্যটন শ্রান্ত-শীর্ণ বৃন্দাবন যাত্রীকে উপদ্রবের এলাকা এড়িয়ে সহজ পথে যাবার জন্য সার্বভৌম প্রতাপরুদ্র প্রমুখ ভক্তগণ অনুরোধ করেন। উত্তরে মহাপ্রভু বলেন।

নশদেশে আছে মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই মহাশয়॥

শচীমায়ের পাদবন্দনা করে গঙ্গাতীর ধরে তিনি বৃন্দাবনের পথে চলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তিনি আর দর্শন দেনান। কিন্তু মায়ের কথা স্বতন্ত্র। প্রতি বৎসর জগদানন্দ ঠাকুরকে তিনি প্রাণস্পর্শী বার্তা সহ নবদ্বীপে মায়ের কাছে পাঠাতেন। নীলাচলবাসী দামোদর নির্ভয়ে তাঁকে বাক্যদণ্ড দিয়েছিলেন। এক সুন্দরী বিধবার শিশুপুত্র গম্ভীরায় তাঁর কাছে এলে তিনি তাকে বিশেষ আদর স্নেহ প্রকাশ করতেন। দামোদর কঠোর বাক্যদণ্ড

দিয়ে লোকনিন্দার সম্ভাবনা দেখিয়ে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। মহাপ্রভু তাঁর লোকাপেক্ষা ও সত্যানুরক্তিতে প্রীত হয়ে তাঁকে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নবদ্বীপে পাঠান। মায়ের আদেশে নীলাচলে বন্দী সন্ন্যাসি-পুত্র রূপসনাতনের উপর তাঁর অতিপ্রিয় কর্তব্যের ভার অর্পণ করে বৃন্দাবন পাঠিয়েছিলেন।

বাদশাহ হোসেন শাহের রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দুই ভাই, পদানুযায়ী ইসলামী নামে পরিচিত দবির খাস ও সাকর মালক কর্ণাটক হতে আগত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যশোহর ও বাখরগঞ্জ জেলার সঙ্গে তাঁদের বসতির সংস্রব ছিল। মালদহের রামকেলিতে বাস করে তাঁরা বাদশাহের রাজকার্য করতেন। এই সময় বৃন্দাবনের পথে মহাপ্রভু রামকেলিতে উপস্থিত হ'লেন। দেবনিন্দিততনু প্রেমিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিপুল জনসংঘট্ট। প্রাসাদশীর্ষ থেকে দেখে বাদশাহ মন্ত্রী-ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর নিরাপত্তার জন্য শঙ্কাতুর হয়ে তাঁরা বুঝাতে চেষ্টা করলেন, সাধারণ হিন্দু সন্ন্যাসী, সঙ্গে অজ্ঞ জনতা। সুচতুর বাদশাহ বললেন, আমি বেতন না দিলে কর্মচারীরা কর্মত্যাগ করে আর বিনা স্বার্থে এই বিপুল জননিবহ যাঁর সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত সে নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তি। ভাইয়েরা পূর্বেই ধর্মানুরাগী, বৈরাগ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা গোপনে মহাপ্রভুকে স্থানত্যাগের অনুনয় জানালেন। সেবারে মহাপ্রভু আর অগ্রসর না হয়ে নীলাচলে ফিরে গেলেন। পরের বার তিনি বৃন্দাবনে উপনীত হয়ে মথুরা-বৃন্দাবনের অগণিত তীর্থসমূহ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করে নর্তন কীর্তনে প্রেমের প্লাবন বহিয়ে দেন। ধানের খেত, কুণ্ড ও ছোট পাহাড়ের অঙ্কদেশে লুক্কায়িত গোকুল-বৃন্দাবন জেগে উঠল। পরে প্রখ্যাত ষড় গোস্বামীর প্রভাবে কতকটা মোগল রাজশক্তির ঔদার্যে ও বদান্যতায় মঠমন্দির মাথা তুলল। সংস্কৃতে নিখিল ভারতীয় প্রচারের জন্য অগণিত শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হ'ল।

দবির খাস ও সাকর মালিক দুই ভাইয়ের মধ্যে মহাপ্রভুর দর্শন ও সংস্পর্শে ভস্মাচ্ছন্ন পাবকের মতো বৈরাগ্যবহ্নি জ্বলে উঠল। দবিরখাস আগে গৃহত্যাগ করলেন। তাঁর সন্ন্যাসের উপলক্ষ্য সম্পর্কে বৈষ্ণব চরিতাখ্যানের বাহিরে একাধিক কাহিনী প্রচারিত আছে। তিনি দূর থেকে অগ্রজ সাকর মল্লিককে লিপিযোগে বার্তা পাঠান। "যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী/রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা। / ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্মনঃ স্থিরং/ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥/অগ্রজ অসুস্থতার ভাণে রাজকার্যে অনুপস্থিত হতে লাগলেন। হুশেন বাদশাহ অতর্কিতে তাঁর গৃহে গিয়ে দেখেন, ভক্ত পণ্ডিতদের সাহচর্যে তিনি ভাগবত-চর্চা করছেন। উৎকল আক্রমণে পরামর্শদাতা রূপে তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলে তিনি জানালেন, বাদশাহের দেব মন্দির ধ্বংসের অভিযানে তিনি যোগ দেবেন না। তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে তিনি পলায়ন করলেন। আত্মীয়স্বজন দীনদরিদ্র ও দেবদ্বিজকে অর্জিত বিপুল অর্থ দান করে সামান্য কিছু অর্থ সঙ্গে নিয়ে তিনি পদব্রজে বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হ'লেন। সেই অর্থের জন্য পথে নানা বিঘ্নবিপত্তি দেখা দেয়। শেষপর্যন্ত কপর্দকশূন্য হয়ে তিনি কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। গায়ে একখানি শীতত্রাণ ভোটকম্বল মাত্র ছিল। ভোটকম্বলের পানে প্রভু বারে বারে চায়।" সেখানিও একজন ভিখিরিকে দিয়ে তাঁর ছিন্ন কন্থা বিনিময় করে মহাপ্রভুর প্রসন্নদৃষ্টির সম্মুখীন হলেন। মহাবৈরাগীর ঐশ্বর্যের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়ে কণ্ডুরোগগ্রস্ত ভক্তবীরকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। কাশীতে সনাতনের

আর্তিভরা প্রশ্ন "কেবা আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।" 'সনাতন-শিক্ষা'য় অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে মহাপ্রভুর-দেওয়া এর অতি বিস্তৃত উত্তর। সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব-সংবলিত ভক্তিবিজ্ঞানের অপূর্ব বিশ্লেষণ: কৃষ্ণ-সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন। গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিস্কর্ষ বিষয়ে উপাদিষ্ট হয়ে সনাতন প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে ভক্তিভজন-ও ভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রয়াগে রূপের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হয়। রূপকেও ভক্তিদর্শন ও রসতত্ত্ব সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশ দেন। এই শিক্ষার ফল ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি এবং রূপের সংস্কৃতে রচিত অজস্র গ্রন্থসম্ভার। রূপও চৈতন্যচিন্তন ও অজস্র ভক্তিগ্রন্থ রচনা করে বৃন্দাবনের ভাবজাগৃতি ত্বরান্বিত করেন। রূপসনাতনের নাম দুটি মহাপ্রভুর দেওয়া। তাঁদের অনুজ অকালে লোকান্তরিত বল্লভ-অনুপমের পুত্র জীব ছাড়া বৃন্দাবনের ছয় গোঁসাইয়ের আর পাঁচজন মহাপ্রভুর হাতে গড়া। "শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥" মহাপ্রভুর দিব্য জীবন, প্রেমোন্মাদ, অশ্রুপুলককম্পের প্রভাব তাঁর সবটুকু নয়। তৎকালের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ সর্বশাস্ত্রপারঙ্গমদের সঙ্গে বিচার ও ভাববিনিময়কে তাঁর অধ্যাত্ম বিজয়ের শাণিত অস্ত্ররূপে ধরা যেতে পারে। কেশবকাশ্মীরীর পরাজয়, বাসুদেব সার্বভৌমের সহিত বেদান্ত-বিচার, রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাব বিনিময়, দাক্ষিণাত্যের বল্লভাচার্য ও অপরাপর সম্প্রদায়ীদের সঙ্গে ভক্তিবিচার, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্ত-বিচার, বিস্তৃত সনাতন শিক্ষা, সংক্ষিপ্ত রূপোপদেশ। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ। ভাগবতের এই শ্লোকের অশেষবিধ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত সনাতনের চমৎকৃতির সঞ্চার করেন। মহাপ্রভুর শিক্ষাপুষ্ট হয়েই সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃত ও ভাগবতের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষনী টীকা রচনা করেন। মহাপ্রভুর সঙ্কেতিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে উপাদিষ্ট না হলেও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ষট্সন্দর্ভ ও সর্বসম্পাদনীতে এই তত্ত্ব পল্লবিত করে গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস সনাতন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর যুগ্ম গ্রন্থ কর্তৃত্বে রচিত হয়। এই গ্রন্থকটির বিশেষ মূল্য এই যে, এতে মহাপ্রভুর বিশ্বোদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মহাপ্রভুর প্রাণ মারুতে পূর্ণ মঙ্গল শঙ্খের নির্ঘোষের মতো রূপ সনাতন ও জীবের গ্রন্থ-রাজি, নিখিল ভারতীয় ভক্তির আকাশে বেজে উঠেছিল। গোড়ীয় বৈষ্ণবের রাগানুগা সাধনভক্তি রূপানুগা বলেও অভিহিত হয়ে থাকে। মহাপ্রভুর রূপসনাতন ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি গম্ভীর স্নেহপ্রীতি ও প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বৃন্দাবন-প্রত্যাগত প্রতিভক্তকে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন।

" কহ তাঁরা কৈছে রহে রূপসনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণের ভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেত দুহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগপরিহরি॥

করোয়ামাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্তন উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্তন প্রেমে সেহো নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্যচিন্তন ॥"

সংস্কৃতে রচিত বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পঞ্জী পরিচয় আমাদের Asiatic Society'র প্রকাশিত Dr. Bimanbihari Majumdar Memorial Lectures 'Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya' গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিয়েছি।

আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন তার ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি ও ধর্মান্তরীকরণের আগ্রহ পরিত্যাগ করেছিল শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের উদার সমন্বয় শক্তির প্রভাবে। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে আবু মুজঃফর ফতে শাহ গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৪৮১-৮৭)। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালের বেশির ভাগে গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন ইতিহাস বিশ্রুত সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজঃফর হুশেন শাহ (১৪৯৪-১৫২৫)। মহাপ্রভুর প্রকট জীবনের বাকি কটি বৎসর সিংহাসনে ছিলেন হুশেন পুত্র নাশিরা শাহ বা নাসিরুদ্দিন আবুল-মুজঃফর নশরৎ শাহ (১৫২৫-১৫৩৩)। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ সংঘটন হয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পানিপথ ক্ষেত্রে। বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এর অত্যল্পকাল পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুন ও শেরশাহের সংগ্রামে গৌড়ের বাদশাহকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। রাজনৈতিক এই ঝঞ্ঝাবর্তের মুহূর্তে শ্রীরাধার ভাবকান্তিময় এক মুণ্ডিতশীর্ষ নামগানরত বাঙালী সন্ন্যাসীর গৌড়বঙ্গ উৎকল দাক্ষিণাত্য ও মথুরাবৃন্দাবনের পথে গতাগতি চলত। বৈষ্ণবচরিত গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর পরিকরবৃন্দ পথে মহাপ্রভুর নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। দু'একবার মহাপ্রভু অশ্বারোহী তুরুক সওয়ারের মুখোমুখী হয়ে পড়েছেন। তাঁর নিজের প্রেমস্নিগ্ধ নির্ভীক ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্বলের প্রভাবে ভিন্নধর্মাবলম্বী রাজপুরুষ কোনও অনিষ্টাচরণ করেন নি। বরং তার উদার মতে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছেন। বিজলী খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও ইসলাম ধর্মে প্রেমধর্মের গৌরব মহিমা প্রদর্শন করে মহাপ্রভু তাঁকে নির্বৈর ও গুণানুরাগী করে তুলেছিলেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণবীয় সাধন ভজন, শাস্ত্রালোচনা, ভক্তিগ্রন্থপ্রণয়ন, তীর্থপরিক্রমা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববিনিময়, বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিতাখ্যান-রচনা, কীর্তনসঙ্গীতের উদ্ভব ও বিস্তার—বৈষ্ণবসংস্কৃতির সমস্ত বৈভবই মুসলমান শাসনকালে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এর কিয়ৎকাল পরেই মোগলকুলসূর্য আকবর বাদশাহের সামরিক প্রতিভা ও সুশাসনে এবং উদার সমন্বয়দৃষ্টির ফলে ভারতের রাজনীতিক আবহে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এল। আমরা বহুদিন ধরে বলছি, আকবর বাদশাহের দীন এলাহির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতির কোথাও একটি অনাবিষ্কৃত যোগসূত্র রয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির মানসিংহের ব্যয়ে নির্মিত হয়, গ্রাউজ তাঁর মথুরার ইতিহাসে বলেছেন। ষোড়শ শতকের ৪র্থ পাদে কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম মানসিংহের পরিচয়ে বলেছেন, "ধন্য রাজা মানসিংহ/বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ

গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। আকবরের দরবারের গায়ক মিঞা তানসেনের গীতগুরু বৃন্দাবনের ভজনশীল বৈষ্ণব ছিলেন যিনি 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' দুনিয়ার বাদশাহের আসরে গাইতে আসবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

নবদ্বীপে কীর্তননিরোধকারী কাজীদলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইংরেজ শাসনকালে প্রগতি ও আন্তর্জাতিকতার যুগে আমরা মসজিদের কাছে গীতবাদ্য বিষয়ে হিন্দুমুসলমান এক মত হতে না পেরে ভারত দ্বিখণ্ডিত করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যখন মুসলমান তখন মহাপ্রভুর প্রেমস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের ফলে শক্তিধর কাজী কীর্তননিষেধের আদেশ প্রত্যাহার করেন। মুসলমান শাসিত সারা বাংলা মৃদঙ্গের ঝংকার ও কীর্তনের রোলে নিনাদিত হয়ে উঠেছিল। কীর্তনশিল্পের সঙ্গে বাদিত্র ও নৃত্যশিল্পেরও এই সময়ে বিশেষ উৎকর্ষলাভ ঘটেছিল। মহাপ্রভু নিজে নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রমুখ ভক্ত স্বকীয় বিশিষ্ট নৃত্য-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করা কীর্তনের আগু ও পিছু এবং বেড়াকীর্তনে রথযাত্রায় নৃত্য করতেন। এই নৃত্যভঙ্গীর ভাগবতীয় আবেশ বর্তমান নৃত্যগীত অভিনয়ে দেখা যায় না। জোড়ে জোড়ে লাফ, উদ্দণ্ড নৃত্য, ধীরললিত ছন্দে নৃত্য, মৃদঙ্গীর নৃত্য, নৃত্যের কত বিচিত্রভঙ্গি।

মহাত্মাজী ভারতের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে ঘোর সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের দিনে বাংলার পূর্বপ্রান্তে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে বসে রামধুন গীত গান করেছিলেন, "ঈশ্বর আল্লা তেরি নাম। সব-কো সম্মতি দে ভগবান।" সে আহ্বান আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সাড়া জাগায়নি। ঋগ্বেদের যুগ থেকে

"ওঁ আদস্য জানন্তো নাম বিদ্বিবিক্তন্ মহস্তে সুমতিং ভজামহে।"

যে নামমন্ত্র চলে আসছে, হরিভক্তিবিলাসের প্রভাসখণ্ডে তার বিশ্বাস বলিষ্ঠ প্রকাশরূপ নিয়েছিল।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্,
সকৃদপি পাঠগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।"

এই নামমন্ত্র মহাপ্রভুর শক্তিতে সংস্কৃতি-সংঘর্ষের তাণ্ডব প্রশমিত করে সহযোগিতাময় সামঞ্জস্যপূর্ণ নবতর সমাজসংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। তার সমগ্র ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি।

মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মে আঘাত হেনেছিলেন, জাতিভেদ-প্রথা তুলে দিয়েছিলেন অথবা সন্ন্যাস বা একান্ত বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, এর কোনটিই ঠিক নয়। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। অন্তরঙ্গ চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে ক'জন মাত্র সন্ন্যাসী, বেশির ভাগই গৃহী। পুরুষোত্তম আচার্য ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বরূপদামোদরে পরিণত হয়েছিলেন। অদ্বৈত গৃহী। নিত্যানন্দ প্রভুকে গৃহী হয়ে প্রেমপ্রচারে বাধ্য করে তিনি গৌড়বাসীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। গোবিন্দদাসের ঐতিহাসিক বিবেক এ-কথায় স্বীকৃতি দিয়েছেন, "বরণ আশ্রম/ কিঞ্চন অকিঞ্চন/ কারো কোন দোষ নাহি মানে।/ কমলা শিব বিহি/ দুলহ প্রেমধন/ দান কয়ল জগজনে।"/ শ্রীচৈতন্যের পরিকরদিগের মধ্যে একটিও অসবর্ণ বিবাহ হয়নি। তিনি গয়ার পথে পীড়িত হয়ে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করেন। তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর শাসনাধীন রূপসনাতনেরও "বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।" অথচ তিনি উচ্ছিষ্টসেবী ভক্ত কালিদাসের প্রশংসায় মুখর। কঠোর বৈরাগী রঘুনাথদাসের ভক্ষ্য গাভী-পরিত্যক্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রসাদী অন্ন কেড়ে খেয়েছিলেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পূর্বে সার্বভৌমের সঙ্গে তিনি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতেন। আসল কথা, জাতিকুল শাস্ত্র বিদ্যা কোনটির উপর জোর না দিয়ে তিনি

সত্যানুরাগ ও নিষ্কলুষ প্রেমময় জীবনের উপর জোর দিয়েছিলেন। ভগবৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধী সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি।

"কেবা বিপ্র কেবা শূদ্রন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

ভক্তভাব অঙ্গীকার করে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন ;

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রোবা
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি নো' বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানান্দমমৃতে'
গোপীভর্তুঃ পদকমলয়ো দাসদাসানুদাসঃ॥"

শ্রেণীসংগ্রাম জাগিয়ে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের পথে তিনি নেতৃত্ব দেন নি। অদোষদর্শী হয়ে তিনি সর্বপ্রীতি ও সর্বসেবার আওতায় মানুষের জীবন গড়তে চেয়েছিলেন।

"গড়ন ভাঙিতে পারে কত আছে খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

তাঁর অনন্ত অপরিমিত আশা;

"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

ভবিষ্যতের দূরদিগন্তে সেই সম্ভাবনার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে কি? বিশ্ববেদনার পথ বেয়ে বিশ্বসঙ্কটমোচনের শ্রেয়ঃ দেখা দেবে। আজকার নানামুখী বিশ্ববিদ্যার ব্যর্থতার দিনে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের অপূর্ব কবিভাষায় 'বিদ্যাবধূজীবন' 'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্' অবলম্বন করে কুণ্ঠিতা ব্রীড়ানম্রা সেবাহীনা বিধ্যাবধূকে সৌভাগ্যবতী করে তুলতে হবে। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

শিক্ষাষ্টকের সার্থকতা কবিরাজ গোস্বামী সুন্দর পয়ারে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান জীবনের সঙ্গে তাকে যাচাই করে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। এ-সম্বন্ধে একখানি সমগ্র সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। সর্বজনশ্রুত একটি শ্লোকের উল্লেখ করব।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ হতে সুনীচ, তরু হতে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হয়ে হরিনাম করতে হবে। পদ্ম-পুরাণের বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন ভক্তিকথামৃত-সিন্ধুতে শ্রীরূপ উল্লেখ করেছেন।

"নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাদ্ নামনামিনঃ॥"

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ/ভজ নিষ্ঠা করি।/নামের সহিত আছেন/আপনি শ্রীহরি॥/নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি।" কিন্তু নামকীর্তন করতে হবে তৃণাদপি শ্লোকের অনুসরণে। এই শ্লোকের মর্ম দিতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, "উত্তম হইয়া বৈষ্ণব/হবে নিরভিমান/জীবে সম্মান দিবে/জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥" এই দৈন্য বিনয় নিয়ে একালের মানুষ বিদ্রূপ করেন। তাঁরা বলেন, এতখানি দৈন্যবিনয় আত্মমর্যাদাবোধ ও সত্যানুরাগের পরিপন্থী। নীতিবিজ্ঞানের মানে কথাটি যাচাই করলে দেখা যাবে Humility is perfectly consistent with self-respect and veracity. দৈন্যবিনয় অবলম্বন সত্যানুরাগের ও যথার্থ আত্মমর্যাদার পরিচায়ক। আত্মবিচারণায় অভ্যস্ত হ'লে বোঝা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে

বর্তমান মুহূর্তের আমি কত নৈতিক দুর্বলতার আকর। আমার প্রকৃত মর্যাদাবোধ জাগলে দেখা যাবে ভাবী সম্ভাবনাময় 'আমি'কে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করে তুলতে হলে দৈন্যবিনয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রথম ও প্রধান সোপান। আমাদের জ্ঞানের অভিমান কত অসার। কবি কালিদাস রঘুবংশের আদিতে বিনয়প্রকাশ করে বলেছেন, "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্, প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের আবিষ্কর্তা নিউটন বলেছিলেন, জ্ঞানমহার্ণবের তীরে তিনি উপলখণ্ড সংগ্রহ করছেন, সম্মুখে অপার অমেয় জ্ঞানসিন্ধু প্রসারিত। শ্রীরূপসনাতন, হরিদাসঠাকুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব দৈন্যবিনয়ের মূর্ত বিগ্রহ। শাস্ত্র আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দেখাতে দিয়ে ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষের উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপ্রণাম মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধ পরিহার করে আমরা সাধারণতঃ "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" উচ্চারণ করি। বৈদান্তিক অনুভব মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সমর্থন করে না। "পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরিঃ।" কিন্তু এই মন্ত্রার্ধের প্রতিপাদ্য সাধারণ বুদ্ধিতেও ধরা দেয়। 'পাপোঽহম্' সত্যিই আমার কত স্খলন পতন ত্রুটি, অন্তরে কত দুর্বাসনা। 'পাপকর্মাহম্'—আচরণে আমি কত অন্যায় করি, sinful in essence না হ'লেও sinful in deed. রূপগোস্বামী একে 'পাপবীজ' বলেছেন। 'পাপাত্মা' – আমার পাপপ্রবণতা কৃপাব্যতীত অনপনেয়। পাপসম্ভবঃ—born of sin. পিতৃপুরুষের দেহমনের দুর্বলতার অপরিহার্যভাবে আমি উত্তরাধিকারী। এটা পিতৃপুরুষের প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি পোষণ করে মানবিক সত্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়। সুতরাং 'ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরিঃ' বলে শরণাগতি ছাড়া উপায় নেই। বৈষ্ণবীয় দীনতা হীনম্মন্যতা নয়। মহপ্রভুর বাহ্য আচরণে এই কঠোর আত্মসমীক্ষা প্রসূত দীনতার অব্যভিচারী প্রকাশ দেখা যায়। অন্তরে রাধাভাবের দিব্যোন্মাদ, বাইরে ভক্তভাবের অপরাজেয় দৈন্যবিনয়।

বৈষ্ণব চারিত্র-নীতিতে অপরাধের পরিকল্পনা নিয়ে একালের মানুষ যে পরিহাস করেন সেটি ভাবনাবিমুখ লঘুচিত্ততার পরিচায়ক। বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ, নামাপরাধ, ও তার প্রতিকার হরিভক্তিবিলাসে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিটি অপরাধের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নিষ্ঠা, সুরুচি সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির বিরোধী আলস্য, উপেক্ষা, সৌজন্যের অভাব প্রভৃতি হতে উৎপন্ন এই সমস্ত অপরাধ। মহাপ্রভু শচীমাতার অদ্বৈতাচার্যের প্রতি বৈষ্ণবাপরাধ ভুলতে পারেন নি। মায়ের সে অপরাধ খণ্ডন করতে গিয়ে তাঁকে তিনি ভক্তিসম্পদ দান করেন। অপরাধ-কলুষিত চিত্তে প্রেমভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

চৈতন্যযুগের অবসান ঘটেছে, কথাটি ঠিক নয়। 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোররায়।' নব্যভারতের নির্মাতা রাজা রামমোহন রায় ধর্মজিজ্ঞাসা নিয়ে গোস্বামীর সহিত বিচার এবং অপরাপর ধর্মের আচার্যের সঙ্গে বিচারবিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন। আমাদের মনে হয়, মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণব দার্শনিক-কেশরী শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত যদি কালের ব্যবধানে আবির্ভূত ব্রহ্মপন্থী রামমোহনের সাক্ষাৎকার ও ভাববিনিময় হত তবে রামমোহন ভজনশীল ভক্তির সরণিতে আকৃষ্ট হতেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পৌরুষ ও পরদুঃখকাতরতার একত্র সমাবেশ, তাঁর স্বল্পভাষিতার সঙ্গে সৌজন্য ও বিনয়ের একত্বতা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তাঁর সরস দৈন্যবিনয়পূর্ণ আচরণ বৈষ্ণবপ্রবণতা জাত। মেঘমন্দ্রে রচিত মেঘনাদবধের কবির মহাকাব্যের গীতাত্মকতা এবং মধুচক্রের মধুমত্তার অন্যতম উৎস

তাঁর জাতীয়ভাবের অন্তর্নিহিত বৈষ্ণবপ্রবণতা। ঋষি বঙ্কিমের শক্তি ও ভক্তির সমন্বয়, তাঁর সিদ্ধান্তবচন 'প্রীতিই ঈশ্বর', এমন কি সন্ন্যাসী সন্তানগণের সমরসংগীত বৈষ্ণবপ্রভাব জাত। যে-দেশে চৈতন্যের মতো ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-দেশের ভাবনা কি? বঙ্কিমের এই উপলব্ধি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়সে ভানুসিংহের ছদ্মনামে পদাবলী রচনা করেছিলেন, ভণিতায় প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, জয় জয় রাধা/জয় জয় মাধব/ চরণে প্রণত ভানু।" "রয়েছো তুমি/একথা কবে/জীবন মাঝে সহজ হবে/আপনি কবে/তোমারি নাম/ধ্বনিবে সব কাজে।" এর সঙ্গে বৈষ্ণবীয় নাম-নামীর অভিন্নতা মিলিয়ে নেওয়া যায় না কি? সুদূর অতীতের বেদবাণীতে ব্রজবৃত্তান্ত, ভূরিশৃঙ্গ বোধনের বার্তা ঋক্-পরিশিষ্টে রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। আমাদের কালপ্রান্তে বিশ্বকবির

"এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে,
কোথায় বসে বাজাও বেণু চরাও মহাগগনতলে।"

* * * * *

মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে?
মাঝখানে, মহাপ্রভুর "কৃষ্ণবর্ণ" শিশু এক মুরলী বাজায়।"

তিরোধানের পূর্বে গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদের কাহিনী বড় করুণ। কৃষ্ণবিরহে শীর্ণ বিনিদ্র সন্ন্যাসী ভিত্তিমৃত্তিকায় মুখঘর্ষণ করে শোণিতাপ্লুত হতেন। এই অবস্থায় তাঁর হস্তপদ দীর্ঘ ও অস্থিগ্রন্থিসমূহ চিতাগ্নিপ্রমাণ শিথিল হয়ে যেত। কখনও হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁর দেহ কূর্মাকৃতি হয়ে যেত। এমন অবস্থা প্রহরি-পরিকরদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বাইরে চলে যেতেন। একবার তাঁকে পাওয়া যায় জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারে গাভীদের মধ্যে অচেতন অবস্থায়। আর একবার কৃষ্ণান্বেষণে তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জেলেরা অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সঙ্গীদের হাতে দেয়। দেবমানবের দিব্যোন্মাদের নিবিড় এই দশাগুলি দিব্য জীবনচেতনার ফল। এই অবস্থার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলির অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আস্বাদন।

মহাপ্রভু আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পরতে পরতে আজও কাজ করে চলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশপ্রাণতার উন্মাদনাময় আবেশে মানস-প্রত্যক্ষ করেছিলেন, নদীয়ার পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায় যে মানুষটি তাকে। ব্রহ্মপন্থী রবীন্দ্র-পার্ষদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গর্বভরে মহাপ্রভুকে আত্মসাৎ করে বলেছিলেন, "ঘরের ছেলের চোখেতে দেখেছি বিশ্ব-ভূপের ছায়া। বাঙালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" অক্ষয়কুমার বড়াল 'ষড়ৈশ্বর্যময়ী' জননী বঙ্গভূমির বর্ণনায় 'চণ্ডীদাস-গীতি শ্রীচৈতন্যপ্রীতি' আবাহন করেছিলেন। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদাতা দীনেশচন্দ্র সেন মহাপ্রভুকে অন্তরে রেখে বলেছিলেন, "প্রেম একবার মাত্র পৃথিবীতে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল, সে আমাদের এই বঙ্গদেশে"। বৃন্দাবনের শ্রীল রাধারমণ-চরণদাস বাবাজী ও তাঁর আশ্রিত শ্রীল রামদাস বাবাজীর গৌরাঙ্গ ভজন এ-কালকে স্পর্শ করেছে। মহাপ্রভুর প্রিয় ভাগবত পাঠক রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের বরাহনগর পাঠবাড়ীতে সংরক্ষিত মূল্যবান পুঁথিশালা বাবাজী মহারাজ আগলিয়ে রক্ষা করে গিয়েছেন। প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয় ভজনে, পাঠে, বক্তৃতায় এবং 'গৌরাঙ্গ' পত্রিকা প্রকাশে অনলস গৌরানুশীলন করে গিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও সেবাধিকারীরা ভজন প্রচার ও গ্রন্থ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর মহিমা খ্যাপন করে চলেছেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ ও

চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটুটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ চৈতন্যচিন্তনের নূতন সরণি উন্মুক্ত করেছেন। নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরে সাধনভজনব্রতী বিদগ্ধ সন্ন্যাসী হরিদাস দাস তাঁর পরিমিত আয়ুষ্কালে বহুগ্রন্থ রচনায় ও সম্পাদনে বৈষ্ণব সাহিত্যেতিহাসের বহু অধ্যায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, সতীশচন্দ্র রায় বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন ও আলোচনার মাধ্যমে গৌরমহিমার খ্যাপন করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে গৌরকথার লোকায়তপ্রসার সাধন করে গিয়েছেন। কবি কালিদাস রায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের কবিতায় গৌরানুগত্য ও তুলসীচন্দনের সৌরভ পাওয়া যায়। সর্বশেষে রাধাগোবিন্দনাথ মহোদয়ের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অতন্দ্রিত অস্খলিত বৈষ্ণবভজন ও বৈষ্ণবগ্রন্থসম্পাদন ও গৌরাঙ্গবিষয়ক মৌলিক গ্রন্থরচনা আমাদের যুগের গৌর মানসিকতার বিজয়বৈজয়ন্তী। সাধনা প্রকাশনীর দেবদাস নাথ মহাশয় নিঃস্বার্থ আদর্শানুরাগ নিয়ে এই বিপুল গ্রন্থসম্ভার প্রকাশিত করে চলেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শেষজীবনে বক্তৃতাশ্রান্ত ভাঙা গলায় আবৃত্তি করতেন নিমাইসন্ন্যাসের প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তার করুণার কলরোলে মিশ্রিত আর্তনাদ,

"হ্যাদেরে নদীয়াবাসী কার পানে চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥

মহাপ্রভু 'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে" বলে নীলাচলের দিকে ছুটেছিলেন। শ্রীরূপ আর্তিভরে স্তবে বলেছিলেন, "স চৈতন্যঃ কিং মে দৃশোর্যাস্যতি পদম্।" আমরাও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'একটি নমস্কারে' সমগ্র সত্তা নুইয়ে দিয়ে গৌরপ্রণাম করি।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত রাধাগোবিন্দ স্মারক বক্তৃতা, ১৩৮৭)

বঙ্গাল-বাণী

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮ সংখ্যায় ইতিহাসের বহুশ্রুত প্রবীণ অধ্যাপক শ্রী দিনেশচন্দ্র সরকারের 'বঙ্গাল-বাণী' শীর্ষক আড়াই পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি প্রভূত কৌতূহল নিয়ে পড়ে কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ করেছি।

প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হলেও পরিষৎ-পত্রিকার পুরোভাগে স্থান পাওয়ায় গুরুত্ব লাভ করেছে। বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ; তাছাড়া লোকান্তরিত আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এবং প্রবন্ধকার স্বয়ং এই প্রবন্ধের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় রচনাটির গুরুত্ব বেড়েছে।

সংক্ষেপে সমস্যাটি হল: বঙ্গাল কোনো কবির ব্যক্তিনাম কিনা, এবং 'বঙ্গাল-বাণী'র অর্থ উক্ত কবির রচনা না সাধারণভাবে বঙ্গবাণী।

প্রবন্ধের শুরুতেই তর্কবিশারদ-পণ্ডিতোচিত একটি সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে। অধ্যাপক সরকার লিখেছেন, "সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের (২য় সংস্করণ, ১৯৪৮) আখ্যাপত্রের ঊর্ধ্বভাগে নিম্নের শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ ॥ আর্যা ॥"

আমরা 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণ খুলে দেখলাম শ্লোকটি যথাকথিত স্থানে উদ্ধৃত আছে, কিন্তু শ্লোকান্তে 'আর্যা' শব্দটি নেই। ওটি অধ্যাপক সরকারের যোজনা। এই যোজনার একটি নিগূঢ় কারণ আছে। অধ্যাপক সরকার লিখেছেন "উদ্ধৃতিতে একটু ভুল থাকায় ছন্দোভঙ্গ হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষাংশের প্রকৃত পাঠ 'গঙ্গা চ বঙ্গাল বাণী চ', ভুলবশতঃ গঙ্গার পরবর্তী 'চ' শব্দটি বাদ পড়েছে।"

'প্রকৃত পাঠ'টি অধ্যাপক সরকার কোথায় পেলেন? আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সদুক্তি-কর্ণামৃতের দুটি মুদ্রিত সংস্করণ আছে। একটি রামাবতার শর্মা-সম্পাদিত। ১৯৩৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত। অপরটি অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি-সম্পাদিত। ১৯৬৫ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। রামাবতার শর্মার অবলম্বন ছিল একটিমাত্র পুথি। অধ্যাপক ব্যানার্জির মতে শর্মা-সম্পাদিত সংস্করণটি নানাবিধ ভুলে ভরা, তাঁর ভাষায়, 'bristles with wrong and corrupt readings...'। অধ্যাপক ব্যানার্জি একাধিক পুথি মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করেছেন। [এ সম্পর্কে অধ্যাপক এস কে দে'র 'পুরোভাষ' এবং সম্পাদকের 'প্রাক্‌কথন' ও 'ভূমিকা'তে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।] অধ্যাপক ব্যানার্জির সংস্করণে উক্ত শ্লোকের পাঠে আছে 'গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ'। বলাই বাহুল্য, গঙ্গা ও বঙ্গাল-বাণীর মধ্যে 'চ' না দেওয়ায় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। একথা সকলেরই জানা আছে আর্যা ছন্দের শেষ পাদে হবে পনেরো মাত্রা। কিন্তু মাত্রা গুণে গুণে পদ্য লেখা যায়, কাব্য লিখতে হলে নিরঙ্কুশ কবিপ্রতিভা চাই। আলোচ্য শ্লোকার্ধে তিন 'চ'-এর ব্যবহার শ্রুতিকটু, রসিকজনকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'গঙ্গা চ বঙ্গাল-বাণী চ'র বদলে 'গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ' অনেক শ্রুতিমধুর। উপরন্তু, কৌতূহলী পাঠক ব্যানার্জি-সম্পাদিত সদুক্তিকর্ণামৃতের ছন্দ-সূচীর পৃষ্ঠাগুলি নিরীক্ষণ করলেই দেখতে পাবেন ওই সংকলনে আর্যা ছন্দের বাহাত্তরটি শ্লোক আছে। তার কয়েকটির শেষ পাদে পনেরো মাত্রার বদলে আছে চৌদ্দ মাত্রা। বঙ্গাল-বাণী শ্লোকটির ক্রমিক সংখ্যা হল ২১৫২। তার পরবর্তী শ্লোকও আর্যা ছন্দেই রচিত। তারও

শেষ পাদে আছে চৌদ্দ মাত্রা। শ্লোকের শেষে একমাত্রিক বর্ণকে দ্বিমাত্রিক গণ্য করা সংস্কৃত ছন্দ-বিধিসম্মত। [পাদ্যান্তস্থং বিকল্পেন।]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অধ্যাপক সেনের পরবর্তী লেখক হলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি, ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রবাহ, বীচি ও শ্লোক সংখ্যার [৫.৩১।২] উল্লেখ করে আলোচ্য শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। তাতেও দেখছি 'গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ' আছে।

'বঙ্গাল-বাণী' শ্লোকের শেষে 'আর্যা' যোজনাকে আমরা বলেছি তর্কবিশারদ-পণ্ডিতোচিত সূক্ষ্ম কারুকার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে সূক্ষ্মতর কারুকার্যেরও উদাহরণ আছে। সে কারুকার্যটি হল অন্যের উক্তিতে সুকৌশলে অনুপ্রবেশ। অধ্যাপক সরকারের মতে বঙ্গাল-বাণীর অর্থ হল বঙ্গাল নামক কবির বাণী। অধ্যাপক সেন তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বলেছেন, "বঙ্গাল কবির দুইটি শ্লোক [সদুক্তিকর্ণামৃতে] উদ্ধৃত হইয়াছে। একটিতে কবি আত্ম-প্রশংসার ছলে বঙ্গবাণীরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন।" [পৃ ২৭]। অর্থাৎ তাঁর মতে বঙ্গাল-বাণীর অর্থ বঙ্গবাণী। প্রবন্ধকার অধ্যাপক সেনের এই উক্তির মধ্যে দুটি মারাত্মক শব্দ যোজনা করেছেন। "একটিতে কবি আত্মপ্রশংসার ছলে বঙ্গবাণীরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন"—এই বাক্য প্রবন্ধকারের কুশলী চাতুর্যে হয়েছে "একটিতে কবি আত্মপ্রশংসার ছলে বঙ্গবাণীর অর্থাৎ বাংলাভাষার জয় ঘোষণা করেছেন।" সেনের 'বঙ্গবাণী' সরকারের লেখনীমুখে হয়েছে "বঙ্গবাণী অর্থাৎ বাংলা ভাষা।" দেখা যাচ্ছে সেন যা বলেন নি, সরকার তাঁকে দিয়ে তা-ই বলিয়ে নিতে চাইছেন। অথচ তিনি যদি আরেকটু পরিশ্রম করে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র সংশোধিত পরবর্তী সংস্করণগুলি দেখতেন [যা গবেষক-পণ্ডিতের অবশ্যকৃত্য বলে বিশ্বজন মনে করেন] তাহলে তিনি দেখতে পেতেন তৃতীয় সংস্করণ থেকে গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ঃ পূর্বার্ধের চতুর্থ সংস্করণের ৩২ পৃষ্ঠায় সেন লিখেছেন, "আমরা শ্লোকটিকে বঙ্গাল কবির আত্মশ্লাঘা বলিয়া না লইয়া চিরদিনের বঙ্গবাণীর এবং চিরকালের গঙ্গার প্রশস্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি।" 'চিরদিনের বঙ্গবাণী' আর 'বাংলা ভাষা' যে সমার্থক নয়, একথা অধ্যাপক সরকার নিশ্চয়ই বোঝেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে [ভাদ্র ১২৮০] লিখেছিলেন, "বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী।··· জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" অর্থাৎ, বঙ্কিম-চন্দ্রের এই উক্তি অনুসারে প্রাচীন বাঙ্গালা দেশের গত দুই সহস্র বৎসরের কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জয়দেব, তারপর শ্রীমধুসূদন। অথচ জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ লিখেছেন সংস্কৃতে, আর শ্রীমধুসূদন লিখেছেন বাংলায়। এই দুই সহস্র বৎসরের বাঙালীর ভাষাকেই অধ্যাপক সেন 'চিরদিনের বঙ্গবাণী' বলেছেন বলে ধরা যেতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাপদ। কাজেই তিনি বঙ্গবাণী অর্থে যে 'বাংলা ভাষা' বোঝেননি তা অনুমান করা শক্ত নয়। কেননা পরবর্তী সংস্করণে তাঁর বক্তব্যকে স্ফুটতর করে তিনি বলেছেন 'চিরদিনের বঙ্গবাণী'।

অধ্যাপক সরকারের মতে বঙ্গাল-বাণীর অর্থ 'বঙ্গাল' নামক কবির 'রচনা'। অর্থাৎ বঙ্গাল একজন কবির ব্যক্তিনাম, এবং বাণীর অর্থ রচনা। তাঁর এই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের সমর্থন যাঁদের কাছে পাওয়া যায় নি; তাঁদের উপর তিনি স্বভাবতই শূলপাণি। তাঁর যুক্তি ধোপে টেকে কিনা সে বিচার করার আগে আচার্য সুনীতিকুমার এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর রসাল মন্তব্যগুলির প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন।

আচার্য সুনীতিকুমার সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বলেছেন, "তিনি (সুনীতিকুমার) অবশ্যই সেনমহাশয়ের গ্রন্থ থেকে শ্লোকটি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনিও 'গঙ্গা চ'-স্থলে 'গঙ্গা' লিখেছেন।" কিন্তু দেখা যাচ্ছে সদুক্তিকর্ণামৃতেই আছে 'গঙ্গা', 'গঙ্গা চ' নেই। তাহলে 'অবশ্যই' শব্দপ্রয়োগ কি যথার্থ হয়েছে? সুনীতিকুমারের মতে শ্লোকটি 'অজ্ঞাতপরিচয় কোনও পূর্ববঙ্গীয় ('বঙ্গাল' অর্থাৎ বাঙাল) কবির বঙ্গভাষা-প্রশস্তি।' এই উক্তি সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার উৎপ্রেক্ষা-অলংকৃত, একটি প্রভুসম্মিত বাক্য রচনা করেছেন; "তিনি যেন ভুলে গিয়েছেন যে, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' অনুসারে শ্লোকরচয়িতা কবির নাম বঙ্গাল।" অধ্যাপক সেন ১৯৪৮ সালেই তাঁর গ্রন্থে 'বঙ্গাল'-রচিত দুটি শ্লোকের কথা বলেছিলেন। তাঁর ১৯৬৩ সালের সংস্করণে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সম্পর্কে ৩১ থেকে ৩৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা আছে। তার মাত্র দু-বৎসর পরে লেখা 'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (মার্চ, ১৯৬৫) গ্রন্থ রচনার সময় আচার্য সুনীতিকুমার 'যেন ভুলে গিয়েছিলেন' যে আলোচ্য শ্লোকটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' আছে? অধ্যাপক সরকার এই সম্ভাব্যতায় কি করে পৌঁছলেন? উত্তরটি তিনিই দিয়েছেন, "'সদুক্তিকর্ণামৃত' অনুসারে শ্লোকরচয়িতা কবির নাম বঙ্গাল।"

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের অপরাধ তিনি তাঁর 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা' (১৯৭৮) গ্রন্থে 'বঙ্গাল-বাণী' শ্লোকের যে পদ্যানুবাদ করেছেন তাতে তিনিও বঙ্গালবাণীকে বঙ্গাল নামক কবির রচনা না বলে বলেছেন 'বাংলা বাণী'। অধ্যাপক সরকারের মতে প্রবোধচন্দ্র অনুবাদকর্মে সুনীতিকুমারেরই 'অনুসরণ' করেছেন।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে 'বঙ্গালবাণী'কে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন 'চিরদিনের বঙ্গবাণী', আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন 'বঙ্গভাষা', এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন 'বাংলা বাণী'। পক্ষান্তরে অধ্যাপক দিনেশচন্দ্র সরকারের মতে বঙ্গাল-বাণীর অর্থ বঙ্গাল নামক কবির রচনা।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, বঙ্গাল কি কোনো কবির ব্যক্তিনাম? বঙ্গাল [বঙ্গ + আল] শব্দের অর্থ বঙ্গদেশীয়। সুতরাং তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ হিসাবে বঙ্গালবাণী হল বঙ্গদেশীয় বাণী। বঙ্গালকে দেশ হিসাবে গ্রহণ করলে হবে বঙ্গালের অর্থাৎ বঙ্গাল দেশের বাণী। বঙ্গাল দেশের কবির বাণীও অসিদ্ধ নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আদিতে বঙ্গাল শব্দ গৌরবসূচক শ্রেষ্ঠ-বঙ্গ অর্থেই ব্যবহৃত হত। এখানে পুনশ্চ প্রশ্ন দেখা দেবে, বঙ্গাল কবি মানে বঙ্গদেশীয় কোনো অজ্ঞাতনামা কবি, না বঙ্গাল নামক কবি। অধ্যাপক সরকার বলেছেন, বঙ্গাল নামক কবির বাণী। অর্থাৎ, তাঁর মতে বঙ্গাল কবির ব্যক্তি-নাম। কিন্তু অধ্যাপক সরকার নিজেই নিজেকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলছেন, "মূলতঃ বঙ্গাল একটি দেশের নাম, একথা সত্য; কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে এই ধরনের আরও ব্যক্তিনাম দেখা যায়, যেমন দাক্ষিণাত্য, বাহ্লিক ও কর্ণাটদেব। স্ব স্ব দেশের নাম থেকে কবিগণের এই জনপ্রিয় নামের উদ্ভব হয়েছিল, বোধ হয় বিদেশের কোনও রাজসভাতে।"

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে জনপ্রিয় বা স্বনামধন্য পুরুষের উপাধিগত, গুণগত, কীর্তিগত বা দেশগত নাম দুর্লভ নয়। কিন্তু সেগুলিকে কি 'ব্যক্তিনাম' বলা যাবে ? সদুক্তিকর্ণামৃতে ২২০২-সংখ্যক শ্লোকের রচয়িতা 'কবিরাজ'। কবিরাজ কি কোনো কবির ব্যক্তিনাম ? সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় সদুক্তিকর্ণামৃতের নামসূচীতে বলছেন, "'কবিরাজ' অনেকেরই উপাধি ছিল; তাঁদের একজন হলেন রাজশেখর; আরেকজন লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ব্যাস এবং সম্ভবত ধোয়ীও। একজন কবিরাজ 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' কাব্যের কবি বলে পরিচিত। সদুক্তিকর্ণামৃতের কবিরাজ 'সূরি' অথবা 'পণ্ডিত' উপাধিতেও উল্লিখিত; সম্ভবত তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মাধব ভট্ট। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কাদম্বরাজ কামদেব।" (Author Index, p 5)। গ্রন্থের নামসূচীতে এই ধরনের আরো বহু নাম আছে, কয়েকটির উল্লেখ করছি ঃ উৎপলরাজ, কর্করাজ, কুঞ্জরাজ, মৃগরাজ, বাক্পতিরাজ, চণ্ডাল, চূড়ামণি, পঞ্চতন্ত্রকৃৎ, মনোবিনোদকৃৎ, মহোদধি, মার্জার, বর্ধমান, বাক্কূট, বাক্কোক, বার্তিককার (কারো মতে ইনি কুমারিলভট্ট, কেউ বলেন বররুচি), বিদ্যাপতি (আমাদের পরিচিত পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি নন), এমন কি একটি শ্লোকের রচয়িতার নাম পাচ্ছি 'যুবতীসম্ভোগকার'। এসব নাম কি কবিগণের ব্যক্তিনাম ?

অধ্যাপক সরকার বলেছেন, "স্ব স্ব দেশের নাম থেকে কবিগণের এই জনপ্রিয় নামের উদ্ভব হয়েছিল, বোধ হয় বিদেশের কোনও রাজসভাতে।" বাক্যটি অব্যাপ্তি-দোষ দুষ্ট। স্ব স্ব দেশের নাম থেকেই শুধু নয়, অন্যান্য কারণেও এই সব ছদ্মনামের উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া 'বোধ হয় বিদেশের কোনও রাজসভাতে'—এই সম্ভাব্যসূচক বাক্যাংশ অধ্যাপক সরকারের অবাস্তব অনুমান মাত্র। 'কোনও রাজসভাতে' বলতে একটি রাজসভাই বোঝায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের কবিগণের এই সব নামের উদ্ভব হয়েছিল 'কোনও' অর্থাৎ একটি রাজসভাতে,—এই অলীক কল্পনা আমাদের প্রায় রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে দেয়।

যে শ্লোকটি নিয়ে এত ঝড় উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হল 'উপজীবিতা কবিভিঃ'। অর্থাৎ কবিগণ কর্তৃক উপজীবিত, অবলম্বিত বা আশ্রিত। বঙ্গাল-বাণী 'উপজীবিতা কবিভিঃ'র অর্থ, অধ্যাপক সরকারের ব্যাখ্যানুসারে হবে, বঙ্গাল-নামক কবির রচনা কবিগণ আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত দুটি শ্লোক ছাড়া বঙ্গাল কবির অন্য কোন রচনার সন্ধান আমরা পাইনি। তাঁর রচিত কোনো কাব্যের সন্ধান অধ্যাপক সরকার পেয়েছেন কিনা জানিনা। যদি তিনি না পেয়ে থাকেন তাহলে কি করে তিনি বলবেন, বঙ্গাল-কবির রচনা কবিগণ আশ্রয় করেছিলেন ?

'উপজীবিতা কবিভিঃ' ছাড়া বঙ্গালকবির রচনার আরেকটির লক্ষণ অধ্যাপক সরকার আবিষ্কার করেছেন, তিনি 'বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণ'। বক্রোক্তি প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বাণী-বিতর্কের দিকে একটু দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যাক।

অধ্যাপক সরকার বলেছেন, "'বঙ্গাল-বাণী' শব্দের অর্থ বঙ্গাল নামক কবির রচনা ঃ এতে বাংলাভাষা বোঝাতে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ বিশেষণগুলির মধ্যে 'গভীরা' এবং 'বক্রিম সুভগা' (অর্থাৎ বক্রোক্তিহেতু মনোহরা) রচনার পক্ষে যেমন সুষ্ঠু প্রয়োগ, ভাষার পক্ষে তেমন নয়। "বাংলা ভাষা বক্রোক্তিমনোহরা বলায় কোনও অর্থবোধ হয় কি না সন্দেহ। কাব্যের বক্রোক্তি-মাধুর্য বোঝা যায় ; একটা ভাষার বক্রোক্তিগুণ কেমন বস্তু ? তাছাড়া, রচনার গভীরতা ভাবগাম্ভীর্য হতে পারে, কোনও ভাষার গভীরতা বস্তুটি কি হবে ?" পুনশ্চ, অধ্যাপক সরকার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে গুরব মিশ্রের দুটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন,

বঙ্গালবাণী এবং গুরুবমিশ্রের বাদালপ্রশস্তি— উভয়তই বাণীর অর্থ রচনা। "বাদাল প্রশস্তিতে 'বাণী' শব্দে গুরুব মিশ্রের মুখের কথা বোঝায় না; তাঁর মুখের কথায় কেউ পবিত্র হলে [হলো ?] এরূপ মনে করা কঠিন।"

এখানে সরকার 'ভাষা' থেকে 'মুখের কথা'য় নেমে এসেছেন। কিন্তু ভাষা কি মানুষের ভাবপ্রকাশের বাহন নয়? ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবান ধ্বনিসমষ্টি। লিপিবদ্ধ হলেই তা হয় লেখার ভাষা। মুখের ভাষাও যে 'গভীরা' অর্থাৎ 'ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ' এবং 'বক্রিমসুভগা' অর্থাৎ 'বক্রোক্তিমনোহরা' হতে পারে এবং তা যে প্রীত করে পূত করে [ধিনোতি চ পুনাতি চ] তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। শ্রীম সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' কি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা নয়? কথামৃতের মতো 'গভীরা' এবং 'বক্রিমসুভগা' ভাষা কি খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে? তাছাড়া গুরুর মুখের কথায় শিষ্যগণ কি প্রীত ও পূত হন না?

আসলে, আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক সরকার 'বাণী'র অর্থ 'রচনা' ছাড়া আর কিছু মানতে চান না। কিন্তু বাণীর একটি অর্থ কি ভাষা নয়? সুরবাণী বা গীর্বাণবাণী কি দেবতার ভাষা নয়? এ বিষয়ে অভিধানকারগণ কি বলেন? মনিয়ার উইলিয়ামস তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে বিভিন্ন সূত্র অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, মহাভারতে বাণীর অর্থ 'speech, language, words, diction, (esp) eloquent speech or fine diction, উত্তররামচরিতে 'a literary production or composition, তাছাড়া বাগ্‌দেবী সরস্বতী তো আছেনই, উপরন্তু বাণীর অর্থ যে প্রশস্তিও হয় সে কথাও তিনি বলতে ভোলেন নি।

শব্দকল্পদ্রুমে বাক্য বা বচন অর্থে বাণীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে 'মার্কণ্ডেয়' থেকে। উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে—

সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতঞ্চ চিন্তয়েৎ।

এই শ্লোকার্ধে বাণীর অর্থ বচন বা বাক্য, এবং তা মুখেরই কথা। 'বদেৎ' অর্থাৎ বলবে। সত্যপূত কথা বলবে এবং বুদ্ধিপূত চিন্তা করবে।

এবার প্রশ্ন উঠবে, বাণীর অর্থ ভাষা এমন কি মুখের কথাও না হয় ব্যাকরণসিদ্ধ হল, কিন্তু 'বঙ্গাল-বাণী'তে যে বিশেষণগুলি আছে— ঘনরসময়ী, গভীরা, বক্রিমসুভগা, উপজীবিতা কবিভিঃ—এগুলি কি বাংলা ভাষা সম্পর্কেও প্রযোজ্য? এই প্রসঙ্গে আগেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আরেকটি উদাহরণের কথা এই মুহূর্তেই মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে [১৯৩৮ সালে প্রকাশিত] 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, "বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।" [দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ষড়্‌বিংশ খণ্ড, পৌষ ১৩৫৫, পৃ ৫৫১]।

বলাই বাহুল্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বেকার কবি উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বঙ্গবাণী, বঙ্গভাষা বা বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা বলতেই পারেন না। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত বঙ্গদেশীয় ভাষায় ভাবপ্রকাশের যে রীতিবৈশিষ্ট্য ছিল তারই পরিণতি কি একালের বাংলা ভাষা নয়? পুনরায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে'র কথা মনে পড়ছে। কি করে একটি জাতির ভাষা গড়ে ওঠে তারই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছেন, "...ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূলপ্রকৃতিও তেমনি।

মানুষের বাগ্‌যন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারায় তফাত আছে. এও তেমনি। বাগ্‌যন্ত্রের একটা কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে।… তারপরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরণ ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা করে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে তার পরে মানুষের দেহ মনের স্বভাব অনুসরণ করে সেই-সব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে।… ভাষার আকস্মিক সংকেত এমনি ক'রে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আঁকাবাঁকা পথ। হিসেব ক'রে তৈরি হয়নি, হয়েছে ইশারা থেকে ইশারায়। পুরোনো রাস্তা কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে, আবার তার উপরে নতুন সংস্কারেরও হাত পড়েছে। অনেক খুঁত আছে তার মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসংগত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে।" [তদেব, পৃ ৩৭৭]।

এখানে রবীন্দ্রনাথ একটা জাতের ভাষা 'বদল হতে হতে' কি করে 'ক্রমশ গড়ে ওঠে' তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তন সত্বেও 'বিশেষ জাতের ভাষার মূল স্বভাবটা' যে থেকেই যায় একথাও তিনি আগেই বলে নিয়েছেন। [তদেব, পৃ ৩৭৬]। এই অর্থেই বঙ্গদেশীয় ভাষারীতির যে বৈশিষ্ট্যের কথা ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেকার বঙ্গাল কবি বলেছেন তা চিরদিনের বঙ্গবাণী সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে জয়দেবই এই চিরদিনের বঙ্গবাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

বঙ্গালবাণী যে বঙ্গাল কবির বাণী নয় তার আরেকটি প্রমাণ অধ্যাপক সরকারের প্রবন্ধেই আছে। তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন, "আমরা দেখলাম, কবি বঙ্গাল আপন রচনাকে বক্রোক্তি-মনোহরা বলেছেন এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত তাঁর দুটি শ্লোকেই বক্রোক্তি অলংকার দেখা যাচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন কবি বক্রোক্তি অলংকারে শোভিত রচনার জন্য প্রসিদ্ধ বলে প্রবাদ আছে। তাঁরা সুবন্ধু, বাণভট্ট এবং কবিরাজ— …কবি বঙ্গালের দাবী থেকে মনে হয়, তিনি নিজেকে বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণ বলে মনে করতেন। তিনি হয়ত ভাবতেন, যেমন 'উপমা কালিদাসস্য' একটি কথা আছে, তেমনই তার সঙ্গে যোগ করা যায় 'বক্রিমা বঙ্গালস্য চ'।"

'বক্রিমা' আর বক্রোক্তি অলংকার এক কিনা, অথবা 'বক্রোক্তি-কাব্য-নিপুণ" আর 'বক্রোক্তি-অলংকার-রচনা-নিপুণ' সমার্থক কিনা এ তর্কে প্রবেশ করে লাভ নেই। কিন্তু এক নিশ্বাসে 'উপমা কালিদাসস্য'এবং 'বক্রিমা বঙ্গালস্য চ' বলে অধ্যাপক সরকার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন কি না, সে বিচার সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

তবে একথা আমরা বলতে বাধ্য যে অধ্যাপক সরকার বঙ্গাল কবিকে উচ্চাসনে বসাতে গিয়ে একেবারে ভূমিতলে শায়িত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত তাঁর দুটি শ্লোকেই বক্রোক্তি অলংকার দেখা যাচ্ছে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, দুটি শ্লোকের একটিতেও বক্রোক্তি অলংকার নেই।

কেন বলছি সে কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। ভাষাকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—স্বভাবোক্তি আর বক্রোক্তি। শাস্ত্রবাণী হবে সরল প্রাঞ্জল স্বভাবোক্তি, আর কাব্যবাণী হবে বক্রিমসুভগ বক্রোক্তি। এই অর্থে কাব্যমাত্রই বক্রোক্তি। অর্থাৎ বক্রোক্তিই কাব্যের সাধারণ ধর্ম।

তার পরে আছে বক্রোক্তি অলংকার। ওটি শব্দালংকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অলংকারটি দুভাগে বিভক্ত : কাকু বক্রোক্তি এবং শ্লেষ বক্রোক্তি।

সব শেষে আছে বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ। শব্দালংকার বক্রোক্তির

সঙ্গে কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের পার্থক্য হল, প্রথমটি অলংকারশাস্ত্র অর্থাৎ Rhetoric-এর এলাকাধীন, দ্বিতীয়টি সাহিত্যতত্ত্বশাস্ত্র অর্থাৎ Poetics-এর অন্তর্গত। সাহিত্যতত্ত্ব-শাস্ত্রী আচার্য কুন্তক বক্রোক্তিবাদের উদ্গাতা। তাঁর মতে বক্রোক্তিই কাব্যজীবিত। বক্রোক্তির অর্থ হল 'বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী-ভণিতি'।

অধ্যাপক সরকার বক্রোক্তিবাদের কথা বলেন নি, বক্রোক্তি অলংকারের কথাই বলেছেন। তিনি বক্রোক্তি অলংকার সম্পর্কে মম্মটভট্টের 'কাব্যপ্রকাশ' থেকেই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে'রও উল্লেখ করেছেন। আমরা সাহিত্যদর্পণের সহজতর সংজ্ঞাটিই উদ্ধার করছি—

অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্ যদি।
অন্যঃ শ্লেষেণ কাক্বা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা ॥

এই সংজ্ঞায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল 'অন্য'। সংজ্ঞার অর্থ হল, কোনো বক্তার অন্যার্থক বাক্যকে কেউ যদি শ্লেষ বা কাকুর দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ থেকে ভিন্ন অন্য কোনো অর্থে প্রয়োগ করে তা হলে তা হবে বক্রোক্তি। তা দ্বিবিধ-কাকু বক্রোক্তি এবং শ্লেষ বক্রোক্তি। শ্লেষ বক্রোক্তি অলংকারের সঙ্গে শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষ অলংকারের মৌলিক পার্থক্য 'অলংকার-চন্দ্রিকা'-কার শ্যামাপদ চক্রবর্তী আমাদের মতো অপণ্ডিতজনের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"কবি যখন বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠক বিভিন্ন অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করবেন, তখনি হয় শব্দশ্লেষ অলংকার।

"শ্লেষবক্রোক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে শ্লেষবক্রোক্তিতে বক্তা আর শ্রোতার যে উক্তি-প্রত্যুক্তি লক্ষণটি রয়েছে, শব্দশ্লেষে তা নাই; এছাড়া, প্রথমটিতে বক্তা একটিমাত্র অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন এবং শ্রোতা তার অন্য অর্থ ধরে উত্তর দেন; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বক্তা নিজেই বিভিন্ন অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন।

"শব্দশ্লেষ আর অর্থশ্লেষে পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে শব্দ পরিবর্তন করলে অলংকার থাকে না, দ্বিতীয়টিতে থাকে।" [অলংকার-চন্দ্রিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ ২৫]।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বঙ্গাল-কবির বিতর্কিত শ্লোকটিতে বক্রোক্তি অলংকার নেই, আছে অর্থশ্লেষ অলংকার। অধ্যাপক সরকার-উদ্ধৃত [অক্ষিভ্যাং কৃষ্ণসারাভ্যাম্ …] দ্বিতীয় শ্লোকেও বক্রোক্তি অলংকার নেই। বাচ্যার্থে আছে সাদৃশ্যমূলক অলংকার, উপমা (অক্ষিভ্যাং কৃষ্ণসারাভ্যাম্) এবং উৎপ্রেক্ষা (শঙ্কে), আর ব্যঙ্গার্থে আছে গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার।

সুতরাং 'বঙ্গাল-বাণী'র অর্থ 'বঙ্গাল নামক কবির রচনা'—অধ্যাপক সরকারের এই সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ, কারণ তাঁর বাণী কবিগণ আশ্রয় করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই; তাঁর কোনো কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নি, এমন কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো উল্লেখও না। দ্বিতীয়ত তাঁর দুটি শ্লোকে শ্লেষবক্রোক্তি অলংকার আছে, এই যুক্তিতে অধ্যাপক সরকার যে তাঁকে 'বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণ' কবি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাও বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ হয়েছে। অতএব বঙ্গাল-বাণী শ্লোকটিকে বঙ্গাল-কবির আত্মপ্রশস্তি না বলে বঙ্গবাণী-প্রশস্তি বলতে আপত্তি কোথায়?

শ্রীচৈতন্যের বাংলা চরিতগুলির ঐতিহাসিকতা

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের ভক্তরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলেন ঃ ভক্তদের মতে ভগবত্তা ছাড়া মহাপ্রভুকে কল্পনা করা যায় না। সেই আলোকেই 'চৈতন্য ভাগবত' 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রভৃতি বাংলা চরিতে অলৌকিক অথবা অতিরঞ্জিত ঘটনার সাহায্যে প্রভুর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসবোধসম্পন্ন লেখক ছিলেন না। তারা ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্যে চৈতন্যচরিত লিখে গেছেন। বই দুটি পড়ে বৈষ্ণবেরা অপার আনন্দ ভোগ করেন। 'জগাই মাধাই' পালায় নিত্যানন্দের মুখে "মেরেছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিবনা" গান লোকপ্রিয়—যদিও জগাই মাধাই উদ্ধারে নিত্যানন্দের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রভু আমাদের মতনই মানুষ ছিলেন এবং তাঁরও জন্ম মৃত্যু হয়েছিল। সংস্কৃত ও বাংলা চরিতগুলির পল্লবিত বর্ণনা হতে যতটুকুই হোক, এই মহামানবের জীবনের ইতিহাস খুঁজে বার করতে হবে। ভাবপ্রবণতা এই মূল্যায়ণে বাধা সৃষ্টি করেছে। আমরা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যজীবনীর রূপ রেখা নির্ণয় করেছি।

সংস্কৃত চরিতগুলির লেখক মুরারী গুপ্ত ও কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের সমকালীন ছিলেন। বাংলায় চরিত লেখা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের প্রায় কুড়ি বছর পরে আরম্ভ হয়। প্রধান বাংলা আকরগ্রন্থ দুটি, 'চৈতন্যভাগবত' 'চৈতন্যচরিতামৃত', উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। বই দুটি নবদ্বীপীয় ও বৃন্দাবনীয় মতবাদ প্রচারের জন্যে লিখিত হয়েছিল।

সংস্কৃত চরিতকারেরা অনেক ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যকে সাধারণ মানুষের মত দেখিয়েছেন। তিনি ঝাঁটা কোদাল নিয়ে এক দেবালয় পরিষ্কার করেছিলেন (মুরারি গুপ্তের কাব্য ২।১৩)। গয়া যাবার পথে তাঁর ভীষণ জ্বর হয়েছিল (কবিকর্ণপুরের কাব্য চতুর্থ সর্গ)। বিবাহের পর তিনি 'ধনার্থং' পূর্ববঙ্গে গেলেন (মুরারি কাব্য ১।১১)

জাল, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য অথবা তাঁর পরিকরদের নাম দিয়ে লেখা বাংলা ও সংস্কৃত চরিতগুলি ইতিহাস রচনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সমসাময়িক পদকর্তা বা চৈতন্য পরিকরদের নামে লেখার প্রবণতা দেখা যায়। অদ্বৈত সম্বন্ধে পাঁচজন 'প্রত্যক্ষদর্শী' লেখকের বই জাল,[1] গোবিন্দ দাসের কড়চা এবং চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' জাল।

সংস্কৃত ভাষায়, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নাম আরোপণ করে পুঁথি লেখা হয়েছিল ; 'রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা'য় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দেরও বন্দনা করা হয়েছে। জীব গোস্বামী শ্রীরূপ প্রণীত গ্রন্থগুলির তালিকায় এই পুঁথির নাম উল্লেখ করেননি। জীব গোস্বামীতে আরোপিত 'বৈষ্ণব বন্দনায়—'স্বয়ং বলভদ্র নিত্যানন্দের ও তাঁর দুই স্ত্রীর বন্দনা আছে। জীব গোস্বামীর কোন বইতে নিত্যানন্দের নাম পাওয়া যায় না। এই 'বৈষ্ণব বন্দনায় উল্লিখিত কয়েকটি অখ্যাত ওড়িয়া বৈষ্ণবের নাম বৃন্দাবন অধিবাসী জীব গোস্বামী জানতেন, মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' দুটি প্রক্ষেপের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অনেক ছাপা বইতে উল্লিখিত 'তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং' (আদি ১) প্রক্ষিপ্ত।[2]

১. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—'শ্রী চৈতন্যচরিতের উপাদান' পৃ ৪৬৩। সংক্ষেপে 'চৈ. চ. উ'
২. চৈ. চ. উ পৃ ৩১৭

চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, নিত্যানন্দের কৃপায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ—রূপ সনাতনের ও রঘুনাথ দাসের কৃপায় শ্রীস্বরূপের আশ্রয় পেলেন। চরিতকারের বৃন্দাবনে আসার আগেই সনাতন গোস্বামী দেহ রক্ষা করেছিলেন। পুরীতেই স্বরূপ দামোদরের তিরোভাব হয়।

সমসাময়িকদের পদ

এবার গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে গৌরচন্দ্র চরিতগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করব। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'চেতন্যচরিতের উপাদানে' সমসাময়িক পদকর্তাদের রচনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু পদগুলি শ্রীচৈতন্যের ইতিহাসে বিশেষ কোন আলোকপাত করে না। পদকর্তারা ভক্তির উচ্ছ্বাস কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বাসু ঘোষ কল্পনা করেছেন যে দিগম্বর শিশু বিশ্বম্ভর 'হরি হরি' বলে নাচতেন (পদ কল্পতরু নং ১১৫৯। তিনি আরও লিখেছেন যে বাল্য অবস্থায় বিশ্বম্ভর অন্যান্য বালকদের সঙ্গে "হরি বোল' বলে গান করতেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর বাল্যকালে বৈষ্ণব ছিলেন না (চৈতন্য ভাগবত ১।৪।৮৩) ১৪৩০ শকের পৌষ মাস অন্ত্যে প্রভু গয়া হতে নবদ্বীপে ফিরলেন। তিনি ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে হরিনাম গান করতে লাগলেন (মুরারি কাব্য ২।১২।২৫)। বিশ্বম্ভর 'পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ" (চৈ. ভা. ২।১)। যদিও গয়া হতে ফিরেই ভক্তদের সম্মুখে ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তা সত্বেও বিশ্বম্ভর 'ব্রাহ্মণকুমার'দের শিক্ষাদান করে মাঘ হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত অতিবাহিত করলেন (মুরারি কাব্য ৫।২৪)। তারপর জৈষ্ঠ হতে পৌষের শেষ পর্যন্ত 'নৃত্যরসে' কাটালেন (ঐ ৫।২৫)। কয়েকজন পদকর্তা বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণ কল্পনা করে লিখেছেন যে বিশ্বম্ভর সঙ্গীদের নিয়ে গোষ্ঠলীলার অভিনয় করেছিলেন। পরমানন্দ লিখলেন (পদকল্পতরু ২১২০).

ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধরে কোলে করি
পীত বসন বংশী চায়।
ধরি নটবর বেশ সম্মুখে বাঁধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।

সদ্য বিবাহিত বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ সেজে রাধা রাধা বলে নারীবেশধারী গদাধরকে কোলে করলেন — এ কথা বিশ্বাস করতে ভক্তিতে না হোক্ যুক্তিতে বাধে।

কিন্তু এই গৌরনাগর বর্ণনা পদকর্তাদের কল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকল না। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নটবর বেশ ছাড়লেন। কিন্তু নটবর বেশ তাঁকে ছাড়ল না। নিত্যানন্দভক্তরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ মূর্তি পূজা আরম্ভ করেছিলেন (মুরারি কাব্য ৪।১৪।৮)। নিত্যানন্দের বেশের সঙ্গে মিল ঘটাতে শ্রীচৈতন্যের মূর্তিতে দেখি গলায় ফুলের মালা, কুঞ্চিত কেশ ও পা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা। ভক্তরা এই বেশে মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীন বহির্বাসধারী সন্ন্যাসীকে পূজা আরম্ভ করলেন।

চৈতন্য ভাগবত

এইবার প্রথম বাংলা চরিত 'বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' (পরে 'চৈতন্যভাগবত' নামে পরিচিত, বইর পটভূমি আলোচনা করা যাক্। আনুমানিক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে এই বই রচিত হয়েছিল। বৃন্দাবন দাস এক বছরের নবদ্বীপ লীলাকে কুড়ি বছরের নীলাচল লীলার চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর বইতে তিনি প্রচার করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গৌড়দেশে জন্ম নিলেন। গৌড়দেশের বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খুশী হলেন। অনেকটা এই কারণে সহজ সরল সরল ভাষায় লিখিত চৈতন্য ভাগবতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা

চরিতামৃতে'র চেয়ে বেশী সমাদর করেন। 'চৈতন্যমঙ্গল' লেখার সময় নবদ্বীপে এমন কয়েকজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব জীবিত ছিলেন, যাঁরা প্রভুর সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসকে তথ্য জানাতে পারতেন। বৃন্দাবন দাস জানবার চেষ্টা করেননি।[৩]

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল' বা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী লিখেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের প্রথম লেখক বৃন্দাবন দাসকে 'আদি ব্যাস' বা 'বেদ ব্যাস' বলেছেন ('চৈতন্যচরিতামৃত ৩।২০ ৭৩-৭৮)। বৃন্দাবন দাসের 'ভাগবত' গীতে জগৎ মোহিত হওয়ায় (লোচনদাস 'চৈতন্য মঙ্গল' সূত্র খন্ড) ক্রমে তাঁর বই 'চৈতন্যভাগবত' নামে পরিচিত হলো।

বৃন্দাবন দাস সাফল্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রধান পরিকর ও তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড় নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলে প্রতিপন্ন করেছেন। নিত্যানন্দকে বলরাম দেখাবার জন্যে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে মুরারি স্বপ্নে দেখলেন যে হলধররূপী নিত্যানন্দের 'শিরে পাখা ধরি' বিশ্বম্ভর মুরারিকে বলছেন"আমি যে কনিষ্ঠ" (চৈ. ভা ২।২০)। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে তিনি লিখলেন যে নীলাচলে অবস্থানকালে নিত্যানন্দ একবার জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন বেদীর উপরে উঠে বলরামের মালা গলায় ধারণ করলেন (চৈ. ভা. ৩।৩)! জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে আকুল শ্রীচৈতন্যকে পান্ডারা রত্ন বেদী পর্যন্ত অগ্রসর হতে দিল না অথচ নিত্যানন্দ পান্ডাদের বাধা সত্ত্বেও বলরামের মালা পরতে সক্ষম হলেন! বৃন্দাবন দাস তাঁর বইতে যতদূর সম্ভব নিত্যানন্দের গুণগান করেছেন, স্তাবকের মত— নৈতিক শিথিলতা হলেও নিত্যানন্দ সকলের পূজ্য এ কথা প্রভুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন (চৈ. ভা ৩।৭।২৪)। গৌরচন্দ্র ব্যক্তি বিশেষের মদ খাওয়া বা ব্যভিচার সত্ত্বেও তাকে প্রশংসা করবেন, এ কথা লিখে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন।

বৃন্দাবন দাসের নিত্যানন্দভক্তির কারণ ছিল। ব্রাহ্মণসমাজ চার বছর বয়সে বিধবা নারায়ণীর পদস্খলন ক্ষমা করেনি। সমাজ পরিত্যক্তা নারায়ণীর শিশুপুত্রকে সংস্কারমুক্ত নিত্যানন্দ স্নেহ করতেন, তার ফলে বৃন্দাবন দাস বড় হয়ে জন্মের কালিমা সত্ত্বেও অদ্বৈত প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবের সংশ্রবে এসেছিলেন। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের উদারতা ভুলে যাননি। তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' বইতে নিত্যানন্দের মহিমা প্রচার করে সেই ঋণ শোধ করেছিলেন। "শ্রী সংকর্ষণের অবতার", বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ ভাই বিশ্বরূপের (কবি কর্ণপূর, নাটক ১।৩৮) মৃত্যুর পর নিত্যানন্দ বলরামের অবতার কল্পিত হলেন। এরূপ কল্পনার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলেই বাস করবেন স্থির করে নিত্যানন্দকে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্যে গৌড় দেশে পাঠালেন। অবধূত নিত্যানন্দ তাঁর সমসাময়িক মার্টিন লুথারের মত বিবাহ করলেন। তাঁর একসঙ্গে দুটি স্ত্রী হলো। শুধু তাই নয় "কাষায় কৌপিন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস/ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস" (চৈ ভা ৩।৬।১৯)। স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা হয়েও পরিণত বয়সে দুটি বিবাহ করে বিলাসে জীবন যাপন করায় নিত্যানন্দ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের বিরাগভাজন হলেন। বৃন্দাবন দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়। নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়"। (চৈ.ভা ৩।১।৭৮)।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা অবধূত নিত্যানন্দের বিলাসে সংসারী জীবন যাপন সমর্থন

৩. "যে সকল ঘটনার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তিনি সেগুলি হয় বাদ দিয়েছেন, না হয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।" চৈ. চ. উ প. ১৯৭

করেন নি। রূপ ও সনাতন "রাজ্যসুখ ছাড়ি কাঁথা করঙ্গ" (চৈ.ভা ৩।৯) নিয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন ঃ "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা সম"—যুবক রঘুনাথ দাসকে সংসারী হতে প্রলুব্ধ করতে পারেনি ঃ রূপ গোস্বামীর তৃতীয় চৈতন্যাষ্টকে নবদ্বীপবাসী অদ্বৈত, শ্রীবাসের উল্লেখ আছে, নিত্যানন্দের নাম নেই। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর 'স্তবাবলীতে' ঈশ্বরপুরীর নাম করেছেন। নিত্যানন্দসম্বন্ধে তিনি নীরব। অথচ রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দকে ভাল ভাবে চিনতেন। জীব গোস্বামীও তাঁর বইগুলিতে নিত্যানন্দের নাম করেন নি।

সেকালে সন্ন্যাসীদের পক্ষে সন্ন্যাস ত্যাগ অতি গর্হিত কর্ম বিবেচিত হতো। ত্রয়োদশ শতকে সন্ত জ্ঞানদেবের বাবা গুরুর অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস ত্যাগ করে আবার সংসারী হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর সন্তানেরা সমাজে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন।[৪] কিন্তু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র দুবার বিবাহ করে বিলাসে জীবন কাটালেও, নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের নেতা হয়েছিলেন। কার সাধ্য, স্বয়ং বলরামের অবতারের পুত্রকে একঘরে করে।

প্রথম জীবনে সমাজ দ্বারা লাঞ্ছিত বৃন্দাবন দাস তাঁর বইতে অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। নিত্যানন্দনিন্দুকদের মাথায় তিনি লাথি মারবেন লিখেছেন। বিশ্বম্ভর কাজীকে হত্যাকরার ও তাঁর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ অদ্বৈতকে তিনি প্রহার করেছিলেন। "শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া"! এরূপ ভদ্রতাবিরুদ্ধ আচরণ শ্রীচৈতন্য করেছিলেন মনে হয় না।

বৃন্দাবন দাসের আরেক কৃতিত্ব হলো, নিত্যানন্দের 'নিতাই' আর বিশ্বম্ভরের 'নিমাই' নাম দুটি'কে লোকপ্রিয় করা। তিনি লিখেছেন, 'নিমাই নিতাই দুটি নাচিবে ফিরিয়া' (চৈ.ভা ৩।৭।১১৯)। বাল্যকালে বিশ্বম্ভরকে 'নিমাই' নামে ডাকা হোত কি? এরূপ এক প্রশ্ন অবান্তর মনে হবে। আমরা 'নদের নিমাই' বলে থাকি। সমসাময়িক পদকর্তারা নিমাই নামের উল্লেখ করেছেন। 'পদকল্পতরু'র নং ১৮৫৪ পদে জগদানন্দ পুরী হতে নবদ্বীপে এলেন। শচী আই—"কহে তার ঠাঁই আমার নিমাই আসিয়াছে কত দূরে?" পদকল্পতরু নং ১৮৫৫ পদে দেখি—"আর কি দু ভাই নিমাই নিতাঞি নাচিবেন এক ঠাঞি। নিমাই করিয়া ফুকারি সদাই নিমাই কোথাও নাই"! পদকর্তা বংশী শচীদেবীর শোকে বিচলিত হয়েছিলেন। নিমাই নাম সম্বলিত বাসুঘোষের একটি প্রসিদ্ধ পদ আছে—"আজিকার স্বপনের কথা শুনলো মালিনা সই নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।" গৌরপদতরঙ্গিনী'তে নিমাই নাম সম্বলিত বাসুঘোষের ও নরহরি সরকারের পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দেড়শ বছর পরে বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু' সংকলন করেছিলেন। সংকলন বইগুলিতে পদকর্তাদের নামে কোন পরিবর্তন করা হয়নি—এ কথা বলা চলে না। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে অন্যেরা পদ লিখে প্রসিদ্ধ পদকর্তা নরহরি সরকার ও বাসুঘোষের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।[৫]

যাঁরা বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন, মনে করেন না, তাঁদের যুক্তি হলো—(১) সমকালীন সংস্কৃত চরিতকারদের নীরবতা, (২) নিতাই ও নিমাই নাম দুটির সাদৃশ্য, (৩) নিমাই নামের পেছনে যুক্তির অসঙ্গতি।

মুরারি বাল্যকালে প্রভুর সহপাঠী ছিলেন। বিশ্বম্ভরকে যদি বাল্যকালে নিমাই নামে

৪. Dr A. K. Majumdar: Chaitanya His Life and Doctrine P259
৫. চৈ. চ. উ পু—৩৫-৩৬

ডাকা হোত—তাহলে সে কথা মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যে লিখলেন না কেন? মুরারি বিশ্বম্ভরের ডাকনাম জানতেন না—এ যুক্তি হাস্যকর। কবিকর্ণপুরের বাবা শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের দশ বছরের মধ্যে লিখিত তাঁর কাব্যে নিমাই নাম উল্লেখ করেননি। এমন কি নিমাই নাম পদগুলিতে ও চৈতন্যভাগবতে ব্যবহার হওয়ার পরেও ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে নিমাই নামের উল্লেখ নেই।

নবদ্বীপ হতে শ্রী নিমাইচাঁদ গোস্বামী আমাকে লিখেছেন, "সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিহীন শব্দের কোথাও প্রয়োগ দেখা যায় না। তাই মুরারি গুপ্তের কড়চায় বা কবি কর্ণপুরের গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ নাই।" তাঁর যুক্তি বিচারসহ নয়। শ্রীজীব গোস্বামীর নামে অযথা আরোপিত 'বৈষ্ণব বন্দনায়' 'কানাই খুটিয়াং' বন্দনা করা হয়েছে। যদি সংস্কৃতে 'কানাই' চলে; তবে 'নিমাই' চলবেনা কেন? কবিকর্ণপুরের কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে 'শিখি নামা সাহিতি'র উল্লেখ আছে। শিখি নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নেই। কবিকর্ণপুর 'খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ' শ্রীধরের নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বম্ভরের নিমাই ও নিত্যানন্দের নিতাই নামের সাদৃশ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। চৈতন্য-নিত্যানন্দ পূজা আরম্ভ হওয়ার পর কানাই-বলাই নামের অনুরূপ নিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত নাম নিতাইর সঙ্গে ছন্দ মেলাবার প্রয়োজনে অনুভূত হলো। তাই বিশ্বম্ভরের সংক্ষিপ্ত নাম বিশাইর পরিবর্তে শ্রুতিমধুর নিমাই নাম প্রচলিত হোল।

প্রশ্ন উঠবে, কে কবে এই নিমাই নাম প্রচলন করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। কবে প্রথম মুরারি গুপ্তের সংস্কৃতে লেখা কাব্যকে বাংলায় 'কড়চা' ও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'কে 'ভাগবত' বলা হলো? নিত্যানন্দ-প্রভাবিত গৌড়দেশের চৈতন্য সম্প্রদায়ে নিমাই নাম লোকপ্রিয় হলো। বিশেষতঃ 'শচীদেবীর হাহাকার' বিষয়ক পদগুলিতে নিমাই নামের ব্যবহার বা প্রয়োগ আরম্ভ হলো।

পরবর্তী কালে নিমাই নামের ব্যাখ্যা আরম্ভ হলো। কিন্তু বিশ্বম্ভর নাম কেউ ব্যাখ্যা করলেন না। বৃন্দাবন দাসের উদ্ভট ব্যাখ্যা অনুসারে কয়েকটি সন্তানের মৃত্যুর পর যে শিশু জন্ম নিল, তার 'দ্বিতীয় নাম' নিমাই রাখা হলো'। কিন্তু নিমাই নামের সঙ্গে অনেক পুত্র কন্যা না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক সন্তান মারা যাবার পর নবজাত শিশুর নাম দুঃখী, গোবর ভোঁদা রাখা হয়—নিমাই নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই নিমাই নামের আরেক সংজ্ঞা দিলেন। ডাকিনী যোগিনীর কুদৃষ্টি হতে রক্ষা করবার জন্যে নিমাই নাম রাখা হলো। ধরে নেওয়া হলো নিম তেতো বলে যমরাজের লোক ডাকিনী যোগিনীর অভক্ষ্য। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও লোকেদের মনঃপূত না হওয়াতে ধরে নেওয়া হলো, শচীদেবীর নবজাত শিশু নিমগাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তাই নিমাই নাম রাখা হলো। যদি জাম গাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হতো?

বৃন্দাবন দাসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, নবদ্বীপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর নবদ্বীপে ফেরেননি। বৃন্দাবন বা নীলাচলের তুলনায় নবদ্বীপ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাই নবদ্বীপের মহিমা দেখাবার জন্যে বৃন্দাবন দাস চারটি লোকরঞ্জক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। প্রথম হলো, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এসে শচীদেবীর ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর লেখা 'কৃষ্ণলীলামৃত' বিশ্বম্ভরকে পড়ে শোনালেন। বিশ্বম্ভর পুঁথির বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট না হয়ে পুঁথিতে ব্যবহৃত ক্রিয়ায় আত্মনেপদী প্রয়োগে আপত্তি জানালেন (চৈ. ভা ১।১১)। প্রভুর বাল্যবন্ধু মুরারি এ ঘটনা

তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেননি। 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা'র মতন 'কৃষ্ণলীলামৃত' পুঁথিরও সন্ধান পাওয়া যায় না। পুঁথি সত্যই লেখা হয়েছিল কি? বর্ষীয়ান ঈশ্বরপুরী বৈষ্ণব অদ্বৈতকে 'কৃষ্ণলীলামৃত' না শুনিয়ে অবৈষ্ণব যুবক বিশ্বম্ভরকে শোনাতে গেলেন কেন? বিশ্বম্ভর তত্ত্ব বর্ণনার সমালোচনা না করে ব্যাকরণের খুঁৎ ধরতে গেলেন কেন? ঠিক এই ভাবেই তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের 'গঙ্গার মহিমা' বর্ণনার দোষ ধরেছিলেন। কবি কর্ণপুর তাঁর নাটকে লিখেছেন, 'দৈববশতঃ' গয়াতে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে বিশ্বম্ভরের দেখা হয়েছিল। তিনি তার আগে নবদ্বীপে সাক্ষাতের কথা লেখেন নি।

দ্বিতীয় কাহিনী হলো, এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ করা। স্বপ্নে সরস্বতীর আদেশে তিনি বিশ্বম্ভরের কাছে পরাজয় স্বীকার করে হাতী, ঘোড়া, ধন বিলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও একটু পরিবর্তন করে এই মনোরম কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পণ্ডিতের নাম জানতেন না? মুরারি গুপ্ত বা কবি কর্ণপুর প্রভুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের এই কাহিনী উল্লেখ করলেন না কেন?

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত 'জগাই মাধাই উদ্ধার' ও 'কাজি দলন' কাহিনী দুটি লোকপ্রিয়। জগাই, মাধাই সম্পর্কে মুরারি গুপ্ত শুধু লিখেছেন যে প্রভু 'পাপপুণ' জগন্নাথ ও মাধবকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (কাব্য ২।১৩।১৭)। কবি কর্ণপুরের নাটকে (১৪৭) লেখা আছে যে নবদ্বীপে জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। বিশ্বম্ভর তাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "তোরা পাপ বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়ে যে কর্মজাল রচনা করেছিস তাহা আমাকে দিয়ে দে।" দুই পাপিষ্ঠ অনুতপ্ত হয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে লাগল। কৃষ্ণদাস কবিরাজও জগাই মাধাইকে নিত্যানন্দের প্রেমদানের উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন, বিশ্বম্ভর সকলকে, এমনকি জগাই মাধাইকেও প্রেমদান করলেন (চৈ. চ. ১।৮)! বৃন্দাবন দাস জগাই মাধাই উদ্ধার কাহিনীতে নিত্যানন্দ-মহিমা দেখাবার জন্যে একটি interlude জুড়ে দিয়েছিলেন।

কাজীদলন কাহিনী পল্লবিত হলেও সত্য মনে হয়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, যে সংকীর্তন দল কাজীকে দমন করতে বেরিয়েছিল, তার মধ্যে মুরারি গুপ্তও ছিলেন (২।৩)। মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যে হরি সংকীর্তন দ্বারা 'ম্লেচ্ছাদীনুদ্ধারা সৌ' (২।১৭) সকলের উদ্ধারের কথা লিখেছেন। কবিকর্ণপুর তাঁর কাব্যে এ ঘটনা সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের কাজীদলন কাহিনী পঞ্চাশ বছর পরে প্রথম 'চৈতন্যভাগবতে' জানা গেল। প্রভুর আদেশে কাজীর ঘর বাগান ভাঙ্গা বাড়াবাড়ি হলো দেখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘটনা সংশোধন করলেন। বিচারে পরাজিত হয়ে কাজী স্বীকার করলেন, "কল্পিত আমার শাস্ত্র"। মুসলমান রাজত্বকালে কোন কাজী এরূপ স্বীকার করবেন মনে হয় না।

'চৈতন্যভাগবত' লিখে বৃন্দাবন দাস নিন্দুকদের নীরব করে নিত্যানন্দের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ জন্মের সময় তাঁকে বর্জন করেছিল, বৃন্দাবন দাসের মৃত্যুর পর সেই সমাজ তাঁকে 'বেদব্যাস' বলে সম্মানিত করেছিল।

জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল

এবার দুটি চৈতন্যমঙ্গল নিয়ে আলোচনা করা যাক্। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বর্ণিত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকি। কিন্তু মিথ্যাবাদীরাও মাঝে মাঝে সত্য কথা বলে থাকে। একমাত্র জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে নীলাচল অভিমুখে

যাত্রাপথের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি অধুনালুপ্ত মন্দাকিনী নদী ও পুরুষোত্তমপুরের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন। সেকালে সৎ ব্রাহ্মণদের অন্যত্র গিয়ে বাস করবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হতো, বারেন্দ্র (Epigraphia Indica, xxiv p 99) ও রাঢ (Epigraphia Indica, xxvii p 330) থেকে ব্রাহ্মণেরা ওড়িশায় এসেছিলেন ; মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যে লিখেছেন শ্রীচৈতন্য বাৎস গোত্রীয় ছিলেন। ওড়িশায় বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন। ওড়িশায় পাশ্চাত্য বৈদিক বংশ নেই — এ যুক্ত বিচারসহ নয়। শ্রীচৈতন্যের পাশ্চাত্য বৈদিককুলে জন্ম গ্রহণের কথা তাঁর আত্মীয়দের বংশধরেরা প্রথম প্রচার করেছিলেন। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য –বৈদিক ব্রাহ্মণদের এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ কিছুটা কাল্পনিক মনে হয়।

যাজপুরের ব্রাহ্মণেরা বলেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যজ্ঞ করতে কনৌজ হতে যজ্ঞপুর বা যাজপুরে গিয়েছিলেন। বিরজা ক্ষেত্রে পিন্ডদান করবার সময় কনৌজ হতে আগত ব্রাহ্মণদের স্মরণ করা হয়— 'কনৌজ দেশাৎ স্বয়মাহূতা'। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রথম সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু কনৌজ হতে ওড়িশা আগত ব্রাহ্মণদের 'পাশ্চাত্য বৈদিক' বলেছেন।[৬]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসানের উপর আলোকপাত করা। মহাপ্রভুর জীবনের শেষ কয়েক বছর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত, তার কারণ কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পুরী এসে তথ্য সংগ্রহ করেন নি, মুরারিগুপ্তের কাব্যের পর চৈতন্যচরিত লেখা সাময়িকভাবে বন্ধ হলো, লীলাবসানের আগে থেকেই নবদ্বীপের বৈষ্ণব মোহান্তরা নিত্যানন্দের অনুকরণে বিলাসী হলেন, গুরুগিরি পারিবারিক করা হলো ; জয়ানন্দ লিখেছেন মোহান্তরা নানা অলংকার এবং দিব্য পরিচ্ছদ পরে দোলায় বা ঘোড়ায় চড়ে শিষ্য-বাড়ী যেতেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' লেখার পঞ্চাশ বছর আগে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য হেঁটে পুরী থেকে রামেশ্বর, বৃন্দাবন আর রামকেলী গিয়েছিলেন এবং পুরী ফিরেছিলেন। বিলাসী মোহান্তরা নবদ্বীপ হতে এক মাস হেঁটে পুরী গিয়ে চাতুর্মাস্য যাপন করে বিপদ সংকুল পথে আবার হেঁটে ফিরতেন মনে হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জগন্নাথ দর্শনকারীদেরই বিংশতি বছর গতাগতির কথা লিখেছেন।

প্রভুর লীলাবসানের পরে নবদ্বীপে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল।[৭] ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে যুবক কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন সম্বন্ধে তথ্যের অভাবে কিছু লেখেন নি। লীলাবসান সম্বন্ধে তিনি নীরব। ভক্তগণ লীলাবসান বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মত অনুসারে গৌররায় এখনও লীলা করেন। কিন্তু এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

জয়ানন্দ তাঁর বইতে শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আষাঢ় মাসে তাঁর পদ শরবিদ্ধ হওয়াতে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্যের সেই মাসে ও সেই ভাবে দেহত্যাগ করা সঙ্গত। জয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং গদাধর 'গৌরশক্তি' নামে খ্যাত ছিলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের শেষ সেবা তাঁরই করবার কথা। কিন্তু প্রশ্ন হবে, আহত শ্রীচৈতন্যকে তাঁর বাসস্থান কাশীমিশ্রের আবাসে না নিয়ে গিয়ে গোপীনাথ মন্দিরের তোটায় নিয়ে যাওয়া হলো কেন ? কাশীমিশ্রের বাড়ীতে স্বরূপ দামোদর,

৬. 'বিশ্বকোষ', চতুর্দশ খণ্ড পৃ ৪৮৭

৭. "শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতের কোন কোন পুত্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং নিজের পিতাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।" চৈ. চ. উ পৃ ৬৬৪

গোবিন্দ রায় রামানন্দ ছিলেন। আরও বড় প্রশ্ন, গদাধর পণ্ডিতের কুটিরে যে 'মায়াশরীর' পড়ে রইল, তার অপসারণ কি ভাবে গোপন রাখা হলো ?

গদাধরগোষ্ঠীর বিরোধীদল এই অসঙ্গতির সুযোগ নিলেন। শ্রীচৈতন্যের মরদেহ পুঁতে দিলে, পোড়ালে, এমন কি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেও লোকে জানতে পারত। মন্দিরের মধ্যে লীন হলে ঝামেলা থাকে না। লোচন দাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' জয়ানন্দ বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের তিথি ও তারিখ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের কুটিরে লীলাবসান লিখে তিনি গদাধরকে প্রাধান্য দিতে চাননি। তিনি নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন ও তাঁর গুরুকে গদাধরের সমতুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। লোচনদাস লিখলেন, আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীর দিন 'তৃতীয় প্রহর বেলা' (অপরাহ্ন ৩টা থেকে ৪টা) রুদ্ধদ্বার গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভু জগন্নাথের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। পান্ডা ব্রাহ্মণ বাইরে এসে অপেক্ষারত ভক্তদের বললেন : "গুণ্ডিচা বাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।" গুণ্ডিচা বাড়ীর মধ্যে অপ্রকট হওয়ার সমস্যা আছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে মন্দির তখন বন্ধ ছিল, তাহলে সন্ধ্যা আরতির সময় শ্রীচৈতেন্যের মরদেহ কোথায় ছিল ? গুণ্ডিচা বাড়ীর গুপ্তদ্বার নেই। কাজেই সিংহদরজা দিয়ে মরদেহ বাইরে নিয়ে গেলে লোকে নিশ্চয়ই জানতে পারত।

জগন্নাথবিগ্রহের মধ্যে লীন হওয়ার ধারণা গৌড়দেশে জনপ্রিয় হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত 'ভক্তিরত্নাকরে' গোপীনাথ মন্দিরের তোটা বা বাগান বাড়ীর মধ্যে তিরোভাব দেখান হলো। তবে তিরোভাবের স্থান গদাধর পণ্ডিতের কুটির থেকে গোপীনাথের মন্দিরে পরিবর্তন করা হলো। কারণ প্রধান গোপী শ্রীরাধার ভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীচৈতেন্যের গোপীনাথের বিগ্রহের মধ্যে লীন হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এই উপলক্ষ্যে একটি ছড়াও রচনা করা হলো — "গোরাচাঁদকে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।"

চৈতন্যচরিতামৃত

এইবার চৈতন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠ বই 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করব। বইটি কবে লেখা হয়েছিল ? ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি পঠিত 'চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল এবং ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে পুঁথিটির ১৬১২ খ্রীস্টাব্দের আগে 'রচনা শেষ হয়েছিল মনে করা শক্ত'। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। বলা হয় ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম ও ১৫৫৭ খৃস্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে গেলেন। তারাপদবাবু তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে ১৫৫৮ খৃীস্টাব্দে সনাতনের তিরোধান হয়। কবিরাজ গোস্বামী সনাতনের তিরোধানের আগে বৃন্দাবনে গিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই 'গোবিন্দলীলামৃত' বইতে তাঁর নাম দিতেন। তাছাড়া ১৫২৭ খৃীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়ে থাকলে গ্রন্থরচনার সময় তাঁর বয়স ৮৫ বছর হয়েছিল। সেই বয়সে বিনা চশমায় নানা পুঁথি পড়ে ৬৬২টি শ্লোক উদ্ধৃত করা প্রায় অসম্ভব। তাই ১৫৩২ খৃীস্টাব্দের আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল মনে হয় না। আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়সে, ১৫৬২ খৃীস্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে গেলেন ও ১৫৬৮ খৃীস্টাব্দে রূপ গোস্বামীর তিরোধানের আগে 'গোবিন্দ লীলামৃত' রচনা করলেন।

চরিতামৃত গ্রন্থ রচনাকালে বৃন্দাবনে গদাধর গোষ্ঠীর বৈষ্ণবেরা প্রভাবশালী ছিলেন। জীব গোস্বামীর তিরোভাবের পর ব্রজের মুখ্য বৈষ্ণব গোবিন্দ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত হরিদাস ও আরও তিনজন 'আজ্ঞাকারী বৈষ্ণব' গদাধরগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। আমি আগেই

বলেছি, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা নবদ্বীপের নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জীব গোস্বামীর তিরোধানের পর বৃন্দাবনীয় ও নবদ্বীপন্থ মতবাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বোঝাপোড়া হলো। বৃন্দাবনীয় বৈষ্ণবেরা মেনে নিলেন—"সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র" (চৈ চ ১।৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন 'নিত্যানন্দ (বল) রাম তাঁকে স্বপ্নে বৃন্দাবনে যেতে বলেছিলেন' (চৈ চ ১।৫।১৯)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিন্তু বৃন্দাবনের সন্ন্যাসী-গুরুদের মতবাদ প্রচারের জন্যে বইটি লিখেছিলেন। গদাধরগোষ্ঠীর বৈষ্ণবেরা চেয়েছিলেন, প্রভুর নীলাচল লীলা সম্বন্ধে বাংলায় একটি প্রামাণ্য বই লেখা হোক্। গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হওয়ার পরেও নীলাচলে ছিলেন।

এই রকম একটি বই লেখার প্রয়োজন ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হওয়া সমর্থন করেননি। ডঃ বিমান মজুমদারের ভাষায়—"বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে গৌরাঙ্গ হইতেছেন উপায় মাত্র। আর গৌড়ে উত্থিত মতবাদে তিনি স্বয়ং উপেয়"। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নন্—তিনি রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে এসে 'গোবিন্দলীলামৃত' না লিখে যদি 'চৈতন্যলীলামৃত' লিখতেন, তাহলে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য বই লেখা হতো,। গ্রন্থকার রূপ গোস্বামীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন বা ভবিষ্যতে তাঁর চৈতন্যচরিত লেখবার ইচ্ছা থাকলেও শ্রীরূপের কাছ থেকে বহু তথ্য জেনে নিতেন। তিনি তা করেন নি, কারণ রূপ গোস্বামী তাঁকে নিশ্চয়ই বলেননি যে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের পঞ্চম অংকের শ্লোক তিনি ১৫১২ খৃষ্টাব্দে রায় রামানন্দকে শুনিয়েছিলন।*

চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে, "রঘুনাথ গোসাঞি মুখে যে সব শুনিল"। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্থবির রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কাহিনী শুনে থাকবেন। তিনি যদি বৃন্দাবনে গিয়েই স্থির করতেন—এ কাজে হাত দেবেন, তাহলে নিশ্চয়ই 'রামানন্দ মিলন' লীলা সম্বন্ধে তথ্য জেনে নিতেন। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন ও রঘুনাথ দাস স্বরূপ দামোদরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন।

সুদীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁকে চৈতন্যচরিত লিখতে 'আজ্ঞা' করা হলো। এ কাজের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বৈষ্ণবদের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে মনস্থির করতে পারেননি। মদনগোপালের আজ্ঞা পাবার পরেই তিনি লেখা আরম্ভ করলেন। 'গোবিন্দলীলামৃত' লেখার সময় কারও আজ্ঞার প্রয়োজন হয়নি।

কবিরাজ গোস্বামীর কাজ অতি দুরূহ ছিল। কারণ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কেহই তখন জীবিত ছিলেন না। গ্রন্থ রচনার পঁচিশ বছর আগে শেষ সমকালীন গোস্বামী রঘুনাথ দাস দেহরক্ষা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ গোস্বামীর প্রথম 'চৈতন্যাষ্টকে'র শ্লোক গুলি অবলম্বন করে অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ অধ্যায় লিখেছেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'চৈতন্যাষ্টক'ও 'স্তব কল্পতরু'র সাহায্যে অন্ত্যলীলার সপ্তদশ ও ঊনিশ অধ্যায় লিখেছেন।

---

*কলেজে আই এ পড়বার সময় আমার এক সহাধ্যায়ী বলেছিল, তার বাবা রবীন্দ্রনাথের পণ্ডুয়া জমিদারীতে কাজ করেছিলেন। আমার ইচ্ছা থাকলে সহপাঠীর গ্রামে গিয়ে পণ্ডুয়ার জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্য জেনে নিতাম। বত্রিশ বছর পরে সাহিত্য একাডেমির জন্যে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের ওড়িয়া অনুবাদ করবার সময় এ জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলাম।

কবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীরূপের কাছ থেকে তথ্য জানবার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে তাঁদের রচিত কয়েকটি শ্লোকের উপর রঙ বুলিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতবাদ প্রচারের জন্যে লিখেছিলেন। তাই মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদ হতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য সনাতন গোস্বামীর 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও জীব গোস্বামীর 'ষটসন্দর্ভে'র বিষয়বস্তু রূপ ও সনাতনকে বুঝিয়ে বলেছেন।

চরিতকার শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের সাম্মিলিত অবতার দেখাতে চেয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে অন্ত্যলীলায় তার প্রধান আকর গ্রন্থ রূপে, কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের পরিবর্তে 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা'র উল্লেখ করেছেন ও রায় রামানন্দকে মুখপাত্র করেছেন।

(ক) স্বরূপ দামোদরের কড়চা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' অনুসারে তিনি 'রামানন্দ মিলন' বর্ণনা করেছেন (চৈ. চ ২।৮।২৬১) এই সংস্কৃত বই 'কড়চা' নামে অভিহিত হলেও তার নিশ্চয়ই একটা নাম ছিল। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে প্রভুর শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সূত্র আকারে গেঁথেছিলেন (চৈ চ ১।১৩।১৫)। অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর বইতে প্রশ্ন করেছেন যে স্বরূপ দামোদর যদি অন্ত্যলীলা লিখতেন, তবে কবিরাজ গোস্বামী তার একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করলেন না কেন? শ্লোক উদ্ধৃত না করার কারণ, স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চা, গ্রন্থ আকারে লেখেন নি। বাংলা 'কড়চা' শব্দের একটি অর্থ 'গ্রন্থ'। যথা—মুরারি গুপ্তের কড়চা। আরেকটি অর্থ 'শ্লোকের সমষ্টি' (collection)। কবিরাজ গোস্বামী 'রঘুনাথ দাসের কড়চা' উল্লেখ করেছেন (চৈ চ ৩।১৪)। তিনি লিখেছেন, 'আর আর কড়চাকার রহে দূর দেশে'। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভু সম্বন্ধে মাত্র কুড়িটি শ্লোক লিখেছেন। মনে হয়, এই কুড়িটি শ্লোকের সমষ্টিকে 'কড়চা' বলা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে স্বরূপ দামোদরের কড়চাকে তাঁর লেখা শ্লোকের সমষ্টি বলা যেতে পারে। স্বরূপ দামোদরের রচিত কয়েকটি শ্লোক 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উদ্ধৃত হয়েছে। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে'ও তিনটি শ্লোক আছে। স্বরূপ দামোদরের মতন বিশিষ্ট বৈষ্ণবের পুঁথি নবদ্বীপে কবি কর্ণপুর আর বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পড়লেন। তারপর পুঁথি হারিয়ে গেল।

রাজমহেন্দ্রীতে ধর্মালোচনা বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের কাব্য ও নাটকের উপর নির্ভর করেছেন। কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর, 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল' পদ, 'নানোপচার কৃত পূজনং' শ্লোক, কবিকর্ণপূরের কাব্য ও নাটক হতে নেওয়া। প্রশ্ন উঠবে, কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের ঋণ স্বীকার করলেন না কেন? আলোচনার শেষে রামানন্দ প্রভুকে বললেন, "রাধিকার ভাবভঙ্গী অঙ্গীকার করে তুমি অবতীর্ণ হয়েছ।" এ কথা কবিকর্ণপূর লেখেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানতেন যে কবিকর্ণপূরের নাম উল্লেখ করলে শেষ অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে জানা যাবে। তাই তিনি দেখাতে চাইলেন যে 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' অবলম্বন করে রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মিলনলীলা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পুরো ঘটনা তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে পেয়েছেন, কবিকর্ণপূরের বই দুটি থেকে নয়।

(খ) রায় রামানন্দ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রায় রামানন্দকে বৃন্দাবনীয় তত্ত্ব প্রচারের মুখপাত্র করেছেন। তাঁর নির্বাচন যথার্থ হয়েছিল। স্বয়ং মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন— "রামানন্দ মতমুএর রুচিতমু"। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যীয় ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজের পাণ্ডিত্য রামানন্দের মুখে আরোপিত করেছেন। তাঁর বই 'গোবিন্দলীলামৃতে'র শ্লোক রামানন্দকে দিয়ে বলিয়েছেন। রামানন্দ রূপ গোস্বামীর জ্ঞান পরীক্ষা করেছিলেন। 'ব্রহ্ম সংহিতা' না পড়ে 'ব্রহ্ম সংহিতা' হতে দুটি শ্লোক শ্রীচৈতন্যকে শুনিয়েছিলেন।

সংসারী রামানন্দকে এক উচ্চ স্তরের সাধক দেখাতে কৃষ্ণদাস এক অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাড়ীতে 'অহোরাত্র সংকীর্তন' হতো। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, কোন তরুণীকে নৃত্যগীত শেখাতে হলে তার অভ্যঙ্গ মর্দন বা গাত্র সংমার্জন কিম্বা তাকে স্নান করান দরকার হয় না। বলা হলো, রামানন্দ তরুণী দেহ 'কাষ্ঠ পাষাণ সম' জ্ঞান করতেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দকে প্রকৃত দর্শনে শ্রীচৈতন্যের চেয়েও নির্বিকার দেখিয়ে প্রভুর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন।

(গ) দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কল্পনার প্রতি ঝোঁক ছিল। বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করে শৈব ভারতী সম্প্রদায়ের 'ব্রহ্মচারী' হলেন (মুরারি ৩।২।৭)। ভারতী সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারীদের 'চৈতন্য' বলা হতো। অনুমান করা যেতে পারে যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর দুই গুরু ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীর চক্ষে পবিত্র শৃঙ্গেরী মঠ দর্শন করা কর্তব্য মনে করেছিলেন। এই মঠ তখন রামেশ্বরে অবস্থিত ছিল। গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ 'চৈতন্য চরিতামৃতে' এই শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে (পৃ ৫০৬)

"চতুর্থে দক্ষিণাম্নায় শৃঙ্গেরর্যাম্ বর্ততে মঠঃ

* * * * * *

পদানি ত্রিনা খ্যাতানি সরস্বতী, ভারতী, পুরী

বরাহো দেবতা যত্র, ক্ষেত্র রামেশ্বর বদ্যেৎ"।

স্বামী দিব্যেশ্বরানন্দের 'পুণ্যতীর্থ ভারত' (পৃ ২১০) ও অবধূতের 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (পৃ ১২৩) বই দুটিতে লেখা আছে—ক্ষেত্র রামেশ্বরঃ ব্রহ্মচারী চৈতন্যঃ তীর্থ তুঙ্গভদ্রা। পরে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত একটি মঠ শৃঙ্গেরী বা শৃঙ্গগিরি নামে পরিচিত হলো। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখি, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত শ্রীশৈলমে প্রভু পরমানন্দ পুরীকে বললেন "তুমি পুরী যাও। আমি সেতুবন্ধ হইতে আসিব অল্পকালে" (চৈ. চ ২।৯।১৯৯)। মুরারি বা কবিকর্ণপুর এ কথা জানাতে চাননি যে প্রভু রামেশ্বরে এক শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ দেখতে গিয়েছিলেন। তাই তাঁরা শ্রীচৈতন্যের রামেশ্বরে গিয়ে রামেশ্বর শিব পূজার উল্লেখ করেছেন। মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যের তৃতীয় প্রক্রমে লিখেছেন, প্রভু সেতুবন্ধ পরিক্রমা করে রামেশ্বর শিব দর্শন করলেন (১৬।৫)। ক্রমে সকল তীর্থ দর্শন করে গোদাবরী তীরে এলেন। কবিকর্ণপুর তাঁর কাব্যে লিখেছেন যে প্রভু রামচন্দ্রের দ্বারা পূজিত রামেশ্বর শিব ও সেতুবন্ধ দর্শনের পর "তথা হইতে প্রত্যাবর্তন (নির্বার্তিতৃ তত্র) করিলেন" (১৩।৩৩)। সেই পথে রঙ্গনাথকে দর্শন করে আবার গোদাবরী তীরে ফিরে

গেলেন। কবিকর্ণপুর তাঁর নাটকের অষ্টম অংকে লিখেছেন যে কর্ণাটরাজ প্রেরিত ব্রাহ্মণেরা সেতু বন্ধ হতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত ('ততঃ প্রত্যাগমনাবধি') প্রভুর লীলা রাজাকে জানালেন। সেতুবন্ধ হতে আরও অগ্রসর হওয়ার কথা সমকালীন চরিতকার মুরারি ও কবিকর্ণপুর লেখেননি। বৃন্দাবনদাস প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ এক লাইনে সেরেছেন "শেষ খণ্ডে সেতু বন্ধে গেল গৌর রায়"।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কল্পনার সাহায্যে প্রভুর দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতভ্রমণ বর্ণনা করেছেন। প্রথম কারণ, ভাবপ্রবণতা। গোঁড়া বৈষ্ণবেরা রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে শিব পূজা করে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যাবর্তন বিবরণ সংস্কৃত চরিতগুলিতে পড়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য রামেশ্বরম্ হতে আরও অগ্রসর হয়ে পয়স্বিনা নদী তীরে আদি কেশব মন্দিরে পূজা দেওয়াতে তাঁরা আনন্দিত হলেন।

দ্বিতীয় কারণ হলো, পুঁথি সংগ্রহ। গোস্বামী মহাশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জানতেন, সমালোচকরা বলবে, কবিরাজ গোস্বামী, "রামানন্দের মুখ দিয়া 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু'র সিদ্ধান্তের হুবহু অনুবাদ করাইয়াছেন (২।৮।৬৪-৬৯)"। তাই তীর্থ পর্যটনের পর আবার রাজমহেন্দ্রী ফিরে শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে 'কৃষ্ণ কর্ণামৃত' ও ' ব্রহ্ম সংহিতা' পুঁথি দুটি দিয়ে বললেন "তোমার প্রেম সিদ্ধান্ত এই এই পুস্তকে সাক্ষী দিলে" (চৈ. চ ২।৯)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'কৃষ্ণ কর্ণামৃত' পুঁথির টীকা লিখেছিলেন। মহাপ্রভু নিজে কৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথি সংগ্রহ করায় পুঁথির মর্যাদা বেড়ে গেল।

জগন্নাথ-মন্দিরের পিছনদিকে দ্বারিকানাথ, জগন্নাথ, রামনাথ বা রামেশ্বর ও বদ্রীনাথ এই চার ধামের দেবতা মূর্তি আছে। সেকালে অনেক তীর্থযাত্রী রামেশ্বরম্ হতে শংকর, পীঠ দ্বারকাতে যেতেন। কৃষ্ণদাস তাঁদের কাছ থেকে কয়েকটি তীর্থের নাম যোগাড় করেছিলেন। কিন্তু ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। শ্রীচৈতন্য তিনিভেলী জেলা হতে ত্রিবাংকুর জেলায় গেলেন। সেখান থেকে আবার তিনিভেলী জেলায় ফিরে গেলেন। উত্তর মহারাষ্ট্রের তীর্থ বর্ণনায় তিনি ভাগবতে বলদেবের ভ্রমণ কাহিনী থেকে কয়েকটি স্থানের নাম নিয়েছেন।

কবিরাজ গোস্বামী স্থির করেছিলেন যে প্রভু গোদাবরী কূল ধরে রাজমহেন্দ্রী ফিরবেন। তাই শ্রীচৈতন্যকে তিনি গোদাবরী নদীর উৎসের নিকট নাসিক পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী অপ্রয়োজনীয় কল্পনার লোভ সামলাতে পারলেন না। প্রভু নর্মদা নদী কূলে মাহিষ্মতীপুর গেলেন। সেখান থেকে কৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকা পর্যন্ত যাওয়া অর্থবহ হতো। প্রভু "ধনুতীর্থ দেখি করিলা নির্বিন্ধ্যারে স্নান" (চৈ. চ ২।৯।৩৩১)। ধনুতীর্থ বোধ হয় মনুতীর্থ। ভাগবতে মাহিষ্মতীপুরের কাছে মনুতীর্থের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারতের ধনুতীর্থ হতে উত্তর ভারতের ধনুতীর্থ পর্যন্ত পর্যটন করলেন! চৈতন্য চরিত আলোচকরা প্রশ্ন করেন না, কেন তিনি এক অখ্যাত নদী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন? কার ধনুর আঘাতে উজ্জয়িনীর কাছে ধনুতীর্থ হলো?

প্রভু নাসিকে ফিরলেন। সেখান থেকে রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী নদীর কূল ধরে এলেন। কিন্তু নাসিক থেকে রাজমহেন্দ্রী কোন তীর্থযাত্রীপথ ছিল না। তাই এই পথ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দীর্ঘ পথের বর্ণনা দুই লাইনে সেরেছেন। তিনি এমন কি গোদাবরী কূলে অবস্থিত ভদ্রাচলমের শ্রীরামমন্দিরের উল্লেখ করেন নি। তথ্যে এত গরমিল থাকা সত্ত্বেও ভাবপ্রবণতার দরুণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ

পশ্চিম ভ্রমণকাহিনী সত্য বলা হয়।

(ঘ) শ্রীচৈতন্যের শেষজীবন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ কয়েকটি বছর সম্বন্ধে কোন তথ্য দেন নি। তিনি প্রভুর 'ভাবোন্মাদ' অবস্থার উল্লেখ করে লিখেছেন—"দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিন" (চৈ. চ. ৩।২০।৫৯)। তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুকরণ করেছেন। রঘুনাথ দাস এই দ্বাদশ বছর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারতেন, কারণ সেই সময় তিনি পুরীতে ছিলেন। তা না করে তিনি রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে কল্পিত শ্রীরাধার বিরহের দশদশার অনুকরণে 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু'তে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ বিরহের বর্ণনা করেছেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুগত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বর্ণনা অবলম্বন করে ভক্তির উচ্ছ্বাসে বারবার অত্যুক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন একবার কৃষ্ণবিরহে অঙ্গের সন্ধি সকল শিথিল হওয়ায় প্রভুর হস্ত পদ "তিন তিন হাত" লম্বা হয়েছিল। আরেকদিন দেহ সংকুচিত হওয়ায় "পেটের ভিতর হস্তপদ' ঢুকে গিয়েছিল। রাধাবিরহের দশদশার অনুকরণেও সন্তুষ্ট না হয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ "ভিত্তে মুখ শিরে ঘষে, ক্ষত হয় সব" বর্ণনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যকে অন্তরে রাধা কল্পনা করে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের আস্বাদনের জন্যে 'দিব্যোন্মাদ' দেখান হলো। তথ্য ছেড়ে তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলেও এই কল্পনা বিচারসহ নয়। সনাতন গোস্বামী এক শ্লোকে লিখেছেন যে ভগবান তাঁর হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি শ্রীরাধার প্রণয় আস্বাদের জন্যে একাত্ম হলেন ও শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করলেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরু স্বরূপ দামোদরের এক শ্লোকে আছে, শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য — রাধাপ্রণয়মহিমা। প্রণয় মহিমা দ্বারা শ্রীরাধা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় মধুরিমা ও মধুরিমার আস্বাদজনিত শ্রীরাধার 'সুখ সীমা' অবধারণ।[৮] স্বরূপ দামোদর প্রভুর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তাঁকে সেবা করেছিলেন, তাঁর শ্লোক থেকে বোঝা গেল। কৃষ্ণের বিরহে রাধা বুক চাপড়াবেন বলে চৈতন্য অবতার হয়নি।

সংস্কৃত আকরগ্রন্থগুলিতে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভক্তিরই উল্লেখ আছে। গয়াতে ঈশ্বরপুরী, মাধবেন্দ্র পুরী প্রবর্তিত, 'দশাক্ষর' কৃষ্ণ মন্ত্রে বিশ্বম্ভরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই মন্ত্র মনে হয়—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ"। এই অনুমানের কারণ নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে বিশ্বম্ভর সর্বক্ষণ "হরের্নাম গীতং, ক্বচিদ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ" (মুরারি কাব্য ২।১২।২৫)। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'চৈতন্যাষ্টকে'র চতুর্থ শ্লোকে গণনা করিয়া হরেকৃষ্ণ নাম জপের উল্লেখ আছে। শ্রীরূপও তাঁর একটি 'চৈতন্যাষ্টকে' প্রভুর 'হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনা'র উল্লেখ করেছেন। শ্রীচৈতন্য 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করতেন, 'রাধা কৃষ্ণ' নয়। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অংকে বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের প্রেমানন্দ বিকারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি সেখানে নিজেকে রাধা ভাবেননি।

প্রভু বৃন্দাবন থেকে ফেরার সাত বছর পরে কেন 'প্রেমোন্মাদ হলেন? দশবছর আগে যিনি ভক্তদের সঙ্গে জলকেলি করেছিলেন ও লাঠিখেলা করেছিলেন—তিনি হঠাৎ কেন নিজেকে

---

৮. ডঃ উমা রায়— 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব' পৃ ১৫০

রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভে নহে আস্বাদনে॥

চৈ. চ. আদি ৪।২৬৫

রাধা কল্পনা করে মেঝেতে মুখ ঘষতে লাগলেন ?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যকে বিরহিনী রাধা দেখাবার জন্যে শ্রীরাধার বিলাপের অনুরূপ শ্লোক নিজের 'গোবিন্দ লীলামৃতে'র শ্লোক প্রভুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। 'দীর্ঘোজ্জ্বল তনু' (রঘুনাথ দাস) "বিশালাক্ষঃ, দীর্ঘার্গল যুগল খেলাঞ্চিত ভুজ" (রূপ গোস্বামী) বিশিষ্ট একটি পুরুষকে দ্বাদশ বছর গম্ভীরায় "in almost feminine role' (Dr. S.K.De) এ দেখান হলো।

অথচ প্রভুর অপ্রকট হওয়ার চল্লিশ বছরের মধ্যে রচিত জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' দুটিতে দেখি, তিনি সুস্থ ব্যক্তির মত রথযাত্রায় নৃত্য করছেন। শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া চরিতকারেরা ভাবোন্মাদ অবস্থার উল্লেখ করেন নি। প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কিছু আগে তাঁকে দর্শন করেছিলেন। তিনি সমুদ্রতীরে নর্তন, প্রেমাবেশে হরি সংকীর্তনের উল্লেখ করেছেন। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর বিলাপের উল্লেখ করেন নি।

আমার মনে হয়, নবদ্বীপের সঙ্গে যোগসূত্র কিছুটা শিথিল হওয়ায় প্রভু ক্রমে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বার বছর ধরে 'প্রলাপানুন্মাদবৎ' আচরণ করেছিলেন মনে হয় না। বৃন্দাবনীয় চিন্তাধারা প্রচারের জন্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ subject র চেয়ে objectকে বড় করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যুক্তিবাদীদের সাবধান করে দিয়েছেন—

"অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥"

এই বিশ্বাস থাকলে আসন্ন পরলোক যাত্রার পাথেয় হতে পারত।

অন্ত্যলীলা লেখবার সময় কবিরাজ গোস্বামী অতি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। কয়েকটি পরস্পরবিরোধী বিবৃতিতে তাঁর স্থবিরত্বের পরিচয় পাই। সন্ন্যাসীদের পক্ষে প্রকৃতি বর্জনের আদর্শ দেখাতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'ছোট' হরিদাসের প্রতি অবিচার করেছেন। তিনি 'বৃদ্ধা তপস্বিনী' ও শ্রীরাধার 'পাত্র মাধবীদাসীকে অন্যায়ভাবে হেয় করেছেন'। ছোট হরিদাসের মৃত্যুতে প্রভুর মন্তব্যে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। অথচ পরবর্তী অধ্যায়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, এক সুন্দরী বেশ্যা বৈষ্ণবী হওয়ায় বৈষ্ণব মোহন্তেরা তাকে দেখতে গেলেন (চৈ. চ ৩/১)। শ্রীচৈতন্য এক ক্ষুদ্র পাত্রে নিবেদিত জগন্নাথের পিণ্ডভোগের এক চতুর্থাংশ খেতেন। কিন্তু সার্বভৌমের বাড়ীতে তিনি একাই দশ জনের অন্ন খেলেন।

শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী বেদান্ত বিচারের সময় সার্বভৌমের যুক্তি শ্রীচৈতন্যের মুখে আরোপণ করেছেন।[৯]

'গোবিন্দ দাসের কড়চা' ও 'গৌরাঙ্গ বিজয়'

বাংলা ভাষায় রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' সম্বন্ধে আলোচনার পর দুটি জাল চৈতন্য চরিতের সংক্ষেপে উল্লেখ করব। 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' যে জাল, এ নিয়ে যুক্তি তর্কের কোন প্রয়োজন ছিল না। ওড়িশার মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যের তীর্থ যাত্রার বর্ণনার সময় জয়গোপাল গোস্বামী ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ওয়াকারের মানচিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল— (ক) যাবার পথে (১) বালেশ্বরে গোপাল দর্শন। ষোড়শ শতাব্দীতে তীর্থযাত্রীদের পথ হতে আট মাইল দূরে বাণেশ্বর একটি ছোট গ্রামের নাম ছিল। গোপাল বা গোপীনাথের মন্দির রেমুণায় অবস্থিত ছিল (২) নীলগড় –

৯. চৈ. চ. উ প. ৩৫১

নীলগিরির নাম কোন কালে নীলগড় ছিল না।

(খ) ফেরার পথে —(৩) সম্বলপুর—নাম বিকৃত করা গেল না (৪) দশপাল - দশপল্লী (৫) ভ্রমরা—বামড়া। (৬) রসালকুণ্ড—রাসেল কোণ্ডা। জর্জ রাসেলের নামে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে এক গ্রামের নূতন নামকরণ হয়। 'গোবিন্দ দাসের কড়চা'র ৭৮ পৃষ্ঠায় সার্বভৌম প্রভুকে বলছেন--

"যে না বুঝে তার কাছে কর ভারি ভুরি
মোর কাছে নিজ রূপ না করিহ চুরি"।

যদি 'গোবিন্দদাসের কড়চা' প্রামাণিক গ্রন্থ হয়, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পুঁথি পড়ে 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখলেন

"রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর কাছে নিজ রূপ না করিহ চুরি"।

জয়গোপাল গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে সোমনাথ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ত্রিধাম দর্শনের পুণ্য করালেন। তিনি জানতেন না সোমনাথ মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর শংকরপীঠ দ্বারকাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' দেখি গৌরাঙ্গের পিতা অতি ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনেক দাসদাসী ছিল। স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরী বিশ্বম্ভরের উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। এই বইর অনেক তথ্য "গাল গল্পের সমাহার মাত্র"।[১০]

১০. ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪৭১।
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ,১৩৮৮ প্রদত্ত বক্তৃতা)

কুলীনগ্রামে গোপেশ্বর শিব মন্দিরের সামনে বৃষমূর্তি

মালাধর বসু ও কুলীনগ্রাম-সংক্রান্ত কিছু নতুন কথা

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছিলেন ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে। চৈতন্যের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রচনার পর মনে হয় মালাধর আর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। থাকলেও বড় জোর ষোল সতেরো বছর। এ কথার পক্ষে একটি প্রমাণ দিচ্ছি। কুলীন গ্রামে গোপাল মন্দিরের কাছে একটি শিব মন্দির আছে। গোপেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির চত্বরের এক কোণে একটি কালো পাথরের বৃষমূর্তি আছে। বৃষ মূর্তিটির গলদেশে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃতে একটি শ্লোক লেখা আছে। শ্লোকটি হ'ল এই

শাকে বিংশতি বেদৈকে মৃত্যার্থং শিবসন্নিধৌ।
খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোয়ং শিলাবৃষঃ॥

শ্লোকটির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করলুম। আজ পর্যন্ত এই শ্লোকটির সঠিক পাঠ কেউ দিতে পারেন নি। কোনো কোনো লেখকের[১] হাতে এই শ্লোকটির পাঠ দাঁড়িয়েছে এ রকম

শাকে বিশতি বেদে খে মনো হি শিবসন্নিধৌ।
খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোহয়ং ময়া বৃষঃ॥

ফলে সাল তারিখ দাঁড়িয়েছে অন্যরকম। আসলে এই সব গবেষকরা কেউই কুলীনগ্রাম যান নি বলে মনে হয় এবং নিজের চোখে কিছু দেখেন নি। দেখলেও পাঠ বুঝতে পারেন নি। ফলে নানা কাল্পনিক শব্দ শ্লোকে ভীড় করেছে। আবার একের জায়গায় অন্য শব্দ এসেছে। যেমন, 'শিলা'র স্থলে 'ময়া'। 'বিশতি' যে 'বিংশতি' হতে পারে তা প্রথম অনুমান করেন শ্রীসুকুমার সেন (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বার্ধ, ১৯৭৮, চিত্রাবলী)। সুকুমার-বাবুও সংশয়াতীত নন। তাই শব্দটিকে এভাবে রেখেছেন—'বি [ং] শতি'। কুলীনগ্রামে গিয়ে বৃষের গলদেশে লেখা শ্লোকটি যথাযথ উদ্ধার করে নিয়ে এসে তার সঠিক পাঠ দিলুম। অতঃপর শ্লোকটির সঠিক পাঠ নির্ণীত হ'ল বলে আশা করি। এবং সঠিক পাঠ নির্ণীত হওয়ায় দাঁড়ালো এই যে, এই শিলাবৃষটি স্থাপিত হয়েছিল ১৪২০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা মালাধরের পুত্র খান সত্যরাজ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার আঠারো বছর পর। মালাধর যদি এই বৃষমূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর নামই থাকতো। কারণ পিতা বর্তমান থাকাকালীন কোনো দেববিগ্রহ বা তদনুরূপ কোনো কিছুর প্রতিষ্ঠাকালে পুত্রের নাম প্রাধান্য পায় না। বিশেষত সেকালের ঘটনায়। সর্বোপরি সত্যরাজের পিতা মালাধর ছিলেন ঐ অঞ্চলে ভক্ত-পণ্ডিত রূপে বিশেষ পরিচিত। তাই শিব মন্দিরের সামনে বৃষমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সত্যরাজের নামোল্লেখের মধ্য দিয়ে এই প্রমাণিত হয় যে, মালাধর তখন জীবিত ছিলেন না। থাকলে তাঁর নামই থাকতো।

বৃষমূর্তি প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাতা খান সত্যরাজ। কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন কে? সে তথ্যও ঐ মূর্তিটির সামনের এক অংশে খোদিত

'নেপালেন বি নির্ম্মিতঃ॥'

১. নন্দলাল বিদ্যাসাগর, হরিদাস দাস, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

কুলীন গ্রামের ঐ শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গের এক পাশে কালো পাথরের একটি মূর্তি মাটিতে বসানো আছে। মূর্তিটির দুপাশে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃতে একটি শ্লোক লেখা আছে। সুকুমারবাবু শ্লোকটির পাঠ ঠিক করেছেন

শ্রীসত্যরাজ খানোহস্যাং প্রতিমায়ামধিষ্ঠি (তঃ)।
শিবপাদোদকাকাংক্ষী খান শ্রীগুণেরাজজঃ ॥[১]

কিন্তু মূর্তির শ্লোকটি খুঁটিয়ে পড়লুম। শুরু হয়েছে 'ওঁ' দিয়ে এবং বিস্মিত হলুম, শেষে লেখা আছে 'গুণিরাজজঃ'। গুণরাজ খানের নাম যে গুণিরাজ তা এই প্রথম পাচ্ছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকলেই মালাধর বসুর উপাধি—নাম 'গুণরাজ খান' বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই শিলামূর্তিতে (মূর্তিটি সত্যরাজ খানের) মালাধরের পুত্র সত্যরাজ পিতার নামোল্লেখ করেছেন 'গুণিরাজ'। তাহলে মালাধর কি কুলীনগ্রামে 'গুণিরাজ' বলে পরিচিত ছিলেন? কিংবা গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণিরাজ' উপাধিই দিয়েছিলেন? যদি তাই হয়, তবে মালাধর গুণরাজ রূপে পরিচিত হলেন কেন? নাকি শিলামূর্তির স্থপতি ভুল লিখেছেন? ভুল হওয়া অসম্ভব। কেননা, সত্যরাজের তত্ত্বাবধানে নিশ্চয় এই মূর্তি তৈরী হয়েছিল এবং মূর্তির দুদিকের পাঠ নিশ্চয় তিনি পড়েছিলেন। পুঁথিতে 'গুণরাজ' ও গুণিরাজ দুরকম পাঠ থাকলে হয়ত সিদ্ধান্ত করা যেত যে, লিপিকর প্রমাদ ঘটেছে। কিন্তু শিলালিপিতে তো এরকম হবার নয়। এখন এই দুটি নামের মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা দেখা যাক। ব্যাকরণ ও অর্থের দিক থেকে দুটি নামই নির্ভুল। কিন্তু গুণরাজের থেকে গুণিরাজ—অর্থাৎ গুণীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ – অধিকতর ভালো পাঠ। কিন্তু মালাধর ভণিতায় 'গুণরাজ'ই ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে এই নামেই জানতেন। সম্ভবত গৌড়েশ্বর মালাধর বসুকে 'গুণরাজ' উপাধিই দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামে ও বংশে তিনি 'গুণিরাজ' রূপে পরিচিত ছিলেন বলে মনে করি।

কুলীনগ্রামে শিলাবৃষের গলদেশে যে শ্লোকটি পেয়েছি তার ১৪২০ লিখনকাল শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ। এটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের লিপি। আগেই বলেছি, সংস্কৃত শ্লোকটি বাংলা অক্ষরে লেখা। সুতরাং এই শ্লোকটির অক্ষর থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর লিপি বৈশিষ্ট্য ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই শ্লোকটি ধরছি এই কারণে যে, এটি সাল তারিখ যুক্ত বাংলা লিপি। এই শ্লোকটিতে স্বরবর্ণ একটিও নেই; তবে স্বরধ্বনির চিহ্ন আছে। চিহ্নগুলি এই ঃ আ - কার, ই - কার, ঈ - কার, উ - কার, এ - কার, ঔ - কার। স্বরধ্বনির চিহ্নগুলির মধ্যে ই - কার চিহ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুভাবে ই - কার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে॥ একটি স্পষ্টত অর্থাৎ মাত্রার মাথার ওপর তোলা। যেমন 'বিংশতি'র ই - কার। অপরটি অস্পষ্টত অর্থাৎ মাত্রার সঙ্গে লাগানো। যেমন 'শিব', শিলার ই - কার। এই ধরনের ই - কার চিহ্নের ব্যবহার (অর্থাৎ মাত্রার সঙ্গে লাগানো) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে (দ্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির ৭৩খ পৃষ্ঠা—'বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।' ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে র - এর পেটকাটা নেই। 'র' ও 'ব' এক। 'র' - এর ফুটকিও নেই। 'ল' 'ন' এক বাঁক যুক্ত। 'ন' চর্যার মতো,[২] 'ল' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো।[৩] 'ত' পঞ্জাকার ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো।[৪]

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বার্ধ, ১৯৭৮, চিত্রাবলী।
২. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫ পৃঃ ৮৮র লিপিচিত্র দ্রষ্টব্য।
৩. ঐ পৃ.৯২
৪. ঐ পৃ.৮৬

কুলীন গ্রামে বসুমূর্তির গলদেশে লেখা শ্লোক

'ত' লেখা হয়েছে এভাবে—মাত্রা থেকে একটি সরু রেখা নীচের দিকে নেমে একটি বিন্দুতে পৌঁছে লেজ পাকিয়েছে। বর্গীয় 'জ' একেবারে চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো। 'জ' এর হাত নীচের দিকে নামানো নেই, মাত্রার নীচে সমান্তরালভাবে অল্প টানা। 'ক' - এর বড় আঁকুড়ি। বড় আঁকুড়ির 'ক' প্রাচীন রীতি। অনুস্বর বোঝানো হয়েছে মাত্রার ওপর বর্ণের মাথায় মোটা ফুটকি দিয়ে। অনেকটা চর্যার মতো। য - ফলাও অনেকটা চর্যার রীতিতে। যেমন "সত্য"-র য - ফলা।

আসল কথা, শিলাবুষের গলদেশে বাংলা লিপির যে ছাঁদ দেখতে পাচ্ছি তা প্রাচীন এবং পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা লিপির ছাঁদ। যদিও শিলালিপিতে ও পুঁথির লিপিতে পার্থক্য সামান্য থাকবেই (একটা শিলায় খোদাই করতে হয়, আর একটা লিখতে হয়) তবুও বলা চলে লিপি-ছাঁদ অনেকটা এক থাকে। কলমের ডগা দিয়ে লেখা লিপি দেখেই তো পাথরে খোদাই করা হয়। তাই লেখার প্রতিফলন শিলালিপিতে ঘটবেই। সুতরাং ১৪২৩ শকাব্দের কুলীনগ্রামের লিপি বাংলাদেশে প্রাপ্ত তারিখযুক্ত একটি প্রাচীন বাংলা লিপি।

পরিষদ-সংবাদ

শোক সংবাদ ঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গত ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে বিভিন্ন অধিবেশনে সমকালে প্রয়াত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাপতি অনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য বীরেন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের আজীবন সদস্য ও শিশুসাহিত্যিক মধুসূদন মজুমদার, প্রখ্যাত যন্ত্র সঙ্গীতশিল্পী রাধিকামোহন মৈত্র, বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রাইচাঁদ বড়াল, বিপ্লবী ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং বাংলাদেশের কবি মোতাহার হোসেনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া শোক জ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়াত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে সেইসব ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

বিশেষ অধিবেশন

গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ (২২ নভেম্বর ১৯৮১) পরিষদ ভবনে সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুকে তাঁহার অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন। ডঃ রমা চৌধুরী স্বাগতবাচন করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করেন পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস।

সভায় শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ প্রতুল গুপ্ত. শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, ডঃআশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃঅজিত কুমার ঘোষ, শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবনী সিংহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রী মনোজ বসুর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সম্বর্ধনার প্রত্যাভিভাষণে শ্রীমনোজ বসু বলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই সম্বর্ধনা তাঁহার জীবনের পরম সম্পদ। সভাপতি ডঃ সেন শ্রী বসুর বিচিত্রপথগামী সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন।

পরিষদ্ প্রকাশনা

(ক) সাহিত্যসাধক চরিতমালার নূতন একটি (দ্বাদশ) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে সাহিত্যসাধক জগদানন্দ রায়, শশাঙ্কমোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং মহম্মদ শহীদুল্লাহ এর জীবন ও সাহিত্যকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(খ) বহুদিন পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত "হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" পনমুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) শ্রী বরেন নিয়োগী সম্পাদিত ভগিনী নিবেদিতার Unpublished notes on some wanderings with Swami Vivekananda গ্রন্থটি পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থটি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

(ঘ) প্রয়াত রামকমল সিংহের পুত্র ও আত্মীয়গণ 'রামকমল সিংহ স্মৃতি তহবিল'-এ বর্তমানে আরও দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত গচ্ছিত তহবিল হইতে রামকমল সিংহ

স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইবে এবং উক্ত বক্তৃতাগুলি "রামকমল সিংহ স্মারক গ্রন্থ" হিসাবে প্রকাশিত হইবে বলিয়া পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

আজীবন সদস্য

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ১৮।১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা নিবাসী শ্রী শ্যামল বসুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আজীবন সদস্যপদ অনুমোদিত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রদান

শ্রী অসিতকুমার সেন, ৮ মথুর সেন, গার্ডেন লেন কলিকাতা-৬ ৮০২ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করিয়াছেন। গত অগ্রহায়ণ মাসের মাসিক অধিবেশনে তাঁহার এই দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।

সাংগঠনিক সংবাদ

(ক) বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য পরিষদের পাঠগৃহে যাহাতে গবেষক-পাঠকদের কার্য বিঘ্নিত না হয় সেজন্য পরিষদ পাঠগৃহে এমার্জেন্সী লাইট ক্রয় করা হইয়াছে।

(খ) পরিষদভবনে বহু অমূল্য গ্রন্থ, পুঁথি ও প্রত্নরাজি আছে। সেজন্য আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে রমেশভবনে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(গ) অশীতিপর বঙ্গ সাহিত্যসেবিগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ঘ) যশস্বী লেখক ও 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পরিষদ ভবনে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পরিষদ ভবনে ওড়িয়া সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৪ এবং ১৫ নভেম্বর, ১৯৮১ পরিষদ ভবনে সর্বভারতীয় ওড়িয়া সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবেশী সাহিত্য উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি সাগ্রহে বিনাভাড়ায় পরিষদের প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সুদৃশ্য বাঁধাই

১ম খণ্ড : টা. ২০.০০ ২য় খণ্ড : টা. ৩০.০০

স্বল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট আছে

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা ১১.০০ ২য় খণ্ড : টা. ৯.০০

বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার (যন্ত্রস্থ)

Unpublished notes of some wanderings with
SWAMI VIVEKANANDA

By Sister Nivedita

Edited by Barendranath Neogy (যন্ত্রস্থ)

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

স্বপ্ন

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : চার টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ—চৈত্র
১৩৮৮

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৮ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ—চৈত্র
১৩৮৮

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

বাংলার মধ্যযুগীয় মন্দিরগাত্রস্থ ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমতঃ, 'মধ্যযুগীয়' বলতে আমরা কি বুঝব সে-সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া ভাল। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ-বিজয় থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'দিওয়ানি'লাভ অবধি সাড়ে-পাঁচশো বছরের কিছু বেশী সময়কে ঐতিহাসিকেরা, প্রায় সর্বসম্মতভাবে, 'বাংলার মধ্যযুগ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আবার, ১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত—অর্থাৎ বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রায় দু'শো বছর ব্যাপ্তিকে 'আধুনিক যুগ' বলাই প্রচলিত প্রথা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য শেষোক্ত সময়কে দু'টি পর্বে ভাগ করেছেন—১৭৬৫ থেকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি প্রথম পর্ব এবং ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব। তারপর থেকে অদ্যাবধি, ৩৪ বছর ব্যাপী স্বাধীনভারত তথা পশ্চিমবাংলার ইতিবৃত্ত, 'আধুনিক যুগে'র অন্তর্গত। কিন্তু এই সর্বাধুনিক দ্বিতীয় পর্বে'র সঙ্গে বর্তমান আলোচনার বিশেষ সম্পর্ক নেই।

মন্দির-ভাস্কর্যে বিধৃত সমাজচিত্রই যখন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তখন নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরাদি যে-কালে লভ্য সেই কালকেই, আজকের আলোচনার প্রয়োজনে, 'মধ্যযুগ' বলে চিহ্নিত করতে হবে। সে-সময়সীমার ব্যাপ্তি কিন্তু, মোটামুটিভাবে, খ্রীস্টীয় ১৭ শতক থেকে ১৯ শতকের শেষ অবধি প্রসারিত, যা ঐতিহাসিকদের দ্বারা স্বীকৃত তথাকথিত 'মধ্যযুগ' থেকে গুরুতরভাবে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ আমরা যে সব মন্দিরের উল্লেখ করব, সেগুলি যেহেতু শেষোক্ত এই তিন শ' বছরের মধ্যেই নির্মিত এবং অল্পাধিক জীর্ণ অবস্থায় এখনও বিদ্যমান, সেজন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁদের যুগ-বিভাগ যে ভাবেই করে থাকুক না কেন, তাঁদের 'মধ্যযুগ' ও 'আধুনিক যুগ' উভয়ের কিয়দংশব্যাপী কালকে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৭ শতক থেকে ১৯ শতক অবধি সময়কে, বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে আমরা মধ্যযুগ বলে ধরব।

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখযোগ্য যে, ইতিহাসকারদের 'মধ্যযুগে' বাংলায় পাথরের মন্দির খুব কমই নির্মিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরও অল্পসংখ্যক যে-কয়েকটি এখনও বিদ্যমান, সেগুলিতে উৎকীর্ণ বিরল মূর্তিভাস্কর্যে সমাজচিত্রের কোন দিকই প্রতিফলিত হয়নি। পরবর্তীকালে, বিভিন্ন সময়ে, বর্ধমানের বরাকরে, মেদিনীপুরের কিছু স্থানে এবং মল্লরাজাদের আমলে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বা অন্যত্র যে সব পাথরের দেবগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের দেওয়ালে সামাজিক ভাস্কর্যে'র নিদর্শন নেই বললেই চলে। অতএব, আজকের বিবেচ্য বিষয় থেকে পাথরের মন্দিরাদি বর্জন করলে বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে, প্রাক্-মোসলেম বা উত্তর-মোসলেম যুগে কিন্তু ১৭ শতকের আগে নির্মিত কিছু ইঁটের মন্দির ভাস্কর্য-অলঙ্কৃত হলেও, সেসব সজ্জা জ্যামিতিক বা ফুলকারি নকশার রূপায়ন মাত্র যার সঙ্গে সমকালীন সমাজ-জীবন একেবারেই সম্পৃক্ত নয়। দৃষ্টান্ত—দক্ষিণ-২৪-পরগণার জটা, বর্ধমান জেলার আঝাপুর, বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া ও সোনাতপল এবং পুরুলিয়া জেলার বড়াম, পারা প্রভৃতি স্থানের ইঁটের প্রাচীন দেউলগুলি। সেসব নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র বহুলাড়ার মন্দিরে কুলুঙ্গির মধ্যে দু' একটি মূর্তি-ভাস্কর্য দেখা যায় বটে যার সদৃশ উদাহরণ সেকালে আর মেলে

না। অতএব, 'মধ্যযুগীয় মন্দির ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্রে'র খোঁজ করতে হলে, আমাদের অভিনিবেশ শুধু ১৭ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে নির্মিত দেবালয়ে নিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, কার্যতঃ, সেই সময়সীমার অন্তর্গত এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যে অলংকৃত মন্দিরগুলিতেই কেন্দ্রীভূত হতে হবে। বলা বাহুল্য, পলস্তারা আবৃত অথবা ভাস্কর্যবিহীন অসংখ্য দেবসৌধ বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। আবার, আলোচ্য সময়ের শেষ ভাগে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-শিল্পের অবনতিকালে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৮-১৯ শতকে, কিছু কিছু দেবালয়ে যে পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায়, তার প্রতিও আমাদের মনোযোগ দেওয়া নিরর্থক, যেহেতু তাতে দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনী এবং নানাবিধ নকাশি সজ্জাই স্বল্প পরিমাণে রূপায়িত হয়েছে, সমাজচিত্রণের সেখানে নামগন্ধও নেই।

এ তো গেল কোন্ কালের এবং কোন্ শ্রেণীর মন্দির ভাস্কর্যকে আমরা প্রাসঙ্গিক মনে করব তার সংজ্ঞার্থ। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমরা এই অবতরণিকা অংশ শেষ করতে পারি। পরিষদের প্রতি কিছুমাত্র কটাক্ষ না করেই বলি, "মন্দিরগাত্রস্থ ভাস্কর্য" বলতে তাঁরা বাস্তবিকভাবে যা বোঝাতে চেয়েছেন, আজকের আলোচনায়, উল্লিখিত বাদবিচার সাপেক্ষে তাকেই আমরা টেরাকোটা-ভাস্কর্য, টেরাকোটা-অলংকরণ বা টেরাকোটা-সজ্জা নামে অভিহিত করব। মূলে ইতালীয় 'টেরাকোটা' শব্দটি আমরা ইংরেজী মারফত পেয়েছি যার অর্থ—সেঁকা বা পোড়ানো মাটি। যেহেতু বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত কারুকৃতি এই উপাদানেই তৈরী, সেজন্য—অন্ততঃ উচ্চারণ ও লেখার সুবিধার্থে—এই বিকল্প অভিধার ব্যবহারই হয়ত সমীচীন। একাংশে বিদেশী শব্দের উপস্থিতিতে সম্ভাব্য আপত্তিকারীদের জানাই, অফিসপাড়া, হোটেল-কক্ষ, টেলিফোন-বার্তা, রেডিয়ো-সঙ্গীত, সিনেমা-জগৎ, পাতাল-রেল, ট্রেন যাত্রী, ভোটগণনা, যুক্তফ্রন্ট, পুলিশ-বাহিনী, লাঠিচার্জ, প্রভৃতি অজস্র ইঙ্গ-বঙ্গ শব্দ তো এখন পুরোপুরিভাবে বাংলায় গৃহীত। অনুরূপ বহুলব্যবহারের ফলে, ইঁটের মন্দিরে টেরাকোটা-অলংকরণ বলতে কি বোঝায়, তা অনুধাবন করতে আজকের বাঙালী পাঠকের কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়।

সেঁকা বা পোড়ামাটির উপাদানে ইঁটপাটকেল, হাঁড়িপাতিল থেকে শুরু করে অসংখ্য রকম খেলনাপুতুল পশুপক্ষী, নরনারী, যক্ষ-যক্ষী, গন্ধর্ব-কিন্নর, দেবদেবী বা অন্যবিধ মূর্তি "ইন দ্য রাউন্ড" বা আস্ত আকারে নির্মিত হয়ে এসেছে সভ্যতার একেবারে আদিযুগ থেকে। কিন্তু ধর্মীয় ইমারতে একই উপকরণের ব্যবহার কিছু পরবর্তী কালের যার অভিজ্ঞানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রে। প্রধানতঃ স্থূল আকারের ইট বা টালির গায়ে নতোন্নত অর্থাৎ 'বা রিলিফ' পদ্ধতিতে রচিত সেসব টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিরল চিহ্ন ভূমধ্যসাগরীয় সুপ্রাচীন সভ্যতাস্থলগুলিতে লক্ষ করা গেলেও, তুলনায় পর্যাপ্ততর নিদর্শন কিন্তু পাওয়া গেছে প্রাচীন ভারতের ভিটা, অহিচ্ছত্র, রাজগীর, ভিতরগাঁও, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতী প্রভৃতি ধর্মকেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু খ্রীস্টীয় ১৭ থেকে ১৯ শতক অবধি সময়ে, অর্থাৎ বর্তমান আলোচনার জন্য স্থিরীকৃত কালে, এই বিশেষ শিল্পপ্রকরণটি অনুশীলিত হয়েছে সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশে ও তার অব্যবহিত সন্নিহিত অল্প কিছু এলাকায় যা এখন ওড়িশার মধ্যে পড়ে। অতএব, একথা হয়ত না বললেও চলে যে, মন্দির, মসজিদ, সমাধিসৌধ প্রভৃতি ধর্মীয় ইমারতে নিবদ্ধ টেরাকোটা-সজ্জার যেসব নিদর্শন এখনও বিদ্যমান তা বাঙালী-মনীষার এক অত্যুত্তম কীর্তি এবং বঙ্গসংস্কৃতির এক অতুলনীয় সম্পদ।

এই অনুপম ঐশ্বর্যের শ্রেণীবিভাগ ও মন্দিরগাত্রে তাদের সংস্থাপন-রীতি প্রভৃতি

প্রসঙ্গে আসবার আগে কি রকম স্থাপত্যশৈলীর ইমারতে তারা নিবদ্ধ হত সে-বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। কেননা, সমাজজীবনঘটিত বিশেষ বিশেষ ভাস্কর্যের যখন উল্লেখ করব, তখন সেগুলি কোথাকার, কি-গড়নের দেবালয়ে উৎকীর্ণ হয়েছে তা-ও বলবার অবকাশ হবে এই কারণে যে, সরকারী ও বেসরকারী অবহেলায় আমাদের দেখা অলংকরণগুলি এখন অমোঘভাবে বিলুপ্তির পথে চলেছে এবং কালক্রমে যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে তাতে সন্দেহ নেই। পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন, এই ভাষণ তাঁদের ত্রৈমাসিক মুখপত্রে প্রকাশিত হবে। আমার অভিপ্রায়, উত্তরকালে এসব অসামান্য কারুকৃতি যখন থাকবে না, তখনকার সংস্কৃতি-সন্ধানীরা যেন বিগতদিনের এই মহৈশ্বর্য সম্পর্কে কিছু বিশদ তথ্য পান সেই মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে। আলোচ্য মন্দিরগুলির গঠনপ্রকরণের হদিস এজন্য প্রাসঙ্গিক।

ওড়িশার মন্দিরস্থাপত্যপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত খাড়া চূড়াযুক্ত বহু মন্দির একদা নির্মিত হয়েছে বঙ্গদেশে। বস্তুতঃ, আমাদের প্রাচীনতম ইঁটের দেবসৌধগুলির প্রায় সবই এই গঠনশৈলীর। পরবর্তীকালে অবশ্য অঞ্চলভেদে এই দেউল-রীতির রকমফের হয়েছে অল্পবিস্তর, কিন্তু মূল কাঠামোটি মোটামুটিভাবে বজায় থেকেছে। বাংলার অধিকাংশ ইটের মন্দির কিন্তু 'চালা'-শৈলীতে নির্মিত যার প্রেরণা স্থানীয় স্থপতিরা আহরণ করেছেন পূর্বতন এবং সর্বত্র বিরাজমান কুঁড়েঘরের আদল থেকে। বাঁকানো শীর্ষ এবং দুপাশে নিবদ্ধ দুটি ঢালু চালার সমন্বয়ে গঠিত মন্দিরের নাম হয়েছে দোচালা বা একবাংলা। এই রীতির দেবালয় অল্পই নির্মিত হয়েছে বাংলা দেশে এবং ইমারতি অদৃঢ়তার জন্য বিনষ্টও হয়েছে অধিক সংখ্যায়। যে-কয়েকটি টিকে আছে এখনও, তাদের মধ্যে হুগলি জেলার চন্দননগর শহরে অবস্থিত নন্দদুলাল মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ। দুটি একবাংলা গায়ে-গায়ে স্থাপন করে তৈরী হয়েছে জোড়বাংলা দেবালয়, যার সর্বোত্তম নিদর্শন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কেষ্ট রায় মন্দিরটি, যা সাধারণ্যে শুধু 'জোড়বাংলা' নামেই পরিচিত। এই শ্রেণীর দেবগৃহও এখন বেশী অবশিষ্ট নেই। আবার, চারদিকের চারটি ঢালু চালকে চূড়ার শীর্ষবিন্দুতে মিলিত করিয়ে যে-সৌধের সৃষ্টি, তাকে বলা হয়েছে চারচালা, যেহেতু অনুরূপ গঠনের কুঁড়েঘরগুলিরও একই নাম। এই রীতির বহু মন্দিরের মধ্যে সর্বোচ্চটির দেখা মেলে বীরভূম জেলার ডাবুক গ্রামে। আটচালা-মন্দির চারচালারই পরিবর্ধিত রূপ যেখানে নীচের চারটি ঢালু চালের উপরে অল্প উচ্চতার চারটি খাড়া দেওয়াল তুলে তার উপর দ্বিতীয় স্তরের আর-চারটি হ্রস্বাকার চালা বিন্যস্ত করাই রীতি। এই শ্রেণীর অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে কলকাতা-কালীঘাটের কালী-মন্দিরটি সর্বজনপরিচিত। আটচালার শীর্ষে, একই ভাবে, আরও চারটি চালার সংযোগে সৃষ্ট বারোচালা মন্দির খুবই বিরল। চালা-মন্দিরের এসব প্রকারভেদ ছাড়া অপর প্রধান 'গ্রুপ'-এর নাম রত্ন-মন্দির, যে-বর্গে চূড়ার সংখ্যার ইতরবিশেষ অনুসারে নামকরণের ভিন্নতা দেখা যায়। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত (আধুনিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে কার্নিস সমান্তরালও হতে পারে) ছাদের কেন্দ্রে একটি মাত্র চূড়া থাকলে তাকে বলা হয় একরত্ন, আর ছাদের চার কোণে যদি অপেক্ষাকৃত ছোট আর চারটি অতিরিক্ত চূড়া থাকে তবে তার নাম হয় পঞ্চরত্ন। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মল্ল-মন্দিরই একরত্ন কিন্তু সেখানকার সুবিখ্যাত শ্যামরায় দেবসৌধটি পঞ্চরত্নরীতির। পঞ্চরত্ন-মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়াটির স্থানে এক দোতলা কুঠরি বানিয়ে তার ছাদের চার কোণায় চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে কেন্দ্রীয় চূড়াটি বসালে তৈরি হবে নবরত্ন-দেবালয় যার সুপরিচিত নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর মন্দির। এইভাবে তলের সংখ্যা বাড়িয়ে অথবা প্রতি তলের কোণায় একাধিক ছোট চূড়া নিবদ্ধ করে,

ত্রয়োদশ, সপ্তদশ, একবিংশতি বা পঞ্চবিংশতিরত্ন-মন্দিরও একদা নির্মিত হয়েছে অল্পবিস্তর, যেগুলির মধ্যে তেরো, সতরো ও একুশ-চূড়াযুক্ত দেবসৌধ এখন খুবই বিরল। তবে, পঁচিশ-চূড়াওয়ালা কয়েকটি অবশিষ্ট আছে বাঁকুড়ার সোনামুখি, হুগলির সুখাড়িয়া ও বর্ধমানের কালনায়। সমতল ছাদের ও সাধারণতঃ সমান্তরাল কার্নিসের দালান-মন্দিরগুলি এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পড়ে। এই রীতির অজস্র দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্রীস্টীয় আঠারো ও উনিশ শতকে যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নিদর্শনটি দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরে অবস্থিত।

গড়ন ভিন্ন হলেও সবরকম মন্দিরেই পোড়ামাটির সজ্জা উৎকীর্ণ হয়েছে। তাদের নিজ নিজ অবস্থান ও স্থাপত্যরীতি, আমাদের বিষয়ীভূত টেরাকোটা-প্যানেলগুলির আলোচনার সময় উল্লিখিত হবে। এসব অলংকরণে রূপায়িত কৃষ্ণলীলার অগণিত দৃশ্য, শৈব-শাক্ত বৈষ্ণব ধর্মমত নির্বিশেষে নানান পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য আশ্রিত বহু উপাখ্যান এবং অজস্র ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশা ছাড়া, সেকালের সমাজজীবনঘটিত যে অসংখ্য চিত্রকল্প দেখা যায়, তা-ই বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়।

সাধারণতঃ সামনের দেওয়ালে, অর্থাৎ ঢোকবার দ্বার যেদিকে সেদিকের দেওয়ালে, এসব রকমারি টেরাকোটা-অলংকরণ বিন্যস্ত হয়েছে। সামনের অংশে কোন অলিন্দ বা ঢাকা-বারান্দা থাকলে, সাধারণতঃ তার সদর-দেওয়ালের মাঝামাঝি স্থানে নিবদ্ধ দুটি পূর্ণ-স্তম্ভ ও প্রান্তবর্তী দেওয়ালসংলগ্ন দুটি অর্ধস্তম্ভের উপর রক্ষিত পাশাপাশি তিনটি খিলানশীর্ষ-প্রবেশ-পথ পার হয়ে প্রথমে সেই বারান্দায় ও তারপর একদুয়ারী প্রবেশপথে ঢুকতে হত ঠাকুরঘরে। এসব ক্ষেত্রে, একেবারে বাইরের দেওয়াল (বিরল ক্ষেত্রে অলিন্দের ভিতরের দেওয়ালও) এবং স্তম্ভগুলি মণ্ডিত হয়েছে টেরাকোটা-ভাস্কর্যে। অলংকরণ-বিন্যাসের এই আদর্শপদ্ধতি বা 'স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন'-এর বহুবিধ রকমফেরও দেখা যায়, যার বিবরণ বর্তমান আলোচনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। আবার, সদর অংশ ছাড়া অন্য দিকের এক বা একাধিক দেওয়ালও অলংকৃত হয়েছে কিছু কিছু মন্দিরে যারা সংখ্যায় বেশী নয় এবং যাদের কথা, পরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব।

মন্দিরের ভিত্তিবেদীসংলগ্ন অংশ থেকে শুরু করে ছাদের বাঁকানো কার্নিসের (দালান মন্দির এবং কিছু অর্বাচীন চালা বা রত্ন-মন্দিরের ক্ষেত্রে অনুভূমিক কার্নিসের) তলা অবধি টেরাকোটা-সজ্জায় আবৃত করবার সময়ে কিন্তু সংস্থানগত কিছু প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। যেমন, ভিত্তিতলের সমান্তরাল সর্বনিম্ন সারিটিতে অলংকরণবহুল সৌধ হলে তার উপরের দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় সারিতেও—সমকালীন সমাজজীবনের বহুবিধ দৃশ্য সাধারণতঃ নিবদ্ধ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, তার উপরিস্থ আর একটি সমান্তরাল সারিতে ফুলকারি নকশা, যূথবদ্ধ পশুপক্ষী বা কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ দেখা যায়। থামগুলির গায়ে কৃষ্ণলীলা বা সপুত্রকন্যা দুর্গা, খিলানের নিম্নপ্রান্তের বক্ররেখা বরাবর নকাশি কাজ বা প্রতীক শিবমন্দির প্রভৃতি এবং খিলানশীর্ষের প্রশস্ত অংশ জুড়ে কুরুক্ষেত্রসমর, লঙ্কাসংগ্রাম, দেবীযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, পুরাণকাহিনী বা শুধু ফুলকারি সজ্জা স্থান পেয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। খিলানের দু'পাশের দেওয়ালে একটি, দুটি বা কদাচিৎ আরও বেশী, খাড়া সারিতে নানারকম একক মূর্তি—যথা দশাবতার, বিবিধ পৌরাণিক বা সামাজিক চিত্র—স্থাপিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন খোপের মধ্যে যার চারদিক ঘিরে থাকে ফুলকারি নকশার বেষ্টনী। খাড়া সারিতে নিবদ্ধ এসব কুলুঙ্গি-ভাস্কর্য বা 'নিচ্ প্যানেল' আবার কার্নিসের তলা দিয়ে ঘুরে এসেছে

সমান্তরালভাবে। কিছু মন্দিরে সদর দেওয়ালের দুই প্রান্তে একাধিক অনুভূমিক সারিতে, নানান মূর্তি-ভাস্কর্য দেখা যায়, যার মধ্যে সমাজচিত্র বিরল নয়। প্রধান অলংকরণগুলির এহেন প্রথাগত সন্নিবেশের বাইরের খালি জায়গাগুলি ভরাট করা হয়েছে ফুলকারি বা জ্যামিতিক সজ্জার অজস্র প্যানেল ও পটি দিয়ে। টেরাকোটা-অলংকরণ বিন্যাসের এই স্থূল ও অতি-সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে, সব মন্দিরেই বুঝি একই "স্ট্যাণ্ডার্ড" রীতি অনুসৃত হয়েছে। বস্তুতঃ, ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত এতই অগণিত যে, বর্তমান আলোচনায় সে-প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। তবে সমাজজীবনঘটিত প্যানেলগুলির যত্রতত্র অবস্থান বিষয়ে কিছু টীকা প্রাসঙ্গিক। তাদের প্রধান প্রাপ্তিস্থল মন্দির-মূলের অনুভূমিক সারি বা 'বেস-ফ্রীজ' গুলি হলেও, কুলুঙ্গি মধ্যে খিলানশীর্ষে, প্রান্তীয় প্যানেলে বা অন্যত্র তাদের দেখা মেলা মোটেই অভাবনীয় নয়। আমরা পর্যায়ক্রমে সেসব ভাস্কর্যের যখন বিবরণ দেব, তখন প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত নানা জায়গায় তাদের অবস্থান নির্দেশ করবার অবকাশ হবে।

আমাদের আলোচ্য কালসীমার মধ্যে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৭ থেকে ১৯ শতক অবধি সময়ে, বাঙালীর সমাজজীবন যা ছিল মন্দির-টেরাকোটায় তার সর্বাঙ্গীন প্রতিফলন ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। যেমন বাঙালীর সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষিকার্যের কোনপ্রকার রূপায়ণ এসব ভাস্কর্যে কুত্রাপি উৎকীর্ণ হয়েছে বলে আমাদের অন্ততঃ জানা নেই। হাটে-বাজারে কেনাবেচা বা মেলা প্রভৃতিতে জনসমাগমের দৃশ্যও নেই বললেই চলে। এসব ব্যতিক্রম আশ্চর্য হলেও সত্য। এজাতীয় দৃষ্টান্ত আরও আছে। কেন এ-রকমটি হয়েছে, তার কারণ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা আমরা যথাস্থানে করব। আপাততঃ এটুকু বলা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত কালে বাঙালীর সমাজজীবনের যে যে দিক মন্দির-টেরোকোটায় স্থান পেয়েছে, বর্তমান আলোচনা, স্বতঃসিদ্ধভাবে, শুধু সেই সব বিষয়েই নিবদ্ধ থাকবে। বাঙালীজীবনে ছিল অথচ পোড়ামাটি সজ্জায় নেই, এমন সব অলীক প্রসঙ্গ উত্থাপন করা বুনো হাঁসের পেছনে ছোটারই শামিল হবে।

আমাদের-দেখা কয়েক হাজার টেরাকোটা-মন্দিরের নজিরে বলা যায়, প্রধানতঃ নিম্ন-লিখিত বিষয়বস্তুগুলি অসংখ্য দেবালয়-অলংকরণে অল্পাধিক পরিমাণে রূপায়িত হয়েছে। যথা—বাঙালীর দেবলোক ও ধর্মজীবন এবং সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণলীলা এবং রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-মঙ্গলকাব্য-পাঁচালি-কীর্তন প্রভৃতির প্রভাব; পূজা-পার্বণ; সেকালের অভিজাত-শ্রেণী ও ফিরিঙ্গী-সম্প্রদায় এবং তাদের যুদ্ধবিগ্রহ, শিকার, খেলাধুলা ও ব্যবহৃত যানবাহন প্রভৃতি; নারীপুরুষের বেশভূষা, অবসর-বিনোদনপ্রণালী ও গীতবাদ্য নৃত্যচর্চা; সাধারণ জনগণের সামাজিক, আর্থনীতিক ও ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি। বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিধি এভাবে স্থিরীকৃত হবার পর, আমরা এখন বিষয়বস্তুগুলির দফাওয়ারি বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে পারি।

আমাদের আলোচ্য কালের শুরুতে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৭ শতকে, বাঙালী হিন্দুর দেবলোক ও ধর্মজীবন যে আজকের থেকে খুব ভিন্ন ছিল এমন মনে হয় না। অব্যবহিত পূর্বের হিন্দু সেন-বর্মণ রাজকুলের পৃষ্ঠপোষিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্মই ছিল তখন সবচেয়ে প্রভাবশালী, যার শাক্ত-তান্ত্রিক অঙ্গের অনুরাগী ছিলেন সমাজের উঁচুতলার অধিকাংশই। শৈবমত প্রধানতঃ লিঙ্গপূজার মাধ্যমে প্রচলিত থাকলেও, বাঙালীর শিব কিন্তু তার পৌরাণিক আকার প্রকারের অতীতে, এক আত্মভোলা, সংসারভারে বিব্রত সাধারণ গৃহস্বামী-

রূপেই কল্পিত। 'গম্ভীরা' প্রভৃতি শিব-বন্দনার আসরে তাঁকে এতাবৎকালতো দেখানোই হচ্ছে এক নেশাখোর, বাউণ্ডুলে খ্যাপার নরমূর্তিতে। পক্ষান্তরে, সাবেক বৈষ্ণব-মতের বিরাট পরিবর্তন ঘটে শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় ও অব্যবহিত পরবর্তী কালে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৬-১৭ শতকে, যখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্থানক বাসুদেব-মূর্তিপূজার প্রাচীন ধারাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রযত্নে রূপান্তরিত হয় যুগল রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের উপাসনায়।

কিন্তু নৃতাত্ত্বিকদের মতে, বাঙালী জনগণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণে উদ্ভূত প্রাগার্য জাতির বংশধর। তাঁদের আদিম ধর্মজীবনের উপর, যুগে যুগে, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের প্রলেপ পড়েছে বারংবার। আর্যীকরণের সেই প্রবল ও অবিরাম স্রোতের মুখে তাঁরা আপস করেছেন, সমন্বয় করেছেন কিন্তু উন্মূলিত হয়ে ভেসে যান নি একেবারে। ফলে, উঁচুতলার আরাধ্য দেবতাদের গড় করলেও, ধর্মঠাকুর, বিবিধ প্রকার চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, বাসুলী, রঙ্কিনী, ভাদু, টুসু, বর্নাবীব, পঞ্চানন্দ, ঘণ্টাকর্ণ, জ্বরাসুর, দক্ষিণরায়, কালুরায় প্রভৃতি অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীকে তাঁরা পরিত্যাগ করেন নি।

এসব ধর্মমত টেরাকোটা-ভাস্কর্যে রূপায়িত হবার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু উপাসিত দেবদেবী ও তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত নানান কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণ অবশ্যই সম্ভব এবং তা করাও হয়েছে অগণিত সংখ্যায়। সে সব দৃষ্টান্তে অবস্থানগত উল্লেখের আগে, সেকালের, অর্থাৎ ১৭ থেকে ১৯ শতক অবধি সময়ে, বাঙালী দেবলোকে অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রীদের খুব সংক্ষিপ্ত একটু আদমশুমারি করে নেওয়া সঙ্গত। বৈদিক দেবদেবী ইন্দ্র, মিত্র, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, বায়ু, রুদ্র, যম, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, ঊষা, পৃথ্বী প্রভৃতির পূজা তখন লোপ পেয়েছিল বলে মন্দির দেওয়ালে তাঁরা স্থান পাননি। কিন্তু ইন্দ্র ছাড় পেয়েছিলেন পৌরাণিক দেবতারূপে, যে-বর্গে আরও ছিলেন ব্রহ্মা, বাসুদেব-বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, বলরাম বিশ্বকর্মা, কার্তিক, গণেশ, কালী, তারা, চণ্ডী, অম্বিকা, বিশালাক্ষী, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতিরা। এঁদের মধ্যে স্থায়ী মন্দিরে অল্পবিস্তর পূজিত হয়েছেন শুধু বিষ্ণু (নানা নামের শালগ্রামশিলা রূপে), শিব (প্রধানতঃ লিঙ্গরূপে), কৃষ্ণ (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বত্রই রাধিকাসহ যুগলরূপে), রাম (বহুক্ষেত্রে, সীতা-লক্ষ্মণ-হনুমানসমেত), কালী ও তারা (প্রধানতঃ তন্ত্রোক্তরূপে), চণ্ডী (প্রায়শঃ জয়চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি লৌকিকরূপে) এবং বিশালাক্ষী ও অন্নপূর্ণা অত্যল্প কয়েকটি মন্দিরে। অবশিষ্টদের জন্য—তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, দুর্গা প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বা জনপ্রিয় দেবদেবীও আছেন—কখনও কোন টেরাকোটা-দেবালয় নির্মিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। লৌকিক দেবদেবীকুলে সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী মনসার স্থায়ী মন্দিরও আমরা দেখিনি। কিন্তু তাঁরই এক বিকল্প রূপ, সপ্তনাগছত্রধারিণী জগদ্গৌরীর, কয়েকটি পাকা মন্দির আছে রাঢ় অঞ্চলে যেগুলিতে টেরাকোটা-সজ্জা নেই। ইটের মন্দিরে ধর্মরাজও কয়েক স্থানে উপাসিত, কিন্তু সেসব দেবালয়ে পোড়ামাটির অলংকরণ কদাচিৎ দেখা যায়। শীতলা, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ প্রভৃতিরও কোনও টেরাকোটা-মন্দির নেই।

বাঙালীর-দেবলোকের এসব অধিবাসীদের টেরাকোটা-ভাস্কর্য কোথায় কোথায় এবং কি ভাবে স্থান পেয়েছে, এবার তা দেখা যাক। বলা বাহুল্য, সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্যের সংখ্যা এতই সুপ্রচুর যে, তাদের মধ্যে যেগুলি একান্ত বিশিষ্ট তারও কিয়দংশ মাত্র বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব হবে।

পৌরাণিক ত্রিমূর্তির প্রথম দেবতা ব্রহ্মাকে দিয়েই শুরু করি। অল্পসংখ্যায় হলেও

তিনি সর্বত্রই চতুর্মুখ ও হংসবাহনরূপে উৎকীর্ণ হয়েছেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি দেখা যায় হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার একরত্ন রামচন্দ্র-মন্দিরের সামনের দেওয়ালে। আর-একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে বীরভূমের জেলা-সদর সিউড়ির সোনাতোড়পাড়ায় অবস্থিত পরিত্যক্ত আটচালা-মন্দিরটির খিলানশীর্ষে। ইন্দ্রও বিরলভাবে রূপায়িত হয়েছেন ঐরাবতবাহন মূর্তিতে যার একটি সুন্দর ভাস্কর্য ক্ষোদিত হয়েছে বীরভূম জেলার ঘুড়িষার চারচালা শিব-মন্দিরের পাশের দেওয়ালে। পোড়ামাটির বিষ্ণুমূর্তি সংখ্যায় অনেক বেশী এই কারণে যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি-সাবেক বাসুদেব-বিষ্ণুর এই দশ অবতারের প্রতিকৃতি রূপায়িত হয়েছে অজস্র মন্দিরে। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের একরত্ন মদনমোহন-মন্দিরের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ আছে বিভিন্ন কুলুঙ্গি-প্যানেলে। অন্যত্র তাঁকে দেখানো হয়েছে প্রধানতঃ গরুড় বাহনরূপে অথবা অনন্ত নাগশয্যাশায়ী হিসাবে। প্রথম রূপে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপটি উৎকীর্ণ হয়েছে গুপ্তিপাড়ার একরত্ন রামচন্দ্র মন্দিরের খিলানশীর্ষে খুব বড় মাপের এক টালিতে যেখানে তাঁর দুপাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীও উপস্থিত। দ্বিতীয় রূপের অন্যান্য আলেখ্যের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার হদল-নারায়ণপুরের নবরত্ন মন্দিরের সম্মুখভাগে নিবদ্ধ চিত্রকল্পটি উল্লেখনীয়। লিঙ্গরূপী শিবের মাথায় ভক্ত জল ঢালছেন এ-দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু লিঙ্গরূপে তিনি বিপুল সংখ্যায় ক্ষোদিত হয়েছেন এক প্রতীকী নকশা হিসাবে, যেখানে খুব ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত শিবলিঙ্গ প্রবেশ-খিলানগুলির নীচের প্রান্ত বরাবর গ্রথিত হয়েছে। এই অলংকরণ রীতিটি যে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব দেবালয় নির্বিশেষে সর্বত্র প্রযুক্ত হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় কেননা এই নজির, সময়ে সময়ে বিবদমান, সেসব ভিন্ন মতের মূলগত সম্প্রীতির সূচক। পৌরাণিক শিব প্রায়শঃ নরদেহে উৎকীর্ণ হয়েছেন একক বা গৌরীসহ বৃষবাহনরূপে অথবা বিবাহের আসরে বরবেশে। প্রথম পর্যায়ের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যটি নিবদ্ধ আছে ঘুড়িষার চারচালা শিব-মন্দিরের সামনের দেওয়ালে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট প্যানেল দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে অবস্থিত পঁচিশরত্ন শ্রীধর-মন্দিরের খিলানশীর্ষে। শেষোক্ত চিত্রকল্পে জটাধারী, নাগভূষণ, স্থূলোদর শিব উলঙ্গ, যা দেখে বিবাহবাসরে সমবেত পুরনারীরা লজ্জায় অধোবদন। হুগলি জেলার মালঞ্চ গ্রামের আটচালা শিবমন্দিরে বৃষবাহন এক-মহাদেবমূর্তির পাঁচটি পৃথক মুণ্ড দেখানো হয়েছে। পঞ্চানন-এর এহেন রূপায়ণ অতি বিরল। শিবের আর-একটি অনুপম ভাস্কর্য আছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরের দোতলার ভিতরের দেওয়ালে, যেখানে তিনি পদ্মাসীন, চতুর্ভুজ এক হরিহরমূর্তির অংশরূপে উৎকীর্ণ। সেই যুগ্ম-বিগ্রহের বাম অংশ হরের ; তাঁর উপর-হাতে শিঙা, নীচের হাতে ডমরু, পদতলে বৃষ ; আর ডান অংশ হরির, যার উপর-হাতে শঙ্খ, নীচের হাতে চক্র, পায়ের নীচে গরুড়। মন্দির টেরাকোটায় এহেন আশ্চর্য চিত্রকল্প একান্ত দুর্লভ।

রাম, বিষ্ণুর রূপভেদে, দশাবতারের অন্যতম হিসেবে, এককভাবে উৎকীর্ণ হয়েছেন বহুক্ষেত্রে। তা ছাড়া, প্রায় সর্বত্রই, তাঁর আবির্ভাব রামায়ণের কোন-না-কোন-কাহিনী অবলম্বনে। সেকালের জনজীবনে রামায়ণের প্রভাবের কথা পরে যখন আলোচনা করব, তখন এ-বিষয়ে বিশদভাবে বলবার অবকাশ হবে।

সিদ্ধিদাতা গণেশের মঙ্গলসূচক একক মূর্তি কদাচিৎ কেন্দ্রীয় খিলানশীর্ষে স্থাপিত হলেও, তিনি এবং কার্তিক প্রায়শঃই উপস্থাপিত হয়েছেন দুর্গা-প্যানেলের যথাস্থানে দেবীর

পুত্ররূপে। সিউড়ির সোনাতোড়পাড়া-মন্দিরের সামনের দেওয়ালে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অনন্ত-বিষ্ণুর পার্শ্ববর্তী টালিতে এই দুজনের যে স্বতন্ত্র মূর্তি দেখা যায় তা ব্যতিক্রম মাত্র। পরে উল্লিখিত সপরিবার মহিষমর্দিনী-প্রতিমাগুলিতে কার্তিক-গণেশের উপস্থিতি ধরে নিলে ভুল হবে না।

শাক্ত দেবীদের মধ্যে, মহিষমর্দিনী দুর্গাই টেরাকোটা-ভাস্কর্যে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছেন। অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁকে দেখানো হয়েছে সপরিবারে একটিমাত্র প্যানেলে। এহেন রূপায়ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি হুগলি-বাঁশবেড়িয়ার একরত্ন বাসুদেব-মন্দিরের সামনের এক পূর্ণস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ। প্রসঙ্গতঃ, দুর্গা-প্যানেলগুলি প্রায়শঃ স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত হয়েছে যদিও অলংকৃত দেওয়ালের অন্যত্রও তাদের দেখা মেলে। এই অবস্থান ব্যতিক্রমের খুব ভাল একটি দৃষ্টান্ত আছে হুগলি জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জের পরিত্যক্ত জোড়বাংলা 'দুর্গামণ্ডপে' যেখানে সামনের কার্নিসের নীচ-বরাবর এক দীর্ঘ প্যানেলে, খুব বড় বড় মূর্তিতে কেন্দ্রীয় মহিষমর্দিনীর দুপাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশকে নিবন্ধ করা হয়েছে। আবার, দুর্গা-পরিবার অনুরূপভাবে স্বতন্ত্র টালিতে উৎকীর্ণ হলেও হুগলি জেলার আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীউর আটচালা-মন্দিরে কিন্তু স্থাপিত হয়েছে এক পূর্ণ-স্তম্ভের সামনের অংশে। দেবী প্রায় সর্বত্রই দশভুজা, কিন্তু ব্যতিক্রমের নজিরও আছে। যেমন, মেদিনীপুরের মাংলোই গ্রামের নবরত্ন মন্দিরের এক ফলকে তিনি অষ্টাদশভুজা ও পুত্রকন্যাবর্জিতা। অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে তাঁর রূপায়ণ খুবই বিরল, একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন অবশ্য আছে হুগলি জেলার বিক্রমপুরের আটচালা বিশালাক্ষী মন্দিরের সামনের দেওয়ালে লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্বতন্ত্র মূর্তি কদাচিৎ দেখা গেলেও দুটি পৃথক কুলুঙ্গি প্যানেলে তাঁদের অতি-সুন্দর-ভাস্কর্য নিবন্ধ আছে ঘুড়িষার শিবমন্দিরে।

সংখ্যার হিসাবে কালী-ভাস্কর্যের স্থান দুর্গার পরেই। শিবের বুকে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁকে কখনও কখনও দেখানো হয়েছে, যেমন সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরে। কিন্তু রণক্ষেত্রে রণরঙ্গিনীরূপে তিনি প্রায়শঃ আবির্ভূতা। এই চিত্রকল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি দেখা যায় আঁটপুরের মন্দির-অলিন্দের ডান-দিকের খিলানশীর্ষে যেখানে অতি-বৃহৎ এক প্যানেলে ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃত তাঁর লোলজিহ্ব, রণচণ্ডী মূর্তিটি টেরাকোটা-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। রণোন্মত্তা কালীর আর একটি উৎকৃষ্ট প্রতিমা আছে পুরুলিয়ার চেলিয়ামা গ্রামে অবস্থিত আটচালা রাধাবিনোদ মন্দিরের খিলানশীর্ষে।

অন্যান্য শাক্ত দেবীর মধ্যে বিশালাক্ষী বা বিবিধ চণ্ডীমূর্তি প্রায় অনুপস্থিত হলেও, জগদ্ধাত্রী, দশমহাবিদ্যা ও মাতৃকামূর্তির কিছু ব্যবহার দেখা যায় যেমন, বীরভূম জেলার ইলামবাজারে অবস্থিত রামেশ্বর-শিবের দেউলে।

প্রধানতঃ এইসব দেবদেবী স্বতন্ত্রভাবে উৎকীর্ণ হলেও তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু জনপ্রিয় পৌরাণিক উপাখ্যানও রূপায়িত হয়েছে টেরাকোটা-ভাস্কর্যে। যথা, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব সমুদ্রমন্থন, শিববিবাহদৃশ্য, অন্নপূর্ণাসমীপে ভিখারী শিব, পারিজাত বৃক্ষের দখল নিয়ে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধ, দেবীর শুম্ভনিশুম্ভবধ প্রভৃতি।

সেকালের বর্ণশাসিত সমাজের উঁচু তলায় উপাসিত সুরলোকবাসীদের মূর্তি যে বিত্তবানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে স্থানলাভে অগ্রাধিকার পাবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু নীচুতলায় পূজিত অসংখ্য দেবদেবী—যাঁদের মধ্যে মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা, বাসুলী, বিবিধ প্রকার লৌকিক চণ্ডী, পঞ্চানন্দ প্রভৃতিরা উচ্চতর সমাজেও স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন—যে

মধ্যযুগে ব্যবহৃত বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের অন্যতম পরমাশ্চর্য নিদর্শন—'স্বরমণ্ডল' : নদীয়া জেলার দিগ্‌নগরে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত চারচালা 'রাঘবেশ্বর' শিবমন্দির।

মধ্যযুগীয় রণাঙ্গনের দৃশ্য : পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামায় ১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আটচালা 'রাধাবিনোদ' মন্দির।

তাকিয়ায় অর্ধশয়ান, ফরসিসেবী ফিরিঙ্গী ও হুঁকাবরদার : হুগলি জেলার দ্বারহাটায় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আটচালা 'রাজরাজেশ্বর' মন্দির।

নৃত্যগীতবাদ্য ও সঙ্গিনীসহ সমকালীন ফিরিঙ্গীর প্রমোদ ভ্রমণ-দৃশ্য : বর্ধমান জেলার কালনায় ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আটচালা 'অনন্ত-বাসুদেব' মন্দির।

সমকালীন বেশভূষায় সজ্জিত দুই অশ্বরোহী, বর্শাধারী ফিরিঙ্গী বাঘশিকারী ও বন্দুকধারী অনুচর : হাওড়া জেলার অমরাগড়িতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আটচালা 'দধিমাধব' মন্দির।

বিবাহের পর বরবধূর 'কড়ি খেলা' নামক স্ত্রী-আচারের দৃশ্য : বীরভূম জেলার উচকরণে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত চারচালা শিবমন্দির।

পুরনারীদের পাশা খেলায় অবসর-বিনোদনের দৃশ্য : হুগলি জেলার আঁটপুরে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আটচালা 'রাধাগোবিন্দ' মন্দির।
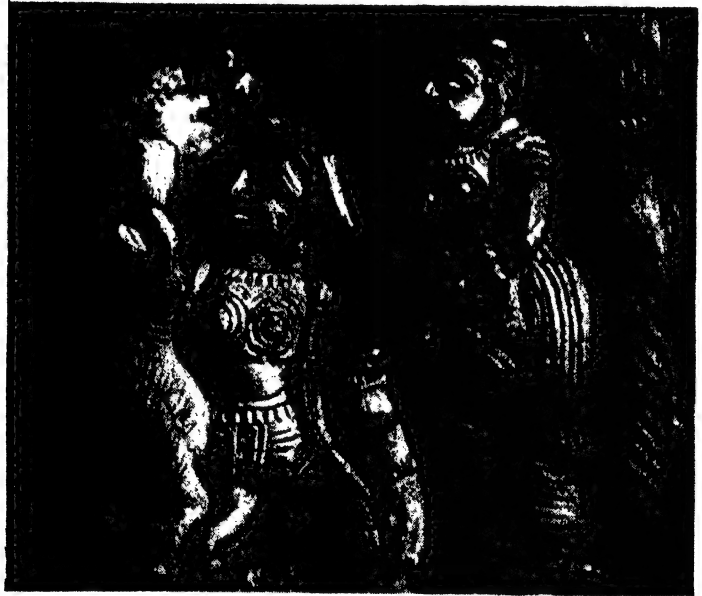
সমকালীন বস্ত্রালংকারে ভূষিতা অন্তঃপুরিকাদের কেশপ্রসাধন-দৃশ্য : বীরভূম জেলার সুরুলে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে নির্মিত 'পঞ্চরত্ন লক্ষ্মীজনার্দন' মন্দির।

(আলোক চিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত ও পরিস্ফুটিত)

মন্দির-টেরাকোটা থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হয়েছেন তা কিছুটা বিস্ময়কর। বস্তুতঃ আমাদের বিস্তৃত ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা বীরভূম জেলার ইটন্ডা গ্রামে, পরিত্যক্ত এক জোড় বাংলা কালীমন্দিরে দুটি মনসামূর্তি এবং মেদিনীপুরের রামচন্দ্রপুরে অবস্থিত এক নবরত্ন মন্দিরে ও ঘুড়িষার আর একটি নবরত্ন মন্দিরে মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত কমলে-কামিনীর চিত্রকল্প ছাড়া, টেরাকোটা-ভাস্কর্যে লৌকিক দেবদেবীর রূপায়ণ আর বিশেষ দেখিনি। সহজেই বোঝা যায়, কারিগরেরা অন্ত্যজশ্রেণীর হলেও, এ বিষয়ে তাঁদের অভিরুচি সমাজশীর্ষের মন্দির-প্রতিষ্ঠাতারা গ্রাহ্য করেন নি।

নিম্নবর্ণের দেব-লোকের প্রতি উচ্চবর্ণের যতই অবজ্ঞা থাকুক না কেন, তাঁদের নিজেদের আচরিত শৈব, শাক্ত ও রাধাকৃষ্ণ পূজারূপে বৈষ্ণব ধর্মমতের মধ্যে যে বিশেষ অসদ্ভাব ছিল না তা কিন্তু টেরাকোটা-ভাস্কর্যের নজিরে প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করলেই হয়ত যথেষ্ট হবে। আমরা ইতিঃপূর্বে যে-দুটি অসামান্য কালী-মূর্তির কথা বলেছি তার একটি আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীউ ও অপরটি চেলিয়ামার রাধা-বিনোদ মন্দিরে, অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বৈষ্ণব দেবালয়ে, উৎকীর্ণ। অনুরূপভাবে, কালনার প্রতাপেশ্বর শিবের দেউল-মন্দিরে একাধিক মহিষমর্দিনীমূর্তি ও সভাসীন রামসীতার আলেখ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। এ ছাড়া, পাশাপাশি প্যানেলে ভিন্ন ধর্মমতের ভাস্কর্য নিবন্ধ হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। যেমন, হুগলি জেলার দেউলপাড়ায় অবস্থিত লৌকিক দেবী জয়চন্ডীর মন্দিরে এক খিলানশীর্ষ-প্যানেলের চারটি সারির মধ্যে সর্বোচ্চটিতে রণরঙ্গিণী কালী, পরেরটিতে দুটি বড় 'রাসমন্ডলে' কৃষ্ণ ও গোপীগণের দলবদ্ধ নৃত্যের রূপায়ণ, তৃতীয়টিতে রামায়ণআশ্রিত লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ও সর্বনিম্ন সারিতে লিঙ্গমূর্তিযুক্ত বহু প্রতীক শিবমন্দির। সেকালের ধর্মজীবনে পরমতসহিষ্ণুতার এগুলি "পাথুরে প্রমাণ"।

আলোচ্য কালে, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হলেও, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই আজকের আলোচনা থেকে এই যুগল-দেবতার প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছি এই কারণে যে, তাঁদের অবলম্বনে উৎকীর্ণ অজস্র টেরাকোটা ভাস্কর্য বিস্তৃততর আলোচনার দাবি রাখে।

আলোচ্য কালের টেরাকোটা-মন্দিরগুলিতে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দিক অবলম্বন করে অজস্র ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ, সে-প্রাচুর্য এতই সীমাহীন যে, অন্য যে কোন বিষয়ে নিয়োজিত প্যানেলের সংখ্যা তার ধারেকাছেও আসে কিনা সন্দেহ। আগেই বলেছি, টেরাকোটা-ভাস্কর্যে সংশ্লিষ্ট মন্দির-বিগ্রহের প্রতি বিশেষ কোন আনুগত্য দেখানো হয়নি : শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব — সব দেবালয়েই কৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্য নিবদ্ধ হয়েছে। তবে বৈষ্ণব মন্দিরে তাদের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকবে।

চৈতন্যদেবের জীবদ্দশার কাল ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব তাঁর সময়ের বহু পূর্ব থেকেই প্রচারিত ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং নিম্বার্ক-দর্শনে রাধাকৃষ্ণলীলা যেমন কীর্তিত হয়েছে, তেমনই সমাদর পেয়েছে লোককাহিনী ও লোককল্পনাতেও। আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সেই প্রচলিত কাহিনীকে সরস সংস্কৃতে রূপ দিয়ে ভারতময় ছড়িয়ে দিল। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, আনুমানিক পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত তাঁর অনুপম পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণলীলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুললেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিধর্মের আন্দো-লনই সে-কাহিনীকে, অন্ততঃ বঙ্গদেশে, প্লাবনের মতো বিস্তৃত করেছিল।

খ্রীষ্টীয় সতেরো-আঠারো শতকে তো বটেই উনিশ শতকেও যেসব দেবালয় তথা

টেরাকোটা-মন্দির নির্মিত হয়েছে বাংলা দেশে, তার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ অথবা শালগ্রাম-শিলারূপী বহুবিধ নামের বিষ্ণু-উপাসনার জন্য। সেগুলিতে কৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্য যে অগ্রাধিকার পাবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সমকালীন শৈব বা শাক্ত-মন্দিরেও অনুরূপ ভাস্কর্য সুপ্রচুর। বাঙালী শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবপন্থীদের মধ্যে, পূর্বে উল্লিখিত পারস্পরিক ধর্মীয় সম্প্রীতি অবশ্যই এর অন্যতম কারণ। কিন্তু অন্যান্য কারণও ছিল। "আচণ্ডালে কোল" দেবার কালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ বহু কোটিপতি ও প্রভাবশক্তিশালী বণিককেও কোল দিয়েছিলেন। গবেষকদের কাছে একথা এখন স্বীকৃত সত্য যে, বঙ্গদেশের সর্বাধিকসংখ্যক মন্দির, সেকালের এই বণিক-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভূস্বামী বা ব্রাহ্মণকুলের অপরাপর দেবালয়-নির্মাতারাও চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রবল ধর্মীয় তথা সামাজিক আন্দোলন দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে থাকবেন অল্পবিস্তর। আর, স্থপতি ও ভাস্কররা যাঁরা হাতে-হাতিয়ারে এসব পুরাকীর্তি গঠিত করেছেন—বর্ণ-শাসিত সমাজের নীচুতলার অধিবাসী হওয়ার দরুণ তাঁরা যে শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ-বর্জিত উদার প্রেমধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল হবেন এমনই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, সমকালীন সুপ্রচুর বৈষ্ণব সাহিত্যের দিকটাও ভাবা দরকার। একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না যে, কি পরিমাণে, কি উৎকর্ষে বিস্ময়কর পদাবলী-সাহিত্য সেকালের শিক্ষিত-মানস ও লোকমানসের চিরায়ত দূরত্ববোধ বহুলাংশে লাঘব করেছিল। এসব প্রত্যক্ষ সামাজিক কারণ স্বভাবতঃই প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন বৈষ্ণব মন্দিরের সংখ্যাধিক্যে এবং তাদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ কৃষ্ণলীলা-রূপায়ণের প্রাচুর্যে।

কৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্যের বিস্তৃত সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত। কৃষ্ণের জন্ম ও নন্দ-গৃহে স্থানান্তর, তাঁর ননীচুরি গোষ্ঠগমন প্রভৃতি পারিবারিক দৃশ্য, বিবিধ অসুরবধ, রাধিকা ও গোপীগণসঙ্গে নানান লীলা যার মধ্যে নৌকা-বিলাস, বস্ত্রহরণ, 'রাসমণ্ডল'-নৃত্য, 'নবনারীকুঞ্জর'-পৃষ্ঠে প্রমোদভ্রমণ, 'রাইরাজা' কাহিনী, 'মাথুর' দৃশ্য প্রভৃতি প্রধান এবং 'কৃষ্ণকালী'র বিশিষ্ট আকৃতিতে তাঁর রূপায়ণ। এ সমস্ত শ্রেণীতেই ভাস্কর্যের সংখ্যা এতই অজস্র যে, বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতি ক্ষেত্রে দু'একটির বেশী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা সম্ভব হবে না।

কৃষ্ণ-জন্ম দৃশ্যে, মাতা দেবকী বুকে ধামা আঁকড়িয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে আছেন এবং ধাত্রী তাঁর দু'পায়ের মধ্যস্থলে বসে প্রসব করাচ্ছেন এই ভঙ্গি প্রায়শঃই দেখানো হয়েছে। এই ভঙ্গি সেকালে সুপ্রচলিত ছিল এবং এখনও দূর গ্রামাঞ্চলে অবলম্বিত বলে শুনেছি। কালনার পঁচিশরত্ন কৃষ্ণচন্দ্র-মন্দিরের সামনের ভিত্তিসংলগ্ন সারিতে, এহেন প্রসবদৃশ্য, কংস-নিয়োজিত নিদ্রিত প্রহরীরা, সপ্তনাগছত্রের নীচে, এক শৃগাল-প্রদর্শিত পথে, সদ্যোজাত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেবের যমুনা অতিক্রমের চিত্ররূপ পর পর কয়েকটি প্যানেলে অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। আবার, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের একরত্ন মদনমোহন-মন্দিরের এক কুলুঙ্গি-ফলকে দেবকীকে চিত অবস্থায় শায়িত দেখানো হয়েছে। এ-রীতিও সেকালে প্রচলিত থাকবার কথা। দেবদেবী বা তুলনীয় চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে টেরাকোটা-শিল্পীরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই এভাবে অনুসরণ করেছেন, শাস্ত্র-পুরাণের অলীক রূপকল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কদাচিৎ।

কৃষ্ণের বিবিধ অসুরবধ-দৃশ্যে প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ পূতনা, বকাসুর, কেশী, কালীয়-নাগ প্রভৃতি। হুগলি জেলার কৃষ্ণপুরের পরিত্যক্ত আটচালা-মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন সারিতে

বকরাক্ষস, কালীয় ও কেশীর নিধন পাশাপাশি ক্ষোদিত হয়েছে। এতগুলি অসুরবধ-দৃশ্যের একত্র সমাবেশ বিরল।

রাধারমণ, গোপীবল্লভের বিবিধ লীলাকাহিনীর মধ্যে, দু'পাশে রাধিকা ও প্রধানা গোপী মাঝখানে কৃষ্ণ—এই সরল রূপকল্পটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরের সর্বত্র এই ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। পরবর্তী গুরুত্ব 'বস্ত্রহরণ'-দৃশ্যের, যার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনটি সিউড়ি-সোনাতোড়পাড়ার পরিত্যক্ত আটচালা-মন্দিরের সামনের কার্ণিসের নীচে নিবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ, এ-ভাস্কর্যটি পোড়ামাটির বদলে 'ফুলপাথরে' ক্ষোদিত। স্থানীয়ভাবে লব্ধ এই বিশেষ জাতের নরম পাথরে বীরভূম ও সংলগ্ন এলাকার মলুটি, মল্লারপুর, গণপুর, তারাপীঠ প্রভৃতি স্থানের বহু দেবালয় অলংকৃত হয়েছে যেহেতু তার রং অবিকল পোড়ামাটির মতো। তা ছাড়া, পাথরের বলে সেসব অলংকরণ, তুলনায়, সূক্ষ্মতর ও দীর্ঘস্থায়ীও হয়েছে। টেরাকোটা-কারিগরেরা যে ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে প্রথাগত পাথর খোদাইয়েও অভ্যস্ত ছিলেন, এই নিদর্শনগুলি তার "পাথুরে প্রমাণ"। 'বস্ত্রহরণ' দৃশ্যে, শালীনতার লক্ষণীয় ক্রমাবনতির সামাজিক তাৎপর্য আছে। প্রাচীনতর ভাস্কর্যগুলিতে, যথা উল্লিখিত দৃষ্টান্তে, কিংবা বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ আর একটি প্যানেলে বিবস্ত্রা গোপীরা সকলেই এক হাতে তাঁদের স্ত্রীঅঙ্গ ঢেকে আছেন। কিন্তু হুগলি জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জের অর্বাচীন দামোদর-মন্দিরের খিলানশীর্ষ-ফলকে তাঁরা উন্মুক্তযোনি এবং তাদের গড়নপেটন ও ভাবভঙ্গি রীতিমত লাস্যময়। ওড়িশার মন্দিরকলায় মিথুন-ভাস্কর্যের প্রাদুর্ভাবের কথা সুবিদিত। সে পরিমণ্ডল থেকে বহুদূরস্থিত সিউড়ি ও বিষ্ণুপুর অপেক্ষা নিকটতর বালী-দেওয়ানগঞ্জে তার অধিক প্রভাব যে পড়বে এমনটিই স্বাভাবিক। 'বস্ত্রহরণ'-দৃশ্যের অবলম্বন ছাড়া সরাসরি মিথুন-ভাস্কর্যের রূপায়ণও কিছু হয়েছে পোড়ামাটির মাধ্যমে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট নিদর্শনগুলি ওড়িশা-পরিমণ্ডলের কাছাকাছি অঞ্চলেই বেশী, দূরে অনেক কম বা একেবারেই নেই।

'রাসমণ্ডল' এক প্রথাসিদ্ধ বা 'স্টাইলাইজড্' রূপকল্প যেখানে কেন্দ্রীয় এক বৃত্তের মধ্যে কৃষ্ণরাধিকা-গোপীমূর্তি উৎকীর্ণ করে বহিস্থ এক বা একাধিক বৃত্তের মধ্যে, পরপর পর্যায়ক্রমে, কৃষ্ণ ও গোপীর নৃত্যরত বহু মূর্তি স্থাপিত হয়। গোপবালারা একদা নাকি অনুযোগ করেন, তাঁদের প্রাণবল্লভ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে নৃত্যরত থাকেন, তখন তাঁরা তাঁর সঙ্গ পান না। কৃষ্ণ অমনি বহু পৃথক অবয়ব ধারণ করে দুই গোপীর মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করে তাঁদের ক্ষোভ দূর করলেন। এক একটি প্যানেলে, নৃত্যোল্লাস প্রকটিত করে, বহুল-অলংকৃত এহেন অনেক মূর্তি ক্ষোদিত করা বেশ সূক্ষ্ম কারিগরি সাপেক্ষ ব্যাপার যার বহু নিদর্শন বিদ্যমান। এই শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ ফলকটি বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে নিবদ্ধ যেখানে দু'টি এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে হাত-ধরাধরি-ভঙ্গিতে অসংখ্য কৃষ্ণ ও গোপীমূর্তি দেখানো হয়েছে।

'নবনারীকুঞ্জর' 'মোতিফ'টিও আর-এক প্রথাগত বা 'স্টাইলাইজড্' ভাস্কর্য যেখানে প্রমোদভ্রমণেচ্ছু কৃষ্ণকে উপরে বসিয়ে ন'জন গোপী পরস্পর জড়াজড়ি করে এক হাতির রূপ ধারণ করেন। বলা বাহুল্য, কারিগরি খুবই জটিল ধরনের। তা সত্ত্বেও এ-শ্রেণীর দুটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়, বীরভূম জেলার গণপুরে অবস্থিত এক চারচালা শিবমন্দিরের খিলান-শীর্ষে ও বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের স্তম্ভমূলে উৎকীর্ণ আর-এক প্যানেলে। প্রথমটি ফুলপাথর ও দ্বিতীয়টি পোড়ামাটিতে নির্মিত।

রাণীবেশে সিংহাসনে উপবিষ্টা ও চামর-ছত্রধারিণী সখি-পরিবৃতা রাধিকামূর্তি অপর এই 'স্টাইলাইজড্ মোতিফ' যার বহু নিদর্শন বিদ্যমান। বর্ধমান জেলার কালিকাপুরে অবস্থিত দেউলরীতির জোড়া-শিবমন্দিরের একটির খিলানশীর্ষে এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য দেখা যায়।

পীতধটি, বংশীবদন, শিখিচূড়াশোভিত, বনমালীকে তাঁর প্রচলিত আকৃতি ছাড়াও বহুক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণকালীরূপে। সেক্ষেত্রে, সাধারণতঃ, তিনি চূড়াধারী ও ধটি পরিহিত, কিন্তু তাঁর ডান হাত দুটিতে বাঁশি এবং উপরের বাম হাতে খড়্গ ও নীচের বাম হাতে অসুর-মুণ্ড। বক্ষস্থলের একাংশে স্তন অপর অংশ সমতল। বনমালার অর্ধাংশও নরমুণ্ড-খচিত। এই আশ্চর্য মিশ্র-মূর্তির পিছনে কিন্তু বাঙালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমত-সমন্বয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। সে-ইতিবৃত্ত সম্পর্কে গবেষকরা অনেক-কিছু লিখেছেন। অথচ, এই মূর্তিগুলিতে সে-সম্প্রীতির সারবস্তু যত সংক্ষেপ ও দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে দীর্ঘ লিখিত বৃত্তান্তে তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

"বারো মাসে তেরো পার্বণে"র এই দেশে উৎসব-পার্বণের প্রতিচিত্র কিন্তু টেরাকোটা-ভাস্কর্যে বিশেষ স্থান পায়নি। শিবের গাজন বা চড়কের মতো ব্যাপক ও জনপ্রিয় উৎসব গ্রাম-বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। অথচ, শিবের মাথায় জল ঢালা অথবা সেজন্য বাঁক-কাঁধে পথযাত্রা কিংবা চড়ক-গাছে ঘূর্ণ্যমান ভক্তের টেরাকোটা-রূপায়ণ একান্ত বিরল। দুর্গাপূজার দৃশ্য অবশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে বহু মন্দিরে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই পুত্র-কন্যাসমেত বা ব্যতীত শুধু মহিষমর্দিনীর মূর্তি যাতে সঙ্গীত-উৎসবের স্পর্শ নেই। কিছু ব্যতিক্রমের মধ্যে একটির দেখা মেলে বীরভূমের ইলামবাজারে অবস্থিত পঞ্চরত্ন লক্ষ্মীজনার্দন-মন্দিরের খিলানশীর্ষে যেখানে দুর্গাপ্রতিমার কাছাকাছি ঢাকী, অন্যান্য বাজিয়ের দল এবং ভক্তসমাগমে উৎসবের রূপটা অনেকখানি প্রতিভাত। পারিবারিক উৎসবের মধ্যে বিবাহঘটিত দৃশ্য ছাড়া আর-কিছু তেমন নজরে পড়ে না। তবে, কি সেকালে কি একালে, বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবনে যেহেতু বিয়ের বাড়া পরব নেই, সেজন্য এই শ্রেণীর ভাস্কর্যে বৈচিত্র্য ও অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মেদিনীপুরের রামজীবনপুরে এক আটচালা-মন্দিরের খিলানশীর্ষে যে-বিবাহদৃশ্যটি উৎকীর্ণ আছে তার তুল্য প্রতিরূপ কোনও চিত্রকরও আঁকতে পারতেন কিনা সন্দেহ! এক জলচৌকির উপর বরবধূ মুখোমুখি উপবিষ্ট। মধ্যবর্তী মঙ্গলঘটের ঊর্ধ্বে দুজনের দক্ষিণ করতল একত্রিত। বরের মাথায় টোপর, কন্যা সালংকারা। লজ্জানতা কন্যার বাঁ হাতে চোখ ঢেকে থাকার ভঙ্গিটি অপূর্ব লাবণ্যময়। এক পাশে পাঁজি হাতে পুরোহিত এবং সম্ভবতঃ পাত্রীর পিতা। বিবাহসংক্রান্ত কিছু স্ত্রী-আচারও টেরাকোটা-ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়েছে। বীরভূমের উচকরণ গ্রামে সরখেল পরিবারের পাশাপাশি চারটি চারচালা শিবমন্দিরের একটিতে উৎকীর্ণ বিবাহবেশে বরবধূর কড়িখেলার দৃশ্যটিও খুব সুন্দর। বধূবরণ, সিঁদুরদান প্রভৃতি চিত্রকল্পও দেখা যায় বহু মন্দিরে।

মন্দির-টেরাকোটায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির প্রভাব প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার, এসব চিরায়ত কাহিনী কথকতা, পাঁচালি-গান ও কীর্তনের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে গীত ও অভিনীত হয়ে সেকালের সমাজে নীতিরক্ষার কাজ করেছে। সব কাহিনী, সব উপাখ্যানেরই মূল বক্তব্য ছিল—ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়। ধর্ম বলতে, ব্যাপক অর্থে, সৎজীবনযাপন, উচ্চাদর্শপালন' সামাজিক শুচিতারক্ষা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের অনুশীলন বোঝাত। এহেন সুশিক্ষায় নিরন্তর শিক্ষিত হয়ে, আজকের তুলনায়, সেকালের সমাজে

নিরক্ষরের সংখ্যা হয়ত বেশী ছিল, কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল অনেক কম। আর সেই নীতিরক্ষার কাজে আলোচ্য টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী ভূমিকা পালন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামায়ণের বিবিধ কাহিনীর মধ্যে লঙ্কা-সমরের দৃশ্যই সর্বাধিক উৎকীর্ণ হয়েছে এই কারণে যে, সেখানে অধর্মের উপর ধর্মের জয় প্রত্যক্ষগোচর। সে-ধর্মযুদ্ধের সব চেয়ে বড় ও সুন্দর প্যানেলটির দেখা মেলে আটপুরের রাধাগোবিন্দজীউ-মন্দিরের কেন্দ্রীয় খিলানশীর্ষে যা টেরাকোটা-ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আত্মত্যাগ ও অচলা ভক্তির প্রতীকরূপে জটায়ু-বধ অশোকবনে পতিপ্রাণা সীতা এবং রাম-চরণে প্রণত হনুমানের প্রতিকৃতিও ক্ষোদিত হয়েছে যথেষ্ট সংখ্যায়। পক্ষান্তরে, অশুভ শক্তির পরাজয় দেখাতে রাবণ ছাড়াও কুম্ভকর্ণ, ত্রিশিরা মারীচ প্রভৃতির বিনাশ ও সুর্পনখার নাসিকাছেদন-দৃশ্যও বেশ প্রাধান্য পেয়েছে।

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের কাহিনী-ভাণ্ডার অনেক সুপরিসর হলেও কেন যে সেগুলি কম ক্ষেত্রেই রূপায়িত হয়েছে তা দুর্বোধ্য। আমাদের বিস্তৃত সমীক্ষায় আমরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, সমুদ্রমন্থন, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের একাধিক এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, যুধিষ্ঠির-শকুনির পাশাখেলা এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যের মাত্র একটি করে ফলকের সন্ধান পেয়েছি। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মহাভারতোক্ত জনপ্রিয় উপাখ্যান কিংবা রণাঙ্গনে অর্জুনের সারথি, গীতার উদ্গাতা কৃষ্ণ, কিরাত-অর্জুন, একলব্য, কর্ণ প্রভৃতির রূপায়ণ একেবারে অনুপস্থিত। অথচ, কথকতা এবং পাঁচালি-গানের মাধ্যমে, মহাভারত-কাহিনী রামায়ণ কাহিনীর মতোই সুবিদিত ছিল। সে যাই হোক, কুরুক্ষেত্র সমরের বহু চিত্রকল্প উৎকীর্ণ হয়েছে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরে। ভীষ্মের শরশয্যার শ্রেষ্ঠ ফলকটিরও দেখা মেলে একই দেবালয়ে। সমুদ্রমন্থন ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ভাস্কর্যের প্রাপ্তিস্থান ইতঃপূর্বেই নির্দেশ করেছি। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের একমাত্র প্রতিরূপটি নিবদ্ধ আছে বাঁকুড়ার হদল-নারায়ণপুর গ্রামের এক নবরত্ন মন্দিরের সামনের দেওয়ালে এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও যুধিষ্ঠির শকুনির পাশাখেলার অদ্বিতীয় ভাস্কর্য দুটি ফুলপাথরে ক্ষোদিত হয়ে স্থান পেয়েছে বীরভূম-গণপুরের দুই চারচালা শিবমন্দিরের খিলানশীর্ষে।

পুরাণোক্ত দেবদেবী ও সংশ্লিষ্ট কাহিনীর আলোচনা আগেই করেছি। বাকি থাকেন, মনসা, চণ্ডী, ধর্মরাজ, শীতলা, ষষ্ঠী, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি প্রধান লৌকিক দেবদেবী যাঁদের প্রত্যেককে অবলম্বন করে এক বা একাধিক মঙ্গলকাব্য রচিত ও গ্রামগ্রামান্তরে দীর্ঘকাল প্রচারিত হয়েছে কথক ও পাঁচালি গায়কদের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের অতি-বিস্তৃত ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে বীরভূম জেলার ইটণ্ডাগ্রামের এক পরিত্যক্ত জোড়বাংলা কালীমন্দিরের সামনের দেওয়ালে দুটি মাত্র মনসা-ফলক ছাড়া আর কোনও লৌকিক দেবদেবীর প্রতিরূপ আমরা কুত্রাপি দেখিনি। শূন্যমূর্তি ধর্মরাজের অনুপস্থিতি স্বতঃবোধ্য। সমাজের উঁচুতলার মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে লৌকিক দেবকুল যে সমাদৃত হবেন না তা-ও স্বাভাবিক। তবু, বাঙালী জনসমাজের বৃহত্তর অংশে পূজিত এসব দেবদেবী মন্দির-টেরাকোটা থেকে একেবারে বর্জিত হবার ব্যাপারটা বেশ অপ্রত্যাশিত।

দেবলোক থেকে মর্ত্যে নেমে দেখি, সমাজচিত্রের ছয়লাপ। সেখানে গণজীবন কিছু কিছু রূপায়িত হয়েছে সত্য, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর নানান ক্রিয়াকলাপ স্থান পেয়েছে অনেক বেশী পরিমাণে। কারণটা স্বতঃবোধ্য যার উল্লেখ আগেই করেছি। একই কারণে ফিরিঙ্গীরাও

যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে যেহেতু, হার্মাদ-জলদস্যু, বিদেশী বণিক, কুঠিয়াল সাহেব বা রাজকর্ম-চারী নির্বিশেষে তাঁরা ভয় ও সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন। রণতরীবাহিত, বন্দুকধারী, পর্তুগীজ হানাদারের দল যথেষ্টসংখ্যায় উৎকীর্ণ হয়েছে প্রাচীনতর মন্দিরগুলিতে। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরে নিবন্ধ একটি ফলক এই শ্রেণীতে সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ। জয়দেব-কেঁদুলীর নবরত্ন রাধাবিনোদ-মন্দিরের সদর দেওয়ালে টুপি, জোব্বা ও বুট-পরিহিত এক মূর্তি আছে যার হাতে পিঞ্জরাবদ্ধ এক শিশু। সেটি হার্মাদদের দাস-ব্যবসায়ের সূচক বলেই মনে হয়। বহুল-অলংকৃত পালকি বা সেকালের 'সুখাসনে' ভ্রমণরত বহু ফিরিঙ্গীরও দেখা মেলে যাঁরা ফরসির নল হাতে নিয়ে তাকিয়ায় অর্ধশয়ান এবং যাঁদের পালকির পাশে হুঁকাবরদার ও নীচে পোষা কুকুর। এ-'মোতিফ্'টির উৎস ইউরোপীয় বণিক, কুঠিয়াল বা রাজকর্মচারীরা যাঁদের গ্রামাঞ্চলে নানা স্থানে যাতায়াত করতে হত, ঝটিতি আক্রমণে গ্রামলুণ্ঠন করা যাঁদের পেশা ছিল না। আবার, 'সুখাসন'বাহিত দেশী অভিজাতদেরও অভাব নেই যাঁদের রূপায়ণে একই ভাস্কর্য-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। গুপ্তিপাড়ার এৎরত্ন রামচন্দ্র-মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন এক দীর্ঘ প্যানেলে এহেন এক আরোহীর দেখা মেলে যাঁর ছয়-বেহারার পাল্কির পুরোভাগে কাড়ানা ঢ়ে-বাজিয়ের দল এবং সামনে-পিছনে পাইক-বরকন্দাজ। ফিরিঙ্গী এবং অভিজাতদের প্রিয় আর-এক রকম প্রমোদযানের প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। সে-'মোতিফে' দুই ঘোড়ার (কখনও এক ঘোড়ার বা বলদে-টানা) গাড়িতে টুপি-পাতলুন পরিহিত সাহেব অথবা ধুতি-কোর্তাধারী 'বাবু' যুবতী সঙ্গিনীর খ্যাতান ধ'রে ছই-এর নীচে উপবিষ্ট এবং সামনের পাটাতনে নৃত্যরতা নটী ও ঢোলবাদক প্রভৃতি সংগতিয়া। এহেন উল্লাসকর শকট-বিহারের একটি উৎকৃষ্ট ফলক কালনার আটচালা অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরে সন্নিবিষ্ট আছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ফিরিঙ্গীদের কিন্তু দেখানো হয়েছে নানা ধরনের বন্দুকধারীরূপে। সেসব ভাস্কর্য ইংরেজদের প্রতিরূপ হওয়াই সম্ভব, কেননা তাঁরা, পলাশী-যুদ্ধের পর থেকে তো বটেই, এদেশ শাসন করে গিয়েছেন প্রধানতঃ তাঁদের অদম্য সেনাবাহিনী ও উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে। এই শ্রেণীর অজস্র ফলকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকটি উৎকীর্ণ হয়েছে আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীউ-মন্দিরে, যেখানে কামানসমেত এক গোলন্দাজবাহিনীরও দেখা মেলে। বর্শা-বন্দুকধারী ফিরিঙ্গী শিকারীমূর্তিও অজস্র, যেখানে তারা প্রায়শঃই অশ্বারোহী এবং আক্রান্ত পশু সাধারণতঃ বাঘ, কখনও বা হরিণ প্রভৃতি। এই পর্যায়ের কিছু সুন্দর নিদর্শন আছে হাওড়া জেলার অমরাগড়িতে অবস্থিত আটচালা দধিমধব মন্দিরের সামনের দেওয়ালে। দেশী শিকারীরও অভাব নেই। প্রাচীনতর দেবালয়ে, যেমন বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা-মন্দিরে, তারা ধনুর্বাণধারী, কিন্তু হুগলি জেলার শ্রীরামপুর গ্রামের (খানাকুল থানা) অর্বাচীন আটচালা বিষ্ণু-মন্দিরে তারা হাতি-সওয়ার ও বন্দুকধারী।

নারী-পুরুষের বেশভূষা ও অলংকারের কত দৃষ্টান্ত যে ছড়িয়ে আছে টেরাকোটা-মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে তার ইয়ত্তা নেই। সেসব নিদর্শনের বিস্তৃত সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত মহলে পুরুষের বেশ ছিল মুসলমানী কেতার কুর্তা-পিরান-ইজার, প্রয়োজনে কখনও বা জোগা-চাপকান নয়তো জোব্বা, আর মাথায় পাগড়ি বা ফেজ এবং পায়ে জুতো। নারীর পরিধান সাধারণতঃ ঘাঘরা-ব্লাউজ-ওড়না, সেখানেও মোসলেম প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীনতর ভাস্কর্যে, মহিলাদের অঙ্গাবরণ, ব্লাউজের পরিবর্তে বহু-অলংকৃত কাঁচুলি এবং শাড়ি। খুব আধুনিক নিদর্শনে যেমন ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরে কিংবা ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুরের মাংলোই গ্রামের

রাসমঞ্চে উৎকীর্ণ রমণীরা, স্পষ্টতঃই শাড়ির নীচে সায়া-পরিহিতা যা ফিরিঙ্গী-প্রভাবিত হওয়াই সম্ভব। এসব অর্বাচীন ভাস্কর্যে বিধৃত শাড়ি-পরার ধরণ কিন্তু হুবহু একালের বাঙালী মেয়েদের মতো। সেজন্য এই বিশেষ ধরণটি ঠাকুর-পরিবারের প্রবর্তিত বলে যে-বিশ্বাস প্রচলিত তা হয়ত সত্য নয়। সেকালের পরিধেয় অধিকাংশ টেরাকোটা-মন্দিরেই রূপায়িত হয়েছে অল্পবিস্তর, তবে বহুল-অলংকৃত ও কিছুটা অর্বাচীন দেবালয়গুলিতে তার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য বেশী। নারী পুরুষের বেশ সম্বন্ধে আর-একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক। দেবদেবীর অঙ্গাবরণ রচনার সময় ভাস্করেরা মানবসমাজে ব্যবহৃত পরিধেয়কেই অনুকরণ করেছেন, কোনও কাল্পনিক নমুনার বশবর্তী হন নি। ফলে, শাড়ি-ব্লাউজ পরিহিতা সীতা বা ইজার-পিরান-পরা অর্জুন বা ইন্দ্রের দেখা পাওয়া কঠিন নয়।

সেকালে পুরুষদের কিছু কিছু অলংকার পরিধানের রীতি প্রচলিত থাকলেও পোড়া মাটির ভাস্কর্যে তার বিশেষ প্রতিফলন ঘটেনি। কিন্তু নারীমূর্তির রূপায়ণে - সম্ভ্রান্ত মহিলা হলে তো কথাই নেই - উৎকীর্ণ গহণাগাটির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। মাথায়, কপালে মুকুট এবং সিঁথি বা টিকলি, কানে কানবালা, মকরকাড়ি, চৌড়ি-ঝুমকা, মাকড়ি, নাকে বেশর, গলায় শাতেশরি প্রভৃতি নানাবিধ হার, বাহুতে তাড়, কেয়ূর, কঙ্কণ, জসম, বাজু, অনন্ত, নানা প্রকার চুড়ি ও রতনচূড়, পায়ে মল, উচট প্রভৃতি কত রকম অলংকার যে রূপায়িত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব নিদর্শনের কয়েকটি প্রধান প্রাপ্তিস্থল হুগলি জেলার আটপুরের রাধাগোবিন্দজীউ-মন্দির, কামারপুকুরের লাহাদের দালান-মন্দির ও বিষ্ণুপুরের আটচালা বিশালাক্ষী-মন্দির; বর্ধমান জেলার মানকরের দত্ত পরিবারের পঞ্চরত্ন শিবমন্দির ও কালনার প্রতাপেশ্বর-শিবের দেউল; বীরভূম জেলার সুরুলের পঞ্চরত্ন লক্ষ্মী-জনার্দন-মন্দির; বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর পঁচিশ-রত্ন শ্রীধর-মন্দির প্রভৃতি।

সেকালের নারীপুরুষ কিভাবে অবসর বিনোদন করতেন, সে-বিষয়েও টেরাকোটা-শিল্পীরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। প্রমোদভ্রমণের কথা আগেই বলেছি। তা ছাড়া ফিরিঙ্গী এবং দেশী সম্ভ্রান্তজন নির্বিশেষে, পুরুষদের বহুক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে ধূমপানরত অবস্থায়। সামনে-রাখা বিরাট ফরসির নল-হাতে তাঁরা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সচরাচর অর্ধ-শয়ান। আশপাশে হুঁকাবরদার ও পাখা-চামর ব্যজনকারী খিদমতগার। এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য দেখা যায় হুগলি জেলার দ্বারহাটায় অবস্থিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরে। বাইজীর নাচ দেখা বা গান শোনাও পুরুষের অবসরবিনোদনের উপায় ছিল। এ-প্রসঙ্গে আটপুর-মন্দিরে উৎকীর্ণ এক চেয়ারে-বসা সাহেবের, পদপ্রান্তে উপবিষ্ট বাইজীর, গান শোনা এবং নদীয়া জেলার দিগনগরে অবস্থিত রাঘবেশ্বর-শিবের চারচালা মন্দিরে নিবদ্ধ জনৈক রাজন্যের বাইজীনৃত্য উপভোগের দুটি অসামান্য প্যানেল উল্লেখযোগ্য। দাঁড়ের উপর বেদে-বেদেনীদের ভারসাম্যের কসরতও গ্রাম-বাংলায় যা 'চিংড়ে খেল' নামে পরিচিত—অভিজাত-গণের অবসরবিনোদন করত। এজাতীয় বহু ভাস্কর্যের মধ্যে খুব সুন্দর কয়েকটি স্থান পেয়েছে বর্ধমান জেলার আমাদপুর গ্রামের একাধিক মন্দিরে। অন্তঃপুরবাসিনী নারীরা অবকাশ কাটাতেন প্রধানতঃ নিজেদের মধ্যে গালগল্পে, প্রসাধন ও কেশচর্চায়, অন্দরমহলের উপযোগী কিছু খেলাধুলায়, গীতবাদ্যাদির অনুশীলনে এবং পোষাপ্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণে। মন্দির-টেরাকোটায় এ-সবেরই প্রতিরূপ উৎকীর্ণ হয়েছে অল্পবিস্তর। মেদিনীপুর জেলায় উত্তর গোবিন্দনগরের এক পঞ্চরত্ন-মন্দিরে মেয়েলি কথোপকথনের অতি বিরল ও সুন্দর একটি প্যানেল আছে। প্রসাধনের নানা নিদর্শনের মধ্যে বীরভূমের সুরুলে অবস্থিত লক্ষ্মী-

জনার্দন মন্দিরের কয়েকটি ভাস্কর্য অসাধারণ। বর্ধমানের সুহারি গ্রামের এক আটচালা মন্দিরে, পাশাপাশি দুটি ফলকে, স্নানের পর মাথা পিছে হেলিয়ে, গামছা দিয়ে চুল ঝাড়া ও কেশগুচ্ছ নিংড়ানোর দৃশ্য বাঙালিয়ানায় মণ্ডিত। একজনের চুল অপরে বেঁধে দিচ্ছেন এমন রূপকল্প অবশ্য অনেক আছে। গৃহগত খেলার একটিমাত্র দৃষ্টান্তের সন্ধান আমরা পেয়েছি আটপুর-মন্দিরের দেওয়ালে, যেখানে তক্তপোশে উপবিষ্টা ও চামর-ব্যজন ধারিণী-পরিবৃতা দুই মহিলা পাশার ছক পেতে খেলায় মগ্ন। পুরনারীর গীতবাদ্যচর্চার নানা উদাহরণের মধ্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন-মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি বীণাবাদিনীর ভাস্কর্যটি অপূর্ব। অর্বাচীন দেবালয়ে, বেহালা এমনকি বাঁয়া-তবলাবাদিকাদেরও দেখা মেলে। অন্তঃপুরে পশু-পাখি পোষার চলনও কিছু কিছু রূপায়িত হয়েছে যার অন্যতম নিদর্শন, বর্ধমানের দেবীপুরে অবস্থিত দেউলে-নিবন্ধ ময়ূর-কোলে এক অতি-সুন্দর যুবতী-মূর্তি।

সংখ্যায় কম হলেও, টেরাকোটা-ভাস্কর্যে সেকালের সাধারণ মানুষও উৎকীর্ণ হয়েছেন বহুক্ষেত্রে। কৃষকদের বিস্ময়কর অনুপস্থিতির কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায়, শকট-চালক, সহিস, পালকি-বেহারা, সৈন্য, যুদ্ধযাত্রী কাড়ানাকড়া-বাজিয়ের দল, পাইক-বরকন্দাজ, হুঁকাবরদার প্রভৃতি নানাবিধ পরিচারক, মোসাহেব ও খিদমতগারগণ, নর্তকী, গায়িকা, সঙ্গতিয়া, বারাঙ্গনা, রক্ষিতা, মায় তাদের সংগ্রাহকবৃন্দ উল্লিখিত হয়েছে সরাসরি বা প্রকারান্তরে। এছাড়াও দেখা মেলে পাণ্ডা-পুরোহিত ও তীর্থযাত্রীদের (তারাপীঠের আটচালা তারা-মন্দিরে), সন্ন্যাসী ও সিদ্ধিঘোঁটায় নিরত মহন্ত-সম্প্রদায়ের (হুগলির কৃষ্ণপুরে অবস্থিত পরিত্যক্ত আটচালা দেবালয়ে), ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসি বাদকদের (বীরভূমের উচকরণ গ্রামের চারচালা শিবমন্দিরে), কামার, নাপিত, চরকা-কাটুনী প্রভৃতির (হাওড়ার কল্যাণপুরস্থিত নবরত্ন দামোদর-মন্দিরে), এবং মাটি ছাঁচায় নিযুক্ত দু'জন টেরাকোটা-কারিগর ও দুই কুম্ভকারের (বাগনানের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে)।

বাংলার মন্দির-টেরাকোটায় সমাজচিত্রের এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার শেষে, প্রায় ১৮ বছর আগে, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত (এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' লেখাটির পরিসমাপ্তিতে যে-উক্তি করেছিলাম, তা, সমান প্রাসঙ্গিকতায়, আজও করা যায়। সেখানে লিখেছিলাম—"বাঁকুড়া জেলা তথা বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দু-মন্দির কেবলমাত্র দেব-উপাসনার জন্যই ব্যবহৃত হয়নি, সেগুলির দ্বারা নানাবিধ ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়েছে। যাত্রা, গান, কথকতার আসর বসেছে মন্দির প্রাঙ্গণে। নাম-কীর্তন, ধর্মসভা, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সংলগ্ন নাট মন্দিরে। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁর 'দি হিন্দু টেম্পল' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে দেব-সকাশে বাণিজ্যিক চুক্তিপত্র অবধি স্বাক্ষরিত হবার কথা উল্লেখ করেছেন। নৃত্যগীতকুশলীরা তাঁদের প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান মন্দির-দেবতার সম্মুখে এসে নিবেদন করেছেন ভক্তিযুক্তচিত্তে। স্থানীয় পঞ্চায়েত অথবা গ্রামসভাগুলির অধিবেশনও সম্পন্ন হয়েছে দেব-বিগ্রহের সাক্ষাতে। বাংলা দেশের সর্বত্রই মঙ্গলকাব্যগুলির পালাগানও স্থানীয় মন্দির-প্রাঙ্গণেই প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ, রাঢ়দেশ কিংবা ভারতের অন্যত্র হিন্দু-মন্দিরগুলি সমাজজীবনের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত থেকে দিকে দিকে প্রবাহিত গোষ্ঠী-চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, শুভবুদ্ধি সিঞ্চিত করেছে নানাভাবে। স্থানীয় মানবকুলের যাবতীয় ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই মন্দিরগুলিকেই প্রদক্ষিণ করে শত আবর্তে প্রবাহিত

হয়েছে আবহমানকাল। মন্দিরের ইতিহাস সেজন্য শুধুমাত্র ইমারতের গঠন-প্রকরণ বা বিগ্রহের বর্ণনা নয়; জনমানসের যাবতীয় স্পন্দন সেগুলিতে বিধৃত।"

টেরাকোটা-ভাস্কর্যগুলিও নানাবিধ ধর্মীয় আদর্শ রূপায়িত করে সুষ্ঠু সামাজিক নীতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একই ভূমিকা পালন করেছে এতদিন। কিন্তু আজকের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় (যার কলুষবাষ্পে বাংলার গ্রামাঞ্চল এখন আচ্ছন্নপ্রায়), ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্যের পার্থক্য নিরূপিত হয় সংকীর্ণ ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা রাজনৈতিক দলগত স্বার্থের মানদণ্ডে। সামন্ততান্ত্রিক আমলের বস্তাপচা এসব দীপবর্তিকার প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারের দরিদ্র বংশধরেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণে অপারগ হলে, স্থানীয় জনসমাজের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয় না, সাহায্যের একটি হস্তও প্রসারিত হয় না। বঙ্গসংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব অতএব বর্তায় আমাদের রকমারি সরকারগুলির উপর যাঁদের মধ্যে সাচ্চা জনদরদের প্রতিযোগিতা কী নিরন্তর, সরব ও তীব্র! তাঁরা এক্ষেত্রে উদাসীন বললে অল্পই বলা হয়; বিষয়টির গুরুত্বই তাঁদের বোধের অগম্য। ফলে, আশঙ্কা করি, বঙ্গকৃষ্টির এই অসামান্য উপাদানগুলি এখন অমোঘভাবে মৃত্যুপথযাত্রী।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১১-১২ জুলাই ১৯৮১ তারিখে প্রদত্ত রামলাল হালদার-হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা, ১৩৮৭)

১৩৮৮ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

অচল ভট্টাচার্য C/o সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী, ২৮এ, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

১। গণ্ডোয়ানার পশ্চিমে—অচল ভট্টাচার্য

অজয় কুমার দত্ত ৩৩/১এ পাইকপাড়া রো, কলিকাতা-৩৭

১। ছড়াছড়ি—অজয় কুমার দত্ত

অণিমা দাশগুপ্ত পোঃ কল্যাণগড়, ওয়ার্ড নং-১০, জিলা-২৪ পরগণা (হেমচন্দ্র সেন স্মৃতি উপহার)

১। বঙ্গ কাহিনী—হেমচন্দ্র সেন (২৯৬ কপি)

২। সভ্যতার ইতিহাস—নির্মলকুমার বসু

৩। জীবন বিজ্ঞান—বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪। সংস্কৃত-পাঠম্—বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ

৫। মধ্যযুগের ইতিহাস কথা—কিরণচন্দ্র চৌধুরী

৬। মধ্যযুগে ইতিহাস ধারা - মণিলাল চক্রবর্তী

অনাদিভূষণ দাস ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

১। প্রথম প্রহর—প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনিলকুমার ভট্টাচার্য ২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট-১১; কলি ৫৪

১। পথের ধুলোর রঙে রঙে—অনিলকুমার ভট্টাচার্য

অনুপ কুমার মাহিন্দার ; পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

১। মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা—নারায়ণ চৌধুরী, সম্পাঃ

২। কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

৩। তিতুমীর—স্বপন বসু, সম্পাঃ

অপূর্বকুমার রায়, গভঃহাউসিং এস্টেট, ৪০/১ ট্যাংরা রোড, ব্লক-ডি/১, ফ্ল্যাট-৭, কলি-১৫

১। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য, ইংরাজি প্রভাব—অপূর্বকুমার রায়

২। Bengali One Act Plays : tr by Apurbakumar Roy

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। ভ্যালি অব্ ফিয়ার—আর্থার কোনান ডয়েল

২। দি সাইন অব্ ফোর— ঐ

৩। এ স্টাডি ইন স্কার্লেট— ঐ

৪। দি হাউণ্ড অব দি বাস্কার ভিলস্—ঐ

অমরেন্দ্র রায় বর্মণ, ১/১ বাগুইআটি রোড, কলি-২৮

১। ভারদ্বাজ গোত্রীয় বর্মণ বংশ—অরবিন্দ রায় বর্মণ

অমলেন্দু মজুমদার, ৫৭০ লেক টেরেস এক্সটেনশন, কলি-২৯

১। শতদল—অমলেন্দু মজুমদার

অরুণচাঁদ দত্ত ; ৩৯ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২

১। সারাজাবাদ স্কুলের ১২৫ বছর, ১৮৫৬-১৯৮১—নকুড়চন্দ্র মিত্র

২। নারীর স্বাধিকার—অরুণা মুখোপাধ্যায়

৩। সার্ধশত বর্ষ স্মরণিকাঃ ঘুটিয়া বাজার মল্লিক বাটী পাঠশালা ১৮৩০-১৮৮০

অরুণা মজুমদার, ১০১/সি বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬

১। গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা, ১৩৩৮-৬১, ৬৪, ৬৬, ১৩৭০, ৭১, ১৩৭৩-৮২, ১৩৮৪-৮২

২। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ১৩৭১-৭৬, ১৩৭৮-৮০

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা, ১৩৮১-৮৭

৪। পুরাতন পঞ্জিকা, ১২৫১, ১২৬৭, ১২৮৫, ১২৯৮,

অরুণোদয় ভট্টাচার্য, ডি ২/৭৮ পঞ্চেতারা রোড, নিউ দিল্লী

১। একটি ভিটে একটি মানুষ—অরুণোদয় ভট্টাচার্য

অলোক রায়, ১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলি-৪

১। হেমচন্দ্র ঃ ১ম খণ্ড (২য় সং)— মন্মথনাথ ঘোষ

২। ঐ ঃ ২য় খণ্ড (২য় সং)— ঐ

অলোককুমার মিত্র, ৪বি মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলি-৪

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যঃ পাঠক্রম ও জপ—অলোককুমার মিত্র

২। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অ আ ক খ—অলোককুমার মিত্র

৩। সত্যম্ভরা— ঐ

৪। গুরু বলছেন— ঐ

অশোক উপাধ্যায়, কলিকাতা

১। জিজ্ঞাসা—বর্ষ ১, ১৩৮৭

২। সাহিত্য ও সংস্কৃতি—বর্ষ ১৪, ১৫, ১৩৮৫-৮৬

৩। ঐ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১, ১৩৮২

৪। ঐ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২, ১৩৮২

৫। ঐ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩, ১৩৮২

৬। ঐ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৪, ১৩৮২

৭। বঙ্কিম সাহিত্যে ডাকাতের ভূমিকা—পঞ্চানন মালাকার

৮। বাবু কোলকাতার বিবিবিলাস—পিনাকরুদ্র সেন

৯। The Bengali press and literary writing, 1818-31 Abu Hena mustapa kamal.

১০। মুক্তি কোন পথে—মহাদেবপ্রসাদ সাহা

১১। শিশু সাহিত্যে ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকার—রঞ্জিতা কুণ্ডু

১২। কেয়ার বই—চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সম্পাঃ

১৩। কলকাতা—অতুল সুর

১৪। স্মরণ-বরণ—গোপালদাস মজুমদার

১৫। আসা-যাওয়ার মাঝখানে—নলিনীকান্ত সরকার

১৬। স্বর্গের কাছাকাছি—মৈত্রেয়ী দেবী

১৭। কথার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮। আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়—উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯। ন হন্যতে—মৈত্রেয়ী দেবী
২০। Students fight for freedom—AmarendraNath Roy
২১। The split in Indian National Congress—Atulya ghosh
২২। ইতিহাসের বালুবেলায়—অরুণকুমার মজুমদার
২৩। মুদ্রণ শিল্প, ১ম খণ্ড—দীপঙ্কর সেন
২৪। নেহরুর সঙ্গে—এম. ও. মাথাই
২৫। দর্পণে বাংলা—শান্তিকুমার মিত্র
২৬। রুপালী বাতাস—আর. আখতার
২৭। বালক জানে না—সুব্রত চক্রবর্তী
২৮। আগ্নেয় গিরির শিখরে পিকনিক—অশোক রুদ্র
২৯। দাদার কীর্তি—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০। প্রেমিক সন্ন্যাসী—সুব্রত রুদ্র সম্পাঃ
৩১। ভারতের শেষ ভূখণ্ড—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
৩২। The world her village : Selected writings letters of Ellen Roy—ed. bySibnarayan Roy
৩৩। রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা—অমিতাভ চৌধুরী
৩৪। লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা—বিশ্বকর্মা
৩৫। A Short history of Natore Raj—A. K. Moitra
৩৬। Capital Book of Nostalgia—Bidyut Sarkar
৩৭। বাঁকুড়া পরিক্রমা—অনুকূলচন্দ্র সেন
৩৮। শরৎ-সান্নিধ্যে—কালিদাস রায়
৩৯। নতুন ভারত (পাক্ষিক পত্রিকা) প্রথম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা থেকে ১৫শ সংখ্যা পর্যন্ত
৪০। রক্তাক্ত প্রতীক্ষা ১৩৮৮ -মনীশ ঘটক
৪১। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অরুণকুমার বসু সম্পাঃ
৪২। কুমুর বন্ধন—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
৪৩। বিষ্ণুদের কাব্যঃ পুরাণ প্রসঙ্গ—বেগম আক্তার কামাল
৪৪। Dr. B. C. Law: His life & work—RadhaKumud Mookerji
৪৫। The works of Benoy Sarkar—Baneswar Dass
৪৬। নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ২য় খণ্ড—অহীন্দ্র চৌধুরী
৪৭। পটলডাঙ্গার পাঁচালী, - যুবনাশ্ব
৪৮। বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত,—ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাঃ
৪৯। উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল—সম্পাদনা মোহনলাল মিত্র ও কানাইলাল দত্ত

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ২য় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২। শরৎ সাহিত্য—কালিদাস রায়
৩। নির্মলা—প্রেমচন্দ

৪। জ্যোৎস্নায় অরণ্যে একা—দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। বাংলা দেশের কবিতা –মহফিল হক সম্পাঃ
৬। সঙ্গীত দর্শিকা – ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। রবীন্দ্র-কাব্যে রূপের বিবর্তন—গুণময় মান্না
৮। শান্তির সন্ধানে -- বীরেন্দ্র নাথ দেব
৯। সাহিত্য সমালোচনা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। জানাঅজানা, ১ম পর্ব—কমল দাশ
১১। এই মৈত্রী এই মনান্তর—অরুণ সেন
১২। চেস্ট অব ড্রয়ার্স—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

অসিতকুমার সেন, সেন হাউস, ৮/১এ মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলি-৬
প্রিয়নাথ সেন সংগ্রহঃ

১ বিষবৃক্ষ। ১২৮০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২ স্তুতিমালা। ১৩০২। বগলাচরণ রায়চৌধুরী, সং
৩ উপদেশ-মাধুরী। ১৩১৯। অমৃতলাল সেনগুপ্ত, সং।
৪ বল্লাল-সেন নাটক। ১৩২১।
৫ বিবিধ সমালোচনা। ১৮৭৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬ শিক্ষক। ১ম ভাগ। ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন
৭ সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ, ১৩০৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ প্রদীপ। গীতিকাব্য। ২য় সং। ১৩০০। অক্ষয়কুমার বড়াল
৯ ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০। সাহিত্য কৌস্তভ। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। কণ্ঠহার।
১২। নারদ-সূত্র। ১৩১৫।
১৩। স্মৃতি ও অশ্রু। ১৩০৮। অসীমকুমারী দাস
১৪। খণ্ড। অজিতকুমার চক্রবর্তী।
১৫। পিকোচ্ছ্বাসম। ১৯২৫। সত্যচরণ সেন।
১৬। মহাভারতের বৃহৎসূচি। ১৩১৯। জায়ন্ত্র সিদ্ধান্তভূষণ
১৭। শ্রীকৃষ্ণঃ দৃশ্যকাব্য। ১৩৩৩। অপরেশ মুখোপাধ্যায়
১৮। চোরবাগান। ১৩৪১। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। ভূতের বিয়ে ঃ রঙ্গনাট্য/৫ম সং। ভূপেন্দ্রনাথ ,, ২ কপি
২০। নলদময়ন্তী নাটক (ছিন্ন)
২১। বেজায় রগড়। ৬ষ্ঠ সং। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২২। বাঙ্গালী। নাটক। ১৩০২। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ কপি
২৩। ক্ষত্রবীর। নাটক। ৩য় সং। ,, ,,
২৪। উপেক্ষিতা। নাটক। ৩য় সং। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫। কেলোর কীর্তি। দৃশ্যকাব্য। ৩য় সং। ১৩০৩ ,, ,,
২৬। শঙ্খধ্বনি। নাটক ,, ,,
২৭। দেশের ডাক। নাটক ,, ,,

২৮। ভারবি টিকিট। নাটক। ১৩৩৩। ,, ,, ২ কপি
২৯। বৈবাহিক। নাটক। ১৩২৬। ,, ,, ২ কপি
৩০। শিবশান্তি। নাটক। ,, ,,
৩১। গোঁসাইজি। নাটক। ,, ,,
৩২। জোর বরাত। নাটক। ১৩৩২ ,, ,, ২ কপি
৩৩। থিয়েটারের গল্পকথা। উপন্যাস। ১৩৩৪ ,, ,,
৩৪। Guide to the sculptures in the Indian Museum pt I+II 1937
৩৫। No title page (coll of poems) Incomplete.
৩৬। Tables of interest on rupees. 1920
৩৭। Handbook of mystical theology. 1913. D. H. S. Nicholson
৩৮। Two gentlemen of verona। 1903, William Shakespeare
৩৯। Walter patern। 1906। A. C. Benson
৪০। Fanny Burney। 1903। Austin Dobson
৪১। Essays. 1882 George Brimely
৪২। A traveller's narrative pt. II 1891. E. G. Browne, ed
৪৩। Poems. II.1890 J.R.Lowell (damaged)
৪৪। Songs before sunrise. 1896. A. C. Swinburne (damaged)
৪৫। English poems. I. 1906 J. G. Jennings (damaged)
৪৬। Unspeakable Scot. 1904. T. W. H. Crosland.
৪৭। Return of the guards. 1883. Sir F. H. Doyle.
৪৮। History of greland (18th cent) Vol IV 1982. W. E. H. Lockey
৪৯। পদ্মা। ১৩০৫। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৫০। সাবিত্রী সত্যবান। ১৩৩০। স্বর্ণপ্রভা সোম
৫১। চিন্তা লহরী। ১৩২১। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত
৫২। নিষ্কাম পূজা-দীপিকা। ১৩২১। দামোদরানন্দতীর্থ
৫৩। মেঘদূত। ১২৯৯। বরদাচরণ মিত্র
৫৪। তত্ত্ব-সঙ্গীত। ১৯০৩। নন্দলাল পাল
৫৫। শয়তানের খেলা। ১-৪৮ পৃষ্ঠা নেই
৫৬। কালসর্পী যোগীনী ভীষণ ভুল। ১৯১১। পাঁচকড়ি দে সম্পাঃ (ছিন্ন)
৫৭। শকুন্তলা। (আখ্যাপত্র নেই, ছিন্ন)
৫৮। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (ছিন্ন)
৫৯। A brief memoir of Christina G. Rosseti 1896. E. A. proctor
৬০। শিবাজী ও মারাঠাজাতি। ১৩১৬। শরৎকুমার রায়
৬১। সৎ-সাহিত্য গ্রন্থাবলী। ১৩১৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য
৬২। সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী। (আখ্যাপত্রহীন ও ছিন্ন)
৬৩। কাংগাল হরিনাথ। জলধর সেন।
৬৪। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ১৩০২। রমণীমোহন মল্লিক সম্পাঃ

৬৫। চিন্তা-কুসুম। ১৩০৪। মধুসূদন দাসগুপ্ত
৬৬। বড় কাকা। ৪র্থ নম্বর।* একাদশী দেবী, সম্পাঃ
৬৭। তারকেশ্বরের মোহন্ত লীলা। ২য় তরঙ্গ* মুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৬৮। শ্রীগৌরাংগ মংগল সংগীত। ১ম ভাগ। ১৩০৮। নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী, সং
৬৯। কুম্ভমেলা। ১৩৩৩। ভোলানন্দ সেবামণ্ডল
৭০। গান্ধী সমাধি পত্রাবলী। ১৩৪৬। স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য
৭১। কুসুম মালা। ১২৮৫। গোপালচন্দ্র ঘোষ (ছিন্ন)
৭২। আদর্শ সতী গীতাভিনয়
৭৩। সোনার কাটি রূপার কাটি (আখ্যানপত্রহীন) ছিন্ন
৭৪। সিরাজদ্দৌলা নাটকাভিনয় (গীতাবলী) ১৩১৩
৭৫। মজলিসি সংগীত। নূতন সং/বৈষ্ণবচরণ বসাক, সম্পাঃ
৭৬। থিয়েটার সংগীত। ১৩১৩।
৭৭। তিল তর্পণ নাটক। শ্লেষ কাব্য।
৭৮। আধ্যাত্মিক আগমনী। ১৩০২। নিবারণচন্দ্র দে।
৭৯। Palace in the garden . 1887 Mrs Molesworth
৮০। গৌরাংগ। ১৩০৯। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৮১। উপনিষদ্। ১৩১৮। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
৮২। A ride from land's end to John o'grourts 1893. E Burnaby
৮৩। The new standerd Reader. 193৭. Ganguly&Mukherjee
৮৪। মেরীগাথা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার
৮৫। অশ্রু-কণা। ৩য় সং। ১৩০৭। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী
৮৬। ইলিয়াডের গল্প। ২য় সং। ১৩২৬। নবকৃষ্ণ ঘোষ
৮৭। ক্ষণদা, শ্রীগীতচিন্তামণি। ১৩৩৭
৮৮। গৃহিণী। ২য় সং। ১৩২৭। সুবর্ণপ্রভা সোম
৮৯। অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক। অনুবাদ। ১৩২৩। সারদারঞ্জন রায়, অনুঃ
৯০। Short notes on Ramayani Katha. 1938. M. Sen. ed
৯১। কৃষ্ণাষ্টমী। নাট্যগীতিকা। ১৩১১।
৯২। গীতা গ্রন্থাবলী। ১৩১৮। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাঃ (ছিন্ন)
৯৩। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (কীটদন্ট ও ছিন্ন)
৯৪। অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী। ,, ,,
৯৫। অনাথ। প্রিয়ম্বদা দেবী
৯৬। ইঙ্গিত। বিশ্বকর্মা (বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ)
৯৭। দুর্গেশনন্দিনী। ৫ম সং। ১৮৭৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৯৮। সবুজীবাগ। ১০ম সং। ১৩৩৪। প্রবোধচন্দ্র দে
৯৯। মডেল ভগিনী। ১ম ভাগ। ১২৯৩।
১০০। অবকাশ রঞ্জিনী। কাব্য। ২য় খণ্ড। ১২৮৪। নবীনচন্দ্র সেন
১০১। চিত্ত-মুকুর। পদ্য গ্রন্থ। ১২৮৫।
১০২। খনার বচন। ১৩২৯। শরৎচন্দ্রশীল, সং। ২ কপি

১০৩। সাধনামৃত। ১৩০৬। শ্যামলাল গোস্বামী, সং।
১০৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। বঙ্গানুবাদ। ১৩১৮। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অনু
১০৫। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত। পূর্ব্বাংশ। ১৩১৭। অচ্যুতচরণ চৌধুরীতত্ত্বনিধি
১০৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। ১৯০৪। শিবনাথ শাস্ত্রী
১০৭। বরাহপুরাণম্। ১৩১৩। পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাঃ
১০৮। কল্পনা। সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। ৪র্থ বৎসর।
১০৯। উপন্যাস গ্রন্থাবলী। ১৩০৯। রমেশচন্দ্র দত্ত।
১১০। কর্পূর-মঞ্জরী। ১৩১১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনু
১১১। ধনঞ্জয় বিজয় [ব্যায়োগ] ১৩১০ " " "
১১২। মহাবীর চরিত। ১৩০৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনু
১১৩। ভারতবর্ষে। ১৩১০। " " "
১১৪। চণ্ডকৌশিক। ১৩০৮। " " অনু
১১৫। রত্নাবলী নাটক। ১৩০৭। " " "
১১৬। নাগানন্দ। ১৩০৯। " " "
১১৭। মৃচ্ছকটিক। ১৩০৭। " " "
১১৮। প্রিয়দর্শিকা। ১৩১১। " " "
১১৯। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। ১৩০৮ " " "
১২০। দায়ে পড়ে দারগ্রহ। ১৩০৯। " " "
১২১। রজত গিরি (ব্রহ্মদেশীয় নাটক) ১৩১০। " "
১২২। মালতী মাধব। ১৩০৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনু
১২৩। অলীকবাবু। ১৩০৭। " "
১২৪। ঝাঁসির রাণী। ১৩১০। " সং
১২৫। মুদ্রা-রাক্ষস। ১৩০৭। " অনু
১২৬। বিক্রমোর্বশী। ১৩০৮। " "
১২৭। মালবিকাগ্নিমিত্র। ১৩০৮। " "
১২৮। বিদ্ধশালভঞ্জিকা। ১৩১০। " "
১২৯। স্বপ্নময়ী নাটক। ১২৮৮। " "
১৩০। সরোজিনী নাটক। ৬ষ্ঠ সং। ১৩০৬। " " কবিরত্ন
১৩১। কথা-সরিৎ-সাগর। পূর্ব্বাংশ। ১২৮৬। উমেশচন্দ্র গুপ্ত
১৩২। পুরুবিক্রম নাটক। ১৩০৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩। মুর্শিদাবাদ কাহিনী। ৩য় সং। ১৩২৬। নিখিলনাথ রায়
১৩৪। স্বপ্ন-প্রয়াণ। ১৩০৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৫। মহিম স্তোত্রং। ১৩০২। বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন
১৩৬। শ্রীগোবিন্দদাসের একান্নপদ।
১৩৭। সরল রঘুবংশ। ২য় সং। নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন
১৩৮। ঝিষের বাতি। নাটক। ১৩১৯। চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়
১৩৯। সবুজ সুধাপ্রহসন। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
১৪০। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা। ১ম খণ্ড। ১৩০৯। শরৎচন্দ্র দাস, অনু

১৪১। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা। ৩য় খণ্ড। ১৩২১। শরৎচন্দ্র দাস, অনু
১৪২। পুরুষ-পরীক্ষা। ১৩২১। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৪৩। দেবীপুরাণম। ১৩১১। পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পা
১৪৪। ব্রাহ্মধর্মঃ। ৪র্থ সং। ১৭৯৮ শক।
১৪৫। সদ্গুরুর লীলা। হরিদাস বসু
১৪৬। চারুপাঠ। ৩য় ভাগ। ১৭৮১ শক অক্ষয়কুমার দত্ত
১৪৭। সচিত্র রাজস্থান। ১৩০৫। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৪৮। জীবন ও মৃত্যু। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৪৯। সঙ্গীত সন্দর্ভ। ১৯০০। নীলমণি মুখো। ছিন্ন
১৫০। মনুসংহিতা। ২য় সং। ১৩০৩। ভুধর চট্টোঃ সম্পা। ছিন্ন
১৫১। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনা। ১৩০৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছিন্ন
১৫২। বৃহৎ রামনাম সংকীর্ত্তন। ভগবতী চরণ বসু সম্পা
১৫৩। কাল-মৃগয়া (ছিন্ন)
১৫৪। অবধূত গীতা দত্তাত্রেয় অবধূত।
১৫৫। বিজ্ঞান রহস্য। ১৮৭৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো। ছিন্ন
১৫৬। গিরীশ গীতাবলী। ২য় সং।১৯০৭।গিরীশচন্দ্র ঘোষ ছিন্ন
১৫৭। রঘুবংশ ১৩০২ কালিদাস
১৫৮। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। ১৩০২ কালিদাস
১৫৯। মেঘদূত। " "
১৬০। মালবিকাগ্নিমিত্রম্। " "
১৬১। কুমার সম্ভব। " "
১৬২। শ্রুত বোধ। " "
১৬৩। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। ১৩০৮
১৬৪। বেদান্ত দর্শন। ১৩০১।
১৬৫। ভারতী; বৈশাখ, ১২৯২।
১৬৬। বিবিধ প্রবন্ধ। ১৩১১। ভুদেব মুখোপাধ্যায়
১৬৭। হুতোম প্যাঁচার নকসা ১ম, ২য় ভাগ। ৪র্থ সং। ১৩০২। কালীপ্রসন্ন সিংহ
১৬৮। বিবিধ প্রবন্ধ। ১ম ভাগ। ২য় সং। ১৩২২। ভূদেব মুখো
১৬৯। আচার প্রবন্ধ। ১৩০১।
১৭০। মহাত্মা ডফ্সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ১৮৭০
১৭১। অভিব্যক্তিবাদ। ১৩০৯।
১৭২। দুর্গাসুন্দরী। ১২৮১।
১৭৩। বাল্মীকি রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। ১২৮৫
১৭৪। চারুবোধ ব্যাকরণ। ১২৮৮
১৭৫। বাঙ্গালার ইতিহাস। ১ম শিক্ষা। ১৮৮১ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৭৬। স্মৃতি ও অশ্রু। ১৩০৮। অসীমকুমারী দাসী
১৭৭। ঋতুচর্য্যা দিনচর্য্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষা। ১৩০৪। যতীন্দ্রনাথ সেন
১৭৮। কর্ণার্জ্জুন। দৃশ্যকাব্য। ১৩০০। অপরেশচন্দ্র মুখো

১৭৯। অভিজাত। নাটক। ১৩৩৮ শরৎচন্দ্র ঘোষ
১৮০। জাতিতত্ত্ব। ১৩১৬। যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
১৮১। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। ১৮৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮২। বিষ্ণু-মূর্তি পরিচয়। ১৩১৭। বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
১৮৩। পরিণয় সঙ্গীত। ১৩০৬। হরিশচন্দ্র হালদার
১৮৪। সুভদ্রা। নাটক। ১৩৩৬। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
১৮৫। পুষ্পাঞ্জলি। ১৩০৪। রসময় লাহা
১৮৬। আবুল হাসান। নাটক। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
১৮৭। বিদ্যাসুন্দর। নাটক। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
১৮৮। শিবশক্তি। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ ২ কপি
১৮৯। যোগেশ। কাব্য। ২য় সং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যো
১৯০। প্রাচীনা স্ত্রী কবি। ১৩০৫। রমণীমোহন মল্লিক
১৯১। সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার। ১৩০৫। যতীন্দ্রমোহন সিংহ
১৯২। মুকুন্দ মুক্তাবলী। ১৩০২। রূপ গোস্বামী
১৯৩। শ্রীরূপ চিন্তামণি। ১৩৩১। ভজনানন্দ দাস
১৯৪। যোগাদ্যার বন্দনা। ১৩২৪। কৃত্তিবাস পণ্ডিত
১৯৫। সমস্যা সংগ্রহ। ১ম ভাগ। ১৩৩১। জহরলাল শীল, সং
১৯৬। স্বপ্নাধ্যায়। শরৎচন্দ্র শীল
১৯৭। ভক্তিচিন্তামণি। ৩য় সং। ১৩৩০। বৃন্দাবন দাস
১৯৮। প্রেমচিন্তামণি তত্ত্বসার। ১ম খণ্ড। ১৩৩০। ঘনশ্যাম মহান্ত
১৯৯। স্মরণ মঙ্গল। ৫ সং। নরোত্তম দাস
২০০। আবার বঙ্গের ধন (ছিন্ন)
২০১। বঙ্গের রত্নমালা। ২য় ভাগ। ৬ষ্ঠ সং। ১৯২২। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
২০২। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। অভিনব সং। ১৩৩১। নিখিলচন্দ্র ঘোষ
২০৩। কাদম্বরী। ৫ম সং। ১৩২৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যো ও অন্যান্য
২০৪। যযাতি। নাটক। (ছিন্ন)
২০৫। অদ্ভুত কথা। (বিজ্ঞান ভিক্ষু)
২০৬। চৈতন্যচরিতামৃত প্রোক্ত ভক্তবৃন্দের উপদেশ। ১৩২০। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
২০৭। রোহিণীচরিতামৃত। মিস নিস্তারিণী সরকার
২০৮। গুরুগীতা। ৫ম সং। ১৩২৬। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
২০৯। গীতায় ঈশ্বরবাদ। ১৩১২। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
২১০। মার্কণ্ডের চণ্ডী। ৩য় সং। ১৩০১। মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন।
২১১। চিন্তা রহস্য। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২১২। বসন্ত-লীলা। গীতিনাটিকা। ১৩০৬
২১৩। বিবেক-চূড়ামণি। ১৩০৪। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২১৪। রাঠোর-শিবাজী। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
২১৫। হিন্দু। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২১৬। যোগাম্বুধি। ৪র্থ সং। ১৩২১। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

২১৭। সিরাজদ্দৌলা। ১৩০৪। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (ছিন্ন)
২১৮। বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৯০০ ? কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো ?
২১৯। প্রভাতী। ১৯২৪। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২২০। ভারতকোষ। ৬ষ্ঠ, ৭ম-৮ম, ১১শ, ১৩শ ১৪শ খণ্ড। রাজকৃষ্ণ রায় ও শরৎচন্দ্র দেব, সং।
২২১। দারোগার দপ্তর, ৯৫সং : কয়েকরকম। ১৩০৬। প্রিয়নাথ মুখো.।
২২২। বীরভুমি, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৫
২২৩। নব্যভারত। ১৩০৫।
২২৪। সচিত্র সীবন-কারিণী। নলিনীকান্ত চট্টো: ২ কপি
২২৫। ভ্রমর। মাসিকপত্র। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২
২২৬। বীণাপাণি Vol. V, No, 1, 1898
২২৭। „ Vol IV, No 10, 1897
২২৮। বঙ্গসুন্দরী। ২য় সং। ১২৮৬। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী
২২৯। কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ২য় সং। ১৩১৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী
২৩০। চণ্ডীদাস। ৩য় সং। ১৩১২। রমণীমোহন মল্লিক
২৩১। নরোত্তম দাস। ১৩০৯ „ „
২৩২। ক্ষেমেন্দ্রবিজয় ও বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা। ২য় খণ্ড।
২৩৩। বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়। ১৩০৬। বিশ্বম্ভর পাণি
২৩৪। জ্ঞানদাস। ১৩০২ রমনীমোহন মল্লিক সম্পা
২৩৫। প্রবোধচন্দ্রিকা। ১৩১১। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
২৩৬। দীপিকা। ১২৯৪। (মাসিক পত্রিকা)
২৩৭। হিতৈষিণী। ১ম সংখ্যা, ১ম খণ্ড। ১২৯৮
২৩৮। চাঁদসীর চিকিৎসা বিবরণী।
২৩৯। শ্রীজগদানন্দ পদাবলী। ১৩০৬। কালিদাস নাথ, সং (ছিন্ন)
২৪০। সংগীত সংগ্রহ। ১ম খণ্ড। ১২৯০। বাদলবিহারী চট্টোপাধ্যায়
২৪১। সংগীত প্রবন্ধ। ২য় সং। ১৮৮২। ব্রজলাল কুণ্ডু
২৪২। ছন্দোমঞ্জরী। (ছিন্ন)
২৪৩। আকাশবাণী। ১৩১৩। শশিভূষণ ভট্টাচার্য
২৪৪। নাট্যাভিনয়ের গান। মনোমোহন থিয়েটার। ১৩২৬
২৪৫। লীলাগান পদ্ধতি। ১৩২১। রাখালদাস চক্রবর্ত্তী (ছিন্ন)
২৪৬। পিকোচ্ছ্বাসমু। ১৩৩২। সত্যচরণ সেন
২৪৭। আমার জীবন। ৪র্থ ভাগ। ১৩১৮। নবীনচন্দ্র সেন
২৪৮। ভারতীয় বিদুষী। ৪র্থ সং। ১৩২২। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
২৪৯। কৌষীতকী উপনিষৎ। ১৯০৩।
২৫০। বিশ্বত্রাতা। ১৩২২। কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
২৫১। নারদভক্তিসূত্রম্। ১৩১১। শ্যামলাল গোস্বামী ২ কপি
২৫২। নাম ব্রহ্ম অমৃতলাল সেনগুপ্ত
২৫৩। রঞ্জিনী। ১৩০৯। সুরমাসুন্দরী ঘোষ

২৫৪। আরাম। ১৯০৬। রসময় লাহা
২৫৫। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। ২য় সং। ১৩২১।
২৫৬। স্বপ্নাধ্যায়। শরৎচন্দ্র শীল, সং
২৫৭। আমার জীবন। ১৩১৩। রাসসুন্দরী
২৫৮। কুমকুমি। ২য় সং। মণিলাল গঙ্গো.
২৫৯। গুরুঠাকুর। রঙ্গনাট্য। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো.
২৬০। বসন্ত প্রয়াণ। ১৩২০ সরযূবালা দাসগুপ্তা
২৬১। অডিসির গল্প। ২য় সং। ১৩২৪। নবকৃষ্ণ ঘোষ
২৬২। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র। কিশোরীমোহন চট্টো.
২৬৩। রাজপুত কাহিনী। ২য় সং। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
২৬৪। দেবযানী। দৃশ্যকাব্য। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
২৬৫। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। অভিনব সং। ১৩২৭; গিরীশচন্দ্র ঘোষ
২৬৬। শাস্ত্র ও সদাচার। অমৃতলাল সেনগুপ্ত
২৬৭। Poetical gems. 1931 Saratchandra Sen.
২৬৮। চানক্য-নীতি সার। ৪র্থ সং। শরৎকুমার বিদ্যাভূষণ
২৬৯। আমার জীবন। ২য় ভাগ। ১৩১৬। নবীনচন্দ্র সেন
২৭০। কাঙ্গাল হরিনাথ। ২য় খণ্ড। জলধর সেন
২৭১। গ্রীক ও হিন্দু। ৩য় সং। ১৩১৬। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭২। কৃষ্ণ ও বসনাসুন্দরী। ১৯১০। ভোলানাথ দেব
২৭৩। প্রয়াস। মাসিক পত্র। ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। ১৯০০
২৭৪। পূজার ফুল। ১৩২০। শৈলেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
২৭৫। Complete works of William Shakespeare—V
২৭৬। যুগলাঙ্গুরীয়—বঙ্কিমচন্দ্র (ছিন্ন)
২৭৭। ধ্যান-ভঙ্গ। কাব্যচিত্র, ১৩০৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৭৮। পাহাড়ী গোয়েন্দা। ১৩৩৪। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
২৭৯। ডুব দেওয়া ইত্যাদি প্রবন্ধ (ছিন্ন)
২৮০। সোনারতরী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছিন্ন)
২৮১। বৌদ্ধধর্ম। ১৩০৮। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৮২। পদরত্নাবলী। ১২৯২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পা
২৮৩। শান্তানন্দতরঙ্গিনী। ৩য় সং। ১৯১০ ব্রহ্মানন্দ গিরি
২৮৪। ভক্তিযোগ। ১৩০৭। স্বামী শুদ্ধানন্দ অনু.।
২৮৫। শঙ্করাচার্য-চরিত। ১৩১০। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
২৮৬। কবিতা রত্নাবলী। ১ম ভাগ। ৭ম সং। ১৯০১। সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, সং
২৮৭। সঙ্গীতাবলী। ১৩০৬। রাখালচন্দ্র সেন।
২৮৮। খনার বচন। ১৩২৯। শরচ্চন্দ্র শীল
২৮৯। ভারত উচ্ছ্বাস। ১২৮২। নবীনচন্দ্র সেন
২৯০। সত্যমঙ্গল। ১৮৩৫ শক। রামগোপাল রায়
২৯১। স্বর্ণসন্ধ্যা। ১৩৫৫। মণিলাল বন্দ্যো

২৯২। অশ্রুবিন্দু। ১৩০৩। অন্নপূর্ণা মল্লিক
২৯৩। সোনায় সোহাগা। ১২৯২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯৪। হিতে বিপরীত। ১৩০৩। নূতনদাদা
২৯৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ১৯২৯। খগেন্দ্রনাথ মিত্র
২৯৬। রেকর্ড সংগীত। মল্লিক ব্রাদার্স (ছিন্ন)
২৯৭। নব্যভারত, পৌষ—চৈত্র, ১৩০৫।
২৯৮। বীণাপাণি। মাসিকপত্রিকা। ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৩০১ ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ-৫ম, ৭ম, ৯ম, ১১শ-১২শ সংখ্যা ১৮৯৭-৯৮ ৫ম খণ্ড, নং ২, ১৮৯৮
২৯৯। ভক্তি। মাসিক পত্রিকা। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ১৩১৪। ৪র্থ-৫ম সংখ্যা ১৩১৪। ৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ১৩১৬। ১০ম বর্ষ ১০ম-১১শ সংখ্যা ১৩১৯। ১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩১৯। ১১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩২৩।
৩০০। গৃহস্থ। মাসিক পত্র। ১ম খণ্ড। ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা, ৩য়, ৮ম, ৭ম, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১০-১২সংখ্যা, ১৩১৬-১৭ ২য় খণ্ড। ২য় বর্ষ। সংখ্যা ১-১০, ১৩১৭-১৮ ১১-১২ ১৩১৮ ৩য় খণ্ড। ৩য় বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। ১৩১৮
৩০১। Isa-Upanishad. 1901 Shyamlal Goswami, ed
৩০২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত। ৪৪৩ চৈতন্যাব্দ। বৃন্দাবন দাস
৩০৩। স্তবমালা। ১৩২৭
৩০৪। সরলচণ্ডী। ২য় সং। কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
৩০৫। The Gospels & Acts। rev version
৩০৬। পঞ্চভূত। ১৩০৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩০৭। Principles of low & Evidence, 7th ed. 1883. W. M. Best
৩০৮। গিরিশ গ্রন্থাবলী। গিরিশচন্দ্র ঘোষ
৩০৯। হরিরাজ। ১৩১২। গ্রাণ্ড থিয়েটার
৩১০। শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য। ১৩৩০
৩১১। শিবরাত্রি ব্রতকথা। ১৩১৯। অতুলচন্দ্র বন্দ্যো
৩১২। শ্রীগুরুগীতা। ১৩২৭
৩১৩। হরিনাম সংকীর্তন। ১৩১১। কানাইলাল দত্ত
৩১৪। সাহিত্য-প্রসঙ্গ। ৯ম সং। ১৮৯৫। নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
৩১৫। কনকাঞ্জলি। গীতিকাব্য। ১২৯২। অক্ষয়কুমার বড়াল
৩১৬। Initiatory grammer. 1916। Pramode Nath Sen
৩১৭। মালিনী গয়লানী। (ছিন্ন)
৩১৮। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (ছিন্ন)
৩১৯। প্রবাস চিত্র
৩২০। সমস্যা সংগ্রহ। ২য়-৩য় ভাগ। ১৩৩০-২১। শরচ্চন্দ্র শীল
৩২১। সংগীত সংগ্রহ। ১ম খণ্ড। ১২৯০। বাদলবিহারী চট্টো, সং (ছিন্ন)
৩২২। Old Testament
৩২৩। লেখা। ১৩১৩। যতীন্দ্রমোহন বাগচী
৩২৪। সুরুচির কুটির। ১২৮৬। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩২৫। বল্লরী। ১৩২২। কালিদাস রায়
৩২৬। [কবিতা সংগ্রহ] ১৮৭০ ? বিহারীলাল চক্রবর্তী
৩২৭। রেখা। ১৩১৭। যতীন্দ্রমোহন বাগচী
৩২৮। কথা কলম কাজ। প্রমথ রায় চৌধুরী
৩২৯। বলরাম দাস। ১৩০৬। রমণীমোহন মল্লিক
৩৩০। টেলিমেকস। ১৪শ সং। ১৯০৭। রামকৃষ্ণ বন্দ্যো, সম্পা
৩৩১। পঞ্চদশী। ১৩১৪। বিদ্যারণ্যমুণীশ্বর
৩৩২। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ। ১ম খণ্ড। ১৩১৬ ২য় খণ্ড। ১৩১৮
৩৩৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪র্থ ভাগ। ১৩২২।
৩৩৪। বেদান্ত দর্শনম ১ম খণ্ড। ১৩২৩ ২য় খণ্ড। ১৩২৩
৩৩৫। ভক্তিতত্ত্বসার গ্রন্থঃ। ১৩২০। রামদাস বাবাজী, সম্পা
৩৩৬। শৃঙ্গার তিলক ও শৃঙ্গার রসাষ্টক। ১৩০২ কালিদাস
৩৩৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা। ৪১০ চৈতন্যাব্দ
৩৩৮। সুবর্ণবণিক সমাচার। ১৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ১৩৪২
৩৩৯। ব্যবস্থাসর্বস্ব। ৩য় সং। ১৩৩৪। নন্দকুমার কবিরত্ন, সং
৩৪০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম। ১৮২৭শক। পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পা
৩৪১। গরুড় পুরাণম। ১৩১৪। পঞ্চানন তর্করত্ন
৩৪২। ঠাকুরের কথা। ৩য় সং। ১৩২৫
৩৪৩। মহাভারতান্তর্গত বিরাটপর্ব ৩য় সং। ১৩১৭। অর্জুন মিশ্র
৩৪৪। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ১২৯৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো৹
৩৪৫। রোমিও জুলিয়েত। ১৩০১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪৬। মদীয় আচার্যদেব। ২য় সং। ১৩৩০। স্বামী বিবেকানন্দ
৩৪৭। পওহারী বাবা। ২য় সং। ১৩২০। " "
৩৪৮। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১ম খণ্ড। ১৮১২শক
৩৪৯। সত্যমঙ্গল। ১৮৩১শক। রামগোপাল রায়
৩৫০। সুদখোর ও সওদাগর। ১৩২২। নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
৩৫১। রামায়ণের কথা। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, সং
৩৫২। জাতীয় সমস্যায়। ১৩৫৮। স্বামী বিবেকানন্দ
৩৫৩। স্তবমালা। ১৩২৭
৩৫৪। আশাবতীর উপাখ্যান ২য় সং। ১৩২১। জগদানন্দ মৈত্র
৩৫৫। আর্য্যাগাথা। ২য় ভাগ। ১৮৯৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৩৫৬। পরিহাস। ১৩৩১। রসময় লাহা
৩৫৭। গৌরাঙ্গের উপদেশ। ১৩২০। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সম্পা
৩৫৮। জ্যোতিষসার সংগ্রহ। ৩য় সং। ১৩২৩। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
৩৫৯। সম্রাট পঞ্চম জর্জ। ৩য় সং। ১৯১৩। দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৩৬০। The oriel window (ছিন্ন)
৩৬১। Short studies (ছিন্ন)
৩৬২। The poetical works। vol I। 1890। Thomas Chatterton

৩৬৩। Robert Browning's poetical works, vol 1 ছিন্ন
৩৬৪। Adventures of Harry Richmond ছিন্ন
৩৬৫। Mungo park and the Niger
৩৬৬। Shakespeare—His mind and art ছিন্ন
৩৬৭। The beauties of nature ছিন্ন
৩৬৮। Cervante's Don Quixote, pt I ছিন্ন
৩৬৯। Expansion of England ছিন্ন
৩৭০। Short studies ছিন্ন
৩৭১। Burke's reflections on the Revolution in France ছিন্ন
৩৭২। History of England ছিন্ন
৩৭৩। Sikandar Nama। 1888। H. Wilberforce Clarke ছিন্ন
৩৭৪। কাজের লোক। ১৯১০-১৫। পত্রিকা। ছিন্ন
৩৭৫। ভারতী। ১ম খণ্ড। ১২৮৪।
৩৭৬। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ১ম-২য় ভাগ। নগেন্দ্রনাথ বসু ছিন্ন ১ম ২কপি
৩৭৭। Last Lynne। 1906। Henry Wood ছিন্ন
৩৭৮। The Taiping revolution। 1/76।
৩৭৯। Bengal Discovered—Gopen Dutta
৩৮০। Italy
৩৮১। Self-help. 1896 Samuel smiles
৩৮২। Territorial Claims of Mao. Tse. Tung.
৩৮৩। সবুজ সুধা। ২য় সং। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
৩৮৪। Hand book of Agriculture ছিন্ন
৩৮৫। Empresas V Actividates Thristicas
৩৮৬। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। ছিন্ন
৩৮৭। কূর্ম্মপুরাণম। ১৩১১। পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পা ২ কপি
৩৮৮। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ছিন্ন
৩৮৯। Facts about Yugoslavia
৩৯০। Facts about Israel, 1971
৩৯১। Regulations Concerning flats
৩৯২। পারের কড়ি। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
৩৯৩। বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৩৯। ১ম সংখ্যা
৩৯৪। Modern Review। 1927। ১ম সংখ্যা
৩৯৫। সুবর্ণ বণিক সমাচার ১৩৪১-৪২। ২য় সংখ্যা
৩৯৬। প্রণব, ১৩৭৩-৭৭। ২য় সংখ্যা
৩৯৭। রূপসী ইরাণী। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
৩৯৮। জয়দেব। ১৩১৯। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
৩৯৯। সুভদ্রা। ২ সং। ১৩৩৬। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
৪০০। গৃহস্থের যোগশিক্ষা। ৪র্থ সং। ১৩৩২। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

৪০১। ভারতবর্ষের ইতিহাস। 2nd rev. ed। N. C. Roy
৪০২। দ্বিজপদ গোস্বামীর সম্বর্ধনা উৎসব। ১৩৫৯।
৪০৩। সবুজপত্র। ১৩৩৪, বৈশাখ
৪০৪। উলুপী নাটকাভিনয়। ১৬৩৩
৪০৫। সীতাহরণ। ১৩৩৯। অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ
৪০৬। সঙ্গিনী। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৪০৭। তত্ত্বজ্ঞান। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
৪০৮। শ্রীশ্রীতারার অষ্টোত্তর শতনাম
৪০৯। বালক বিজয়কৃষ্ণ। সীতানাথ গোস্বামী
৪১০। মাতৃ-তর্পণ। ৺সরোজিনী শীল
৪১১। মাতৃ-প্রশস্তি। ৺শ্যামমোহিনী সেন
৪১২। বাল্মীকি-প্রতিভা। ১২৯২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছিন্ন)
৪১৩। গীতগোবিন্দম। (ছিন্ন)
৪১৪। মহাবীরচরিতম্। (ছিন্ন)
৪১৫। নলিনীমোহন। ১২৮০। বিরাজমোহিনী দাসী
৪১৬। ভারত-উদ্ধার। ১২৯০। রামদাস শর্ম্মা
৪১৭। নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব। প্রমথনাথ মল্লিক
৪১৮। ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস। সি. জি. নর্থ
৪১৯। মালতী মাধব। ২য় সং। ১২৯৩। লোহারাম শিবরত্ন
৪২০। আচাভূয়ার বোম্বাচাক। নাটক। নাদাপেটা হাঁদারাম
৪২১। লোভেন্দ্র গবেন্দ্র। রাজকৃষ্ণ রায়
৪২২। কলির সহর। ১৮৮৪। রসিক মোল্লা
৪২৩। আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মে পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪২৪। বিসর্জন। ১৯০৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪২৫। বিধান ভারত। ১৮০২শক।
৪২৬। ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা। ১৩৩৬। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৪২৭। ৺ কালীনাম কীর্তন। ১৩২৯। ৩ কপি
৪২৮। সংস্কৃত-মঞ্জরী। প্রথম ভাগ। ১৮৯৩। অলোকনাথ ন্যায়ভূষণ
৪২৯। Sanskrit Selections. Cal. Unv. 1910
৪৩০। অন্নদামঙ্গল
৪৩১। চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের ব্যাখ্যা। ১৩০৬। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন
৪৩২। রঘুবংশম। ১৯০৯। কালিদাস (ছিন্ন)
৪৩৩। শঙ্কর ও শাক্যমুণি। ১৩০৭। কালীবর বেদান্তবাগীশ
৪৩৪। উদ্বোধন ঃ সুবর্ণ জয়ন্তী ঃ ১৩৫৪।
৪৩৫। বসুমতী। ৪র্থ বর্ষ, ১৩৩২ (বৈশাখ)
৪৩৬। সচিত্র শিশির। ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১৯২০
৪৩৭। দেবর্ষি দরবার। ১ম বর্ষ; ১ম ২য় সংখ্যা। ১৯২০
৪৩৮। ব্রহ্মসংগীত—স্বরলিপি ছিন্ন।

৪৩৯। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী। ১৩১৭।
৪৪০। ঋতুসংহার। ১৩০২। কালিদাস
৪৪১। ঝিন্দের বন্দী। ১৩৪৫। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৪২। প্রতিভা। ৭ম সং। রজনীকান্ত গুপ্ত
৪৪৩। বেদ প্রবেশিকা। ১৩১১। উমেশচন্দ্র বটব্যাল
৪৪৪। গ্রহের ফের। ১৩৫২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
৪৪৫। আমরা বাঙ্গালী। ৩য় সং। হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়
৪৪৬। ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা। ১৯১১। তারাকিশোর শর্মাচৌধুরী
৪৪৭। অমৃত সংসার। ১৮২৪ শক (ছিন্ন)
৪৪৮। পাতঞ্জলার্থ প্রকাশঃ। ১২৯০। জনমেজয় ঘটক
৪৪৯। হরিপাদপদ্মলাভ। ১৩০৯। পঞ্চানন রায়চৌধুরী
৪৫০। উপনিষদঃ। ২য় খণ্ড। ১৮৯৫। সীতানাথ দত্ত
৪৫১। বেদান্ত রত্নাকর। ১৮৯২। শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ
৪৫২। History of Greece, Vol I-IV q VIII W. Mitford
৪৫৩। বেদান্ত সমন্বয়ঃ। ১৮২৮
৪৫৪। Waverly words (ছিন্ন)
৪৫৫। Govt. almanacs 1842-1875 (ছিন্ন)
৪৫৬। Confessions of an English opiumeater. (ছিন্ন)
৪৫৭। Around the world through Japan. 1903. Walter Delmar (ছিন্ন)
৪৫৮। শতদল। ১২৯৩। হিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৫৯। কলির সমুদ্রমন্থন। ১৩৩৮। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো.
৪৬০। দেশের ডাক। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬১। প্রাণের দাবি। ১৩৩৬। জলধর চট্টোঃ ২ কপি
৪৬২। অনিল-দূত। ১৩০৪। ফকিরচাঁদ গোস্বামী
৪৬৩। কল্পকথা। ২য় সং। ১৩১৮। মণিলাল গঙ্গো.
৪৬৪। পদ্মা। ২য় সং। ১৩০৮। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৪৬৫। মেঘদূত। ১২৯৮। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৬৬। আবুল হাসান। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৪৬৭। Collection of English poetry (Brittle)
৪৬৮। Guide to a survey of British History. K. B. Basu
৪৬৯। Golden gems, pt III (For students)
৪৭০। Landmark of Ethics. B. Mallik.
৪৭১। Cal. Univ. Calendar. 1868
৪৭২। মানময়ী গার্লস স্কুল। ১৩৩৯। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
৪৭৩। Collection of English Poetry (ছিন্ন)
৪৭৪। English literature (ছিন্ন)
৪৭৫। Lives, great & small (ছিন্ন)

৪৭৬। English language (ছিন্ন)
৪৭৭। Waverly novels ,,
৪৭৮। God and the man ,,
৪৭৯। Collection of English poetry (ছিন্ন)
৪৮০। Don Gesualdo (ছিন্ন)
৪৮১। English grammar ,,
৪৮২। Philip Van Artevelde ,,
৪৮৩। Life & letters of Erasmus ,,
৪৮৪। A selection from the works of Wordsworth (ছিন্ন)
৪৮৫। Autobiographical notes of the life of William Bellscot
৪৮৬। কালিদাস। ১৩১৮। বিজয়চন্দ্র মজুমদার
৪৮৭। ভাস্করানন্দ চরিত। ২য় সং। ১৩১২। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪৮৮। হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা। ৩য় ভাগ। ৩য় সং। ১২৯৯। দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন সং
৪৮৯। ,, ,, ,, ১০ম সং। ১৩২১। মথুরানাথ ন্যায়রত্ন সং
৪৯০। ,, ,, ৪র্থ ভাগ। ৯ম সং। ১৩১৮। ,, ,,
৪৯১। ,, ,, ৫ম ভাগ। ৮ম সং। ১৩২০। ,, ,,
৪৯২। ,, ,, ৬ষ্ঠ ভাগ ৭ম সং। ১৩১৭। ,, ,,
৪৯৩। ,, ,, ৮ম ভাগ। ৭ম সং। ১৩২০। ,, ,,
৪৯৪। ,, ,, ৯ম ভাগ। ৬ষ্ঠ সং। ১৩২০। ,, ,,
৪৯৫। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড। ১৩২২। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল
৪৯৬। গাথা। ১৩১২। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৪৯৭। স্বপন। ১৩১৩। ,, ,,
৪৯৮। কবিতা। ১৩১৭। ,, ,,
৪৯৯। পদ্মা। ১৩১২। ,, ,,
৫০০। যমুনা। ১৩১২। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৫০১। মণিমুক্তা। ১৯২১। রসময় লাহা
৫০২। ,, ১৩২৩। ,, ,,
৫০৩। ছাইভস্ম। ১৩৩৭। ,, ,,
৫০৪। আমোদ। ১৩২০। ,, ,,
৫০৫। Law Report. Brittle
৫০৬। Comparative politics. Brittle
৫০৭। La Dame auxcamelia (ছিন্ন)
৫০৮। Lyrics from Elizabethian song books (ছিন্ন)
৫০৯। English men of letters. Charles Lamb. ,,
৫১০। Robinson Crusoe (ছিন্ন)
৫১১। Garland of new poetry vol. 2 Elkin mathad.
৫১২। Poems 1892. Adam Linsay Gordon (ছিন্ন)
৫১৩। Poultry & Pigeons ,,

৫১৪। Common ailments ,,
৫১৫। English literature ,,
৫১৬। Law Report ,,
৫১৭। Burge on colonial and foreign laws Vol. I 1907 ছিন্ন
৫১৮। পর্ণপুট। ১৩২১। কালিদাস রায়
৫১৯। Franco-Prussian war
৫২০। কথা-সরিৎসাগর।
৫২১। শ্রীশ্রীসনাতন-বৈষ্ণব ব্রত-দিন। ১ম সংখ্যা। ১৩০৭
৫২২। ব্রহ্মতত্ত্ব। ত্রৈমাসিক পত্র। ১৩০৩।
৫২৩। ,, ৪র্থ ভাগ। ১ম-৩য় সংখ্যা। ১৩০৬
৫২৪। ছান্দোগ্যোপনিষদ। ১৩১৩। শ্যামলাল গোস্বামি
৫২৫। হিন্দু-রত্নমালা। ১ম ও ২য় ভাগ। ৬ষ্ঠ সং। ১৩২১
৫২৬। হিন্দু-সৎকর্মমালা। ৬ষ্ঠ ভাগ ছিন্ন
৫২৭। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। ২য় খণ্ড। ১৩১০। ধর্মানন্দ মহাভারতী
৫২৮। উপনিষদাবলী। ছিন্ন
৫২৯। রাজকাহিনী। ১৩২১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৩০। ব্রহ্মচর্য-সাধন। ১৩১৬। ছিন্ন
৫৩১। বঙ্গসুন্দরী। ১৯২৬ সম্বৎ। বিহারিলাল চক্রবর্তী
৫৩২। মহুয়া। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৫৩৩। জাপানী ফানুস। ১৩২১ ,,
৫৩৪। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ৫ম সং। ১৩১৯! অবিনাশ চন্দ্র মুখো. ছিন্ন
৫৩৫। Album ,,
৫৩৬। Book of Nonsense ,,
৫৩৭। Review of Reviews ,,
৫৩৮। English illustrated magagine 1883 ,,
৫৩৯। Harper's magazine. 1883
৫৪০। English illustrated magazine 1884 (৩ কপি)
৫৪১। Review of Reviews June-Oct 1890 (২ কপি)
৫৪২। Health & happiness, Jan-Feb, Mar-July, Sept 1917
৫৪৩। ,, ,, Jan, March, May, June, July, Aug. 1916
৫৪৪। L 'E' cole des maitresses. (ছিন্ন)
৫৪৫। The Purgatory of Peter, the Cruel ,,
৫৪৬। উল্কা। ১৯৪৬। তারক মুখোপাধ্যায়
৫৪৭। ধর-পাকড়। ১৩৩৮। ভূপেন্দ্রনাথ মুখো.
৫৪৮। গীতা-পরিচয়। ২য় সং। ১৩২০। ২ কপি রামদয়াল মজুমদার
৫৪৯। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্। ১৮১২ শক। জয়দেব গোস্বামী
৫৫০। পদ্মপুরাণম্। ১৩২৩।
৫৫১। প্রাচ্য-বিজ্ঞান। ১৩২৩। অমৃতলাল গুপ্ত

৫৫২। আরতি। ১৩০৯। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৫৫৩। চৈতন্যমঙ্গল। ৩ কপি
৫৫৪। রাধিকামঙ্গল। ১৩০৯।
৫৫৫। জয়দেব-চরিত্র। ১৩০৭। বনমালী দাস
৫৫৬। রাধিকার মানভঞ্জন
৫৫৭। রসমঞ্জরী। ১৩০৬। পীতাম্বর দাস
৫৫৮। সংস্কৃত প্রবেশ। ১ম ভাগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৫৯। গৌরাঙ্গ। ১৩০৯। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৫৬০। মধ্যবাংগালা ব্যাকরণ। ১৩৩৮। হরিপদ ভট্টাচার্য
৫৬১। অধ্যয়ন ও সাধনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৫৬২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৩২২। মন্মথনাথ ঘোষ
৫৬৩। বিক্রমাদিত্য কাদম্বিনী। ১৯১১। ভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ
৫৬৪। প্রসাদী সঙ্গীত। ১৩১৪। রামপ্রসাদ সেন ২ কপি
৫৬৫। দ্যাখন হাসি। ১২৮৯। শ্রীহীন—পোড়ারমুখো
৫৬৬। উদ্গাথা। ১৮০৮ শক প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
৫৬৭। বিষাদশতকম্। ১৮২৩ শক। বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ
৫৬৮। কামিনী কুঞ্জ। ১২৮৫। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৫৬৯। চীনের কলোনী। ১২৮৯।
৫৭০। শিক্ষানবিশের পদ্য ১৮৭৪। অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৫৭১। ভারত সঙ্গীত সমাজ। ১৩১০
৫৭২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব
৫৭৩। মায়ামুক্তি (ছিন্ন)
৫৭৪। হাসির গান। ১৩০২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ছিন্ন
৫৭৫। সত্যমঙ্গল। ১৮৩৫ শক। রামগোপাল রায়
৫৭৬। ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি। ১৩২৫। কুলদারঞ্জন রায়
৫৭৭। অরুণোদয়। ১ম ভাগ
৫৭৮। সঙ্গীত সার সংগ্রহ। ১ম খণ্ড। ২য় সং। ১৩০৭। হরিমোহন মুখো. ছিন্ন
৫৭৯। বিষবৃক্ষ (ছোটদের বঙ্কিম গ্রন্থমালা) ধীরেন্দ্রলাল ধর
৫৮০। পাণ্ডব গৌরব। নাটক।
৫৮১। হিরণ্ময়ী ও হল কি অভিনয়। ১৩১২।
৫৮২। লিঙ্গ-নির্ণয়। ১২৯৬। এম. এস. গোস্বামী ৩ কপি
৫৮৩। আর্য-নারী। ১ম ভাগ। ২য় সং। ১৩১৬ কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
৫৮৪। সত্যমঙ্গল। ১৮৩৫ শক—রামগোপাল রায়
৫৮৫। অন্নদাকল্পতন্ত্র। ১৩১৩। মোহিনীমোহন বিদ্যালঙ্কার, অনু
৫৮৬। হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা। ১৬ শ সং। ১৩২২
৫৮৭। হিন্দু ব্রতমালা। ৩য় ভাগ। ৫ম সং। ১৩২১
৫৮৮। গুরুঠাকুর। ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৮৯। গোবর গণেশের গবেষণা। ১৩২২। হরিদাস হালদার
৫৯০। কাশী পরিক্রমা। ১৩১৩। জয়নারায়ণ ঘোষাল
৫৯১। সুভদ্রা। ১৩৩৬। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
৫৯২। দেশের ডাক। ১৩৩৭। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো.
৫৯৩। বিদ্যাধরী (নাট্যরঙ্গ)। ১৩২৫ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৯৪। বেজায় রগড়। " "
৫৯৫। ধর-পাকড়। ১৩৩৮। " " (২ কপি)
৫৯৬। সৎসঙ্গ। ২য় সং। " "
৫৯৭। ক্ষত্রবীর। ৭ম সং। " " ২ কপি
৫৯৮। বৈকুণ্ঠে বাজি। " "
৫৯৯। শ্যামা। ১৩৪২। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
৬০০। চাণক্য-মঙ্গল। ১৮৩৭ শক। রামগোপাল রায়
৬০১। বৈষ্ণবাচারদর্পণ। প্রথম ভাগ। ৪র্থ সং। ১৩৩৬। নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী
৬০২। শিক্ষা না সেবা। ১৯১২। জে. কৃষ্ণমূর্ত্তি ২ কপি
৬০৩। কৈকেয়ী। ১৯০৯। রামদয়াল মজুমদার
৬০৪। সুনীতি-সুধানিধিঃ। ১ম খণ্ড। ১৩০৫। গোবিন্দলাল বন্দ্যো
৬০৫। ফুলশর। ১৩১১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার
৬০৬। কুমুদ-কলিকা। ১৩০৫। কুমুদিনী দেবী
৬০৭। স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা। ১৮৯৩। আর্যমিশন ইনস্টিটিউশন,
৬০৮। নির্বাসন-কাহিনী। ১৩১৭। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
৬০৯। শ্রী শ্রী গুরু গীতা। শরৎচন্দ্র শীল এণ্ড সন্স, প্রকাশক
৬১০। কবি-কাহিনী। ১৯৩৫ সম্বৎ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬১১। বনফুল। ১২৮৬। "
৬১২। কবীর। ১ম-৪র্থ খণ্ড। ১৩১৭ ক্ষিতিমোহন সেন
৬১৩। গল্প। ১৩১২। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
৬১৪। Characteristic limitation of Transistors Vol. 4
৬১৫। সাংখ্যদর্শন। ২য় সং। ১৮৮৩। কালীবর বেদান্ত বাগীশ
৬১৬। ভারতশিল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬১৭। বাসবদত্তা। ৩য় সং। ১২৭৮। মদনমোহন তর্কালঙ্কার (ছিন্ন)
৬১৮। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৯১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "
৬১৯। রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। ১৮০৩ শক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিন্ন
৬২০। ছুটির পড়া " " "
৬২১। দেশভক্তি। ১৩১২। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৬২২। গোচারণের মাঠ। ১২৮৭। অক্ষয়চন্দ্র সরকার "
৬২৩। প্রেমপ্রবাহিনী। ১২৭৭। বিহারীলাল চক্রবর্তী
৬২৪। ঊনবিংশতি সংহিতা। ১২৯৬। পঞ্চানন তর্করত্ন, অনু (অত্রিসংহিতা)
৬২৫। বিষ্ণু সংহিতা "
৬২৬। হারীত সংহিতা "

৬২৭ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। ১২৯৫। „
৬২৮ নারায়ণ, ফাল্গুন, ১৩২১
৬২৯ গৃহস্থ। ১ম খণ্ড। ১ম বর্ষ। ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা ১৩১৬
৬৩০ তন্ত্রতত্ত্ব। ১ম ভাগ। ১৩১৭।
৬৩১ মনুসংহিতা। ১২১৬।
৬৩২ ভার্গববিজয় কাব্য। ১২৮৪ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
৬৩৩ নালক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩৪ গোচরণের মাঠ। ১২৮৭। অক্ষয়কুমার সরকার
৬৩৫ মহাত্মা জীবন কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত। ১৩১৭। বঙ্কুবিহারী কর
৬৩৬ বিবাহ-বিপ্লব। ১৩২২। কেশবচন্দ্র গুপ্ত
৬৩৭ অপরাজিতা। ১৩২০। যতীন্দ্রমোহন বাগচী
৬৩৮। গীতিকা। ১৯০০ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
৬৩৯। শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত। ৩য় সং। ১৩৩৩। নন্দকিশোর দাস
৬৪০। ব্রজ-পরিক্রমা। ১৩১২। নগেন্দ্রনাথ বসু, সম্পা
৬৪১। ভদ্রা। ১৯০৮। রামদয়াল মজুমদার
৬৪২। অনুশীলন (ছিন্ন)
৬৪৩। চামুণ্ডার শিক্ষা। ১৩২২ নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
৬৪৪। ভারতের নারী (সচিত্র)। ১ম সং। ১৩৫২। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬৪৫। শ্রীবদরী কেদার মাহাত্ম্য। ১৩১৮। জ্ঞানানন্দ ভারতী
৬৪৬। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ১৩২৩
৬৪৭। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী। ১৩১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৬৪৮। মহাভারত। বিজয় পণ্ডিত
৬৪৯। „ প্রথমাংশ। „ „
৬৫০। ছুটিখানের মহাভারত। ১৩১২ শ্রীকর নন্দী
৬৫১। শ্রীমদ্ভাগবত। ১৩০৪। ১০ম স্কন্ধ। ১ম খণ্ড কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, সম্পা
৬৫২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ছিন্ন
৬৫৩। শ্রীমদ্ভাগবত। ১৩১০। ৪র্থ-১৬শ খণ্ড। কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, সম্পা
৬৫৪। শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১৩১৫ পঞ্চানন তর্করত্ন
৬৫৫। শ্রীমদ্ভাগবত। ১ম স্কন্ধ। ১২৯৪। সনাতন চক্রবর্তী ২ কপি
৬৫৬। প্রায়শ্চিত্ত। ১৩১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৫৭ খেয়া „ „
৬৫৮ তারারহস্যতন্ত্র। ১৩১৩। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
৬৫৯ গণদর্পণ। ১৭৮৯ শক। রামতারণ শিরোমণি
৬৬০ প্রাচীন কাব্য সংগ্রহঃ কবিকঙ্কণ। ১২৮৪ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সম্পা
৬৬১ কালিকা পুরাণম্। ১৩১৬। পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পা
৬৬২ রামায়ণ। ১৩০৭। বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পা
৬৬৩। দেশের ডাক। ৪র্থ সং। ১৯২৮ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী
৬৬৪। ভারতী। ১২৮৫, ১২৯৩

৬৬৫। বড় কাকা ৩য় নম্বর মহিন সম্পাদিত

৬৬৬। বীণা ও লতিকা। মনোমোহিনী দাসী, সম্পা

৬৬৭। মেয়ের প্রটেকসন লিগ্। ১ম নং। শকুন্তলা বসু সম্পা

৬৬৮। বীণা লতিকার গুপ্তলীলা। ১ম পর্ব। সুনলিনী গুপ্তা, সং

৬৬৯। রোহিনীকান্তের গুপ্তলীলা। ১ম পর্ব। সুনলিনী গুপ্তা· সং

৬৭০। রমেশদা ও রোহিনীদা। রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬৭১। বলাইচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ১৩৩২। নির্মলচন্দ্র সেন

আবদুল আজিজ আল্ আমান সি ২/২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

১। নজরুল-গীতি (অখণ্ড)-নজরুল

২। মক্কা-মদিনার পথে—আব্দুল আজিজ আল্ আমান

উদিতেন্দু প্রকাশ মল্লিক নিরালা, ৬৭ অশোক পার্ক, কলি-৪৭

১। চিত্তাঞ্জলি উদিতেন্দু প্রকাশ মল্লিক

উপরাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশের উপ-দূতাবাস, ৯ সার্কাস এভিন্যু, কলি-১৭

১। বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা (শহীদ দিবস স্মারক। ১৯৮২) ২ কপি

উপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি ১৩/৭৪ সোনারপুরা, বারাণসী—২২১০০১

১। গানে গানে ডাকি মাকে—উপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

উমেশ-সৌদামিনী সংগ্রহ, কলিকাতা

১। পরিচয় ; ৪৯ বর্ষ ১ম- ৭ম সংখ্যা ১৯৭৯-৮০

২। একদা গোপাল হালদার

উষা সেন

১। Indian Temple Designs

২। হিমালয় ১৯৮০ (কার্তিক সংখ্যা), ১৯৮১ (১ম সংখ্যা)

কণাদ জানা সোলপাট্টা, সুগো, মেদিনীপুর

১। জলের দু-পায়ে ঝরে কথা—হিমাংশু জানা

কল্যাণী প্রামাণিক এল. আই. জি. ফ্লাট-৪ ব্লক-বি কলিকাতা-৩৭

১। ভারতবর্ষ ১৩৫৯—১৩৬৪=৯ ভলিউম

২। বসুমতী ১৩৫৯—১৩৬৩=৭ ”

৩। উত্তরা ১৩৫৯—১৩৬১= ৩ ”

৪। জয়শ্রী ১৩৬০-৬১ ২ ভলিউম

৫। বঙ্গশ্রী ১৩৫৯-৬২ ২ ভলিউম

৬। প্রবর্তক ১৩৫৯-৬২, ১৩৬৩-৬৪ ৫ + ১ ”

৭। পরিচয় ১৩৬০-৬১ ৩ ”

৮। রামধনু ১৩৫৫-৬০,১৩৬ ৬ ”

৯। প্রবাসী, ১৩৬০-৬১ ৩ ”

১০। Prabuddha Bharat, 1954, 1957-58 ৩ ”

১১। উদ্বোধন, ১৩৬০-৬২ ৪ ”

১২। বিশ্ববাণী ১৩৫৯-৬১ ৩ ”

১৩। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৯৫৩-৫৪ ২ ”

১৪। সংগঠন, ১৩৫৭ ১
১৫। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৬ ১ ”
১৬। Teachers's Journal 1952 ১ ”
১৭। বাঙলার শিক্ষক, ১৩৬৯-৬৪ ১ ”
১৮। The world's great Events. Vol 1-10 ১০ ভলিউম
১৯। Report of the Univ. Education commission, 1948-49 Vol. 1
২০। The Hero of Hindustan By A Elengimitton ১ ”
২১। আত্মচরিত—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২ ”
২২। Basic Education,1950 Marjorie sykes
২৩। নূতন শিক্ষা—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
২৪। বিজ্ঞানের গল্প—জগদানন্দ রায়
২৫। What basic Education Means
২৬। Craft in Education H. R. Bhatia
২৭। The Handicrapped child A. R. Wadia, ed
২৮। Adventures in education K. L. Srimali
২৯। The eye and the sun S. Vavilov
৩০। পোকামাকড়—জগদানন্দ রায়
৩১। বাংলার পাখী ,,
৩২। মাছ ব্যাঙ সাপ ,,
৩৩। নবীন রবির আলো—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
৩৪। বৈষ্ণব গীতিকাব্য—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, সম্পা
৩৫। বসন্তের লিপি—রাধারাণী দেবী
৩৬। Popular handbook of Indian birds—Hugh Whistler
৩৭। Anatomy & physiology of a human being—A. N. Kabanov
৩৮। The origins of the national education movement
—Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee
৩৯। প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
৪০। নার্সারি স্কুলের শিক্ষা প্রণালী—যূথিকা চট্টোপাধ্যায়
৪১। সাথী—হুমায়ুন কবির
৪২। আলো—জগদানন্দ রায়
৪৩। উপেন্দ্রকিশোর—লীলা মজুমদার
৪৪। সমাজ জীবন—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৪৫। মহাত্মা গান্ধী—রোমা রোলাঁ
৪৬। শিক্ষণ বিচিত্রা—নিখিলরঞ্জন রায়
৪৭। অকাল বৃষ্টি—সমরেশ বসু
৪৮। প্রাথমিক শিক্ষা—রেণু মিত্র। ৩য় সং
৪৯। আবুল কালাম আজাদ—ঋষি দাস
৫০। বাংলা সাহিত্যের গল্প—নীলাপদ ভট্টাচার্য

৫১। বিপ্লবী—অপরাজিতা দেবী
৫২। বাড়িওয়ালী—ডস্টয়েভস্কি (হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত, অনু)
৫৩। নঈ তালিম—ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার
৫৪। শ্লোকশতক—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫। নেতাজীর জীবনী ও বাণী—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ
৫৬। বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৫৭। ভারতভ্রমণ—রামনাথ বিশ্বাস
৫৮। নানারকম—প্রমথনাথ বিশী
৫৯। ছোটদের বিবেকানন্দ—শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী
৬০। মন্দিরে মন্দিরে—ধীরেন্দ্রলাল ধর
৬১। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি (১ম) ও (২য়)—অনিলমোহন গুপ্ত
৬২। বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়
৬৩। অনুপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৬৪। গল্প সঞ্চয়ন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৬৫। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি—বিজয়কুমার ও সাধনা ২ কপি
৬৬। গল্প সঞ্চয়ন—সুমথনাথ ঘোষ
৬৭। নীল তীর ও রক্তাক্ত আকাশ—অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
৬৮। উর্বশী ও আর্টেমিস—বিষ্ণু দে
৬৯। ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
৭০। পূর্বাভাষ—সুকান্ত ভট্টাচার্য
৭১। A New Deal in Secondary Education—H. R. Bhatia
৭২। মেরুদণ্ড—বুদ্ধদেব বসু
৭৩। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা—সুধীরচন্দ্র কর
৭৪। রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৭৫। ঢেউ—ধীরেন্দ্রলাল ধর
৭৬। যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল—বিমল
৭৭। রমেশ রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পা
৭৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী
৭৯। শিক্ষা—রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত
৮০। ইস্পাতের স্বাক্ষর—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৮১। প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ
৮২। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের গল্প—স্বামী পরমানন্দ
৮৩। জীবন খাতার কয়েক পাতাঃ ১ম—সুনির্মল বসু
৮৪। স্বদেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮৫। বিশ্বমানবের কাহিনী—হরিপদ ঘোষাল
৮৬। আমার দেশের মানুষ—ধীরেন্দ্রলাল ধর
৮৭। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ। ঋষি দাস, অনু. ২ কপি
৮৮। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রী সারদামণি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৮৯। শতাব্দীঃ শিশু সাহিত্য - খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৯০। বারোমাসের ছড়া—বুদ্ধদেব বসু
৯১। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার—জগদানন্দ রায়
৯২। কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ —নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৯৩। গান্ধী কথা—
৯৪। বিজ্ঞান ভারতী—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৯৫। প্রাকৃতিকী—জগদানন্দ রায়
৯৬। শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ
৯৭। প্রকৃতি-পরিচয় —জগদানন্দ রায়
৯৮। শ্রী মা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ
৯৯। শব্দ —জগদানন্দ রায়
১০০। প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা
১০১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সং)—শিবনাথ শাস্ত্রী
১০২। স্বপ্নসাধ—হুমায়ুন কবীর
১০৩। ত্রিপুরার ইতিকথা—কৃষ্ণপদ দত্ত
১০৪। ছোটদের গিরিশচন্দ্র—ঋষি দাস
১০৫। বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প—গোপালচন্দ্র রায়
১০৬। মনীষী জীবন কথা-১ম ও ২য় খণ্ড—সুশীল রায়
১০৭। টাকা গাছ—লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী
১০৮। ভক্ত কবীর—উপেন্দ্রকুমার দাস
১০৯। অপরাজিতা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১০। গাছপালা – জগদানন্দ রায়
১১১। চুম্বক ,, ,,
১১২। স্থির-বিদ্যুৎ ,, ,,
১১৩। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বাংলা ব্যকরণঃ ১ম ভাগ—সুশীলকুমার ধাড়া
১১৪। বিশুদ্ধ চাণক্য শ্লোক—রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৫। ছন্দের গোপন কথা—সুনির্মল বসু
১১৬। আমার ছড়া—সুনির্মল বসু
১১৭। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—ঋষি দাস; অনু.
১১৮। The poet of Hindustan - Anthony Elengimittan
১১৯। West Bengal five year plan—A summary
১২০। কালিদাসের মেঘদূত—রাজশেখর বসু
১২১। শিক্ষা—গান্ধী —শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২২। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা—তারকনাথ ঘোষ
১২৩। সর্বাঙ্গীন শিক্ষা—সুধীরচন্দ্র কর
১২৪। মানসী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৫। প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ—অনাথনাথ বসু
১২৬। প্রাথমিক শিক্ষাদান পদ্ধতি—প্রিয়নাথ গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র দাস মজুমদার

১২৭। লাইব্রেরী সংরক্ষণ—মীনেন্দ্রনাথ বসু, কান্তিভূষণ পাকড়াশী
১২৮। রামায়ণের গল্প—ঋষি দাস
১২৯। বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন—অনিলমোহন গুপ্ত ২ কপি
১৩০। রঘুবংশের গল্প—কৃষ্ণধন দে
১৩১। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা—সুধীর চন্দ্র কর
১৩২। **Never too late—Nikhil Ranjan Roy**
১৩৩। অরণ্য মরাল - গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
১৩৪। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—মনোরঞ্জন গুপ্ত
১৩৫। নয়া শিক্ষা—ফণিভূষণ বিশ্বাস
১৩৬। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য
১৩৭। **Webster's New Internatio al Dictionary Vol I & II**
১৩৮। ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত—নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

কুমারেশ ঘোষ ২৮/৩ আর রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৫৪
১। যষ্টিমধু—১৩৮৭
২। চারণকবি মুকুন্দ দাস—কুমারেশ ঘোষ
৩। ফলন্ত ফুটপাত—কুমারেশ ঘোষ

গীতা গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা
১। এক ঝাঁক পায়রা —গীতা গঙ্গোপাধ্যায়

গোপেন্দ্রকুমার বাগচী ১৩/১ রামচরণ শেঠ রোড, হাওড়া—৪
1. **Bulletin of the Ramkrishna Mission Institute of Culture, 197 -78**

গোবিন্দ ভট্টাচার্য সি. ৪/৫ সল্ট লেক, কলিকাতা-৬৪
১। কোথাও ধূপ জ্বলছে - গোবিন্দ ভট্টাচার্য

গোলোকেন্দু ঘোষ সুমিতা প্রকাশনী, কলি-৭
১। চতুর্দোলা ঃ ধ্রুপদী রুশ ছোটগল্প সংকলন —ভাষান্তর গোলোকেন্দু ঘোষ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ ব্লক-সি, ফ্লাট ৩ ৪৯, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলি-১১
১। প্রথম লেখা/১ম খণ্ড/গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, সম্পা

চক্রবর্তী বরদারঞ্জন ৫৮ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
১। তুলসী তত্ত্বায়ণ—মাধব চৈতন্য দাসজী মহারাজ-২ কপি

জি. এ. ই পাবলিশার্স ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬
১। উনিশের শতকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক—সুনীতিরায়চৌধুরী

জিজ্ঞাসা ১, কলেজ রো, কলি-৯
১। **A biographical sketch of David Hare—Pearychand Mitra**

জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল ৪৮, কে, কে, মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৫
১। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার—জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল
২। আধুনিক কবিতা—জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল
৩। রূপ ও রূপান্তরঃ একাঙ্ক সঙ্কলন—জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল
৪। আকাশের মৃত্যু নেই—শিশির কুমার সিংহ এবং জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল।

তপন দেবনাথ, সম্পা ৪৮, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪

১। ছন্দোবতী শারদ স্মরণিকা, ১৩৮৮

তপোবিজয় ঘোষ ৩১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১। কালচেতনার গল্প তপোবিজয় ঘোষ

২। নির্বাচিত গল্প — „

দিলীপকুমার দাস ৩৫, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-৫৪
(রাধারাণী দাস স্মৃতিসংগ্রহ)

১। Social Ideas & social change in Bengal. (1881-1835)—A.F Salahuddin Ahmed

২। সুধা সাগরতীরে—সুরেশ চক্রবর্তী

৩। অবনীন্দ্র শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ—সুধা বসু

৪। রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ—সুধা বসু

৫। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ — „

৬। স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ—নিত্যপ্রিয় ঘোষ

৭। শরৎচন্দ্র—ভবানী মুখোপাধ্যায়

৮। আমার কালের কবি ও কবিতা—মনীন্দ্র রায়

৯। আমাদের পদবীর ইতিহাস—লোকেশ্বর বসু

১০। The Good old days of Honourable John compan W. H. carey

১১। বাংলা স্থান নাম—সুকুমার সেন

১২। Henry Derozio—Thomas Edwards

১৩। Reminiscences & anecdotes of great men of India—ed by Ramgopal sanyal.

১৪। পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা—চিত্রা দেব

১৫। বাৎস্যায়নের কামসূত্র—ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত

১৬। মহাস্থবির জাতক ১ম-৪র্থ পর্ব (নবপত্র সং) — প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

১৭। নানারঙে বোনা—প্রেমেন্দ্র মিত্র (জীবনকথা)

১৮। হিকি সাহেবের কোলকাতা —বরুণ সেন।

১৯। আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস

২০। Calcutta Old & New—H. E. A Cotton

২১। Calcutta : Past & Present-Cathleen Blechynden

২২। ভারতকথার গ্রন্থিমোচন—সুকুমার সেন

২৩। মুক্তির অধিকারে—মৈত্রেয়ী বসু

২৪। কালে কালে কলকাতা —কাজল মিত্র

২৫। মানব সভ্যতায় কুমারী বলি – দীনেন্দ্রকুমার সরকার

২৬। Positivism in Bengal—G. H. Forbes.

দিলীপকুমার বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৬

১। ব্রাহ্মধর্ম পরিচয় প্রবাল বসু

২। ক্ষণিকা—শিবপ্রসাদ মুস্তফী

দীপালী রায় চৌধুরী ১৭ এফ, সুইনো স্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলি-১৯

১। শতবর্ষ পূর্বের বাঙলা ও বাঙালী—সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৯ বি চন্ডীবাড়ী স্ট্রীট, কলি-৬

১। রঘুবংশম—　(পুরাতন পুস্তক)

২। উদ্ভট চন্দ্রিকা　,,

৩। বিক্রমোর্বশী　,,

৪। মালবিকাগ্নিমিত্র　,,

৫। শৃঙ্গার তিলকম্　,,

৬। শ্রুত-বোধঃ　,,

৭। পুষ্পবাণ বিলাস কাব্যম্　,,

৮। শ্রীশ্রী রাসপঞ্চাধ্যায়　,,

৯। শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্　,,

১০। শ্রীশ্রী পত্রাবলী　,,

১১　অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

১২　সাংখ্যদর্শন

১৩　দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা　,,

১৪　রামায়ণম, ৪র্থ সং। ১৩১৫

১৫　কুমারসম্ভব—আশারাণী বসু

১৬　পঞ্জিকা (গুপ্তপ্রেস)—১৩৭৬-৮১, ১৩৮৩

দেবকুমার বসু ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

১। উৎসব—দেবকুমার বসু ও সলিল লাহিড়ী, সম্পাদিত

২। সত্তার রূপ করপুটে—বগলাচরণ গুহ

৩। বীজ—রাম বসু

৪। তৃষ্ণা, আমার তরী—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। পরিকল্পনা প্রসঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

দেবদাস ভট্টাচার্য ৫/১ ডি, টি, এন চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৯০

১। একটি লোক আর তার খেলনা—দেবদাস ভট্টাচার্য

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১ এ, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

১। যুকিগুণি—য়াসুনারী কাওয়াবাতা

দেবী রায় ৫৬, জে, বি, আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়া

১। দেবী রায়ের কথা

২। জন্মভিটার উপর দিয়ে ফিরছি—শ্রীকান্ত পাল

ধীরা ভট্টাচার্য, ৩সি. মাধব দাস লেন কলিকাতা-৬

১। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ—আব্দুল হাফিজ ২ কপি

ধীরাজকৃষ্ণ বসু, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১। আমার দেখা কোলকাতা

২। পিছন পানে চাই

৩। সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ১ম পর্ব

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর প্রসঙ্গ

৫। Memorable wit wisdom & Humour

ধীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার ৮৯ অশোক রোড, গাঙ্গুলীবাগান, কলিকাতা-৮৪

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সর্বধর্ম-সমন্বয় —ধীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার ২ কপি

শ্রীশ্রী নগেন্দ্র মঠ ২বি, রামমোহন রায় রোড, কলি-৯

১। শ্রীগুরুচরণতলে—ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী

২। সহজ কথায় মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ—স্বপন বুড়ো

৩। শ্রীশ্রী শঙ্করতীর্থ উপদেশামৃত—শ্রীশ্রী শঙ্করতীর্থ

৪। সাধন—সহায়

৫। সাধন-সহায়—পরিশিষ্ট

৬। তত্ত্বনিরূপণ—

৭। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত

৮। চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ

৯। দীক্ষাদানের অধিকারী

১০। কলিযুগে পশুবলি নিষিদ্ধ

ননীগোপাল সেনগুপ্ত ১৮।২, সেলিমপুর লেন, ঢাকুরিয়া, কলি-৩১

১। তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিকা—সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

২। সত্য-ধর্মঃ গুরু শিষ্য —শ্রীমতী মঙ্গলা দেবী

নরেশচন্দ্র জানা ৪০/১ টেংরা রোড, কলিকাতা-১৫

১। মনোরমার জীবনচরিত। ২য় খণ্ড —মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

২। প্রচারকগণের সভায় মন্ত্রীদরবারের নির্দ্ধারণ (১৮৭২-৮৩) ২য় সং নববিধান শতবার্ষিকী

৩। মুখ—হীরক রায়

৪। মধ্যরাত্রে শেষ নৌকা—কমলেন্দু দীক্ষিত

৫। হৃদয়ে চকিতে কে সে—হরপ্রসাদ মিত্র

৬। অমিল পয়ার—বীরেন্দ্র দত্ত

৭। সখের প্রকাশ—প্রকাশচন্দ্র রায়

৮। সহজ কঠিন—বীরেন্দ্র দত্ত

নিতাইচন্দ্র মণ্ডল ১২৪জি জেনিন্স রোড, লিলুয়া, হাওড়া

১। স্বপ্ন-দর্শন—নিতাইচন্দ্র মণ্ডল

নিমাইকুমার ঘোষ ৩৪।১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

১। সেণ্টারিজমে ধর্ম বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র—নিমাইকুমার ঘোষ

২। আন্দোলনে জয়প্রকাশ সেণ্টারিজমের ইতিহাস—নিমাইকুমার ঘোষ

৩। কেন্দ্রায়নে সমগ্র বিজ্ঞান—নিমাইকুমার ঘোষ

নিরঞ্জনমোহন বর্দ্ধন ৫৯, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৬৮

১। পর্যটন—নিরঞ্জনমোহন বর্দ্ধন

২। শতাব্দীর কথা ,, ,,

নির্মলকুমার খাঁ কদমতলা, হাওড়া-১

১। অপাপবিদ্ধ চন্দ্রমা—নির্মল কুমার খাঁ

নীরেন্দু হাজরা ১৭।১২।২ শশীভূষণ সরকার লেন, সালকিয়া, হাওড়া

১। মাটিতে পা রেখে সূর্যের হাত ধরে—নীরেন্দু হাজরা

২। নদীর চিতায় জ্বলছে— ,,

নেপালচন্দ্র ঘোষ সাহিত্যলোক, কলিকাতা-৬

১। অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি—অরুণকুমার মিত্র সম্পা

পঞ্চতন্ত্র (প্রকাশক) ৫২।৯।সি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলি-১২

১। রবীন্দ্র সঙ্গ—ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

২। ঈশ্বরের পুতুল— বীরেন্দ্র দত্ত

৩। হিসেব নিকেশ — ,,

৪। পাহাড়ে সমুদ্রে— ,,

৫। পুরনো পট ধূসর ছায়া ,,

৬। জলবিন্দু— ,,

৭। খেলার ছলে— ,,

পারুল ঘোষাল ডি. ভি. সি. কলোনী, হাজারীবাগ, বিহার

১। অন্তঃপ্রবাহ—পারুল ঘোষাল

পাঁচুগোপাল হাজরা ১৬।১, অমূল্যচরণ পাল স্ট্রীট, কলি-৫৭

১। অকিঞ্চন—পাঁচুগোপাল হাজরা ২ কপি

পুষ্প পাঠক ১৭২, দেবীনিবাস রোড, কলি-২৮

১। আয়নায় ভাঙ্গা কাঁচ —পুষ্প পাঠক ২ কপি

প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী ৪৬।৫।ডি বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

১। U. S. S. R 19৭3—Maurice Dobb

২। Russia 194।—Pat Sloan

৩। The constitution of the people's Republic of China, 1978

৪। Constitution of U. S. S. R

৫। A Biography, 1973—Karl Marx

প্রতুল কুমার পণ্ডিত, কলিকাতা

১। সপ্তপর্ণীঃ সহজ পাঠ বিশেষ সংখ্যা—অতনু শাশমল, সম্পা

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু, পি ৪৭, এল. আই. সি টাউনশিপ, পোঃ মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

১। ওমর খৈয়াম ও তাঁর রুবাইয়াৎ—প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

বগলাকুমার মজুমদার, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ, ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

১। আয়ুর্বেদ ভারতী—১৩৮৩, ১৩৮৪-৮৬

বন্দিরাম চক্রবর্ত্তী ৪০/১ট্যাংরা রোড, ব্লক-ভি, ফ্ল্যাট-১২, কলিকাতা-১৫

১। ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র রায়—বন্দিরাম চক্রবর্ত্তী

বিনয়ভূষণ ঘোষ, ৬।১।৪পি, ডবলিউ. ডি. রোড. কলি-৩৫

১। দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙ্গালী—বিনয়ভূষণ ঘোষ ২ কপি

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। রাজোয়ারা—দেবেশ দাশ

২। চাইনিজ রান্না ও দেশবিদেশের জলখাবার—ছবি মুখোপাধ্যায়

৩। তিমি তিমিঙ্গিল—নারায়ণ সান্যাল

৪। ওকা উঁর কথা—মৃণাল সেন/মোহিত চট্টোপাধ্যায়

৫। কান্না—ময়ূখ চৌধুরী

৬। টেস্ট লাইফ ইন টাইগারল্যাণ্ড—জেমস ইংলিশ ভাষান্তর—ময়ূখ চৌধুরী

৭। শ্রেষ্ঠ গল্প—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। তিন কাহিনী—মনোজ বসু

৯। পদ্মানদীর মাঝি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। পঞ্চ পরমেশ্বর—প্রেমচন্দ্র, অনুবাদক সুবিমল বসাক

বেলা দেবী, ২৯ সি, যোগীপাড়া লেন, কলিকাতা-৬

১। জীবনের কত রঙ—বেলা দেবী

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ/সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা-৭৩

১। Indian Journal of linguistics Jan-July 1977, Jan-Dec 1978, Jan- ,, 1979, Jan- ,, 1980

২। Indian Journal of linguistics. Vol. I, No 1 1974 2 copies, Vol II No 1 1975 ,, ,, Vol III. Nos1-2 1976 ,, ,,

ভুবন দাস গ্রাম—ইছাপুর—ভদ্রডাঙ্গা, পোঃ ইছাপুর (গোবরডাঙ্গা) জেলা-২৪পরগণা

১। নববর্ণা—ভুবন দাস

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ৯৮/২এ, তালতলা লেন, কলিকাতা-১৪

১। জ্ঞানমঞ্জি—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, জি. এন. চ্যাটার্জি লেন, পানিহাটী, ২৪ পরগণা

১। আনন্দরাশি—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় বসু, ৫।৪।ডি, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০

১। বাঙ্গলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা—মলয় বসু

মায়া ভক্ত, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১। বক্তা রবীন্দ্রনাথ—তারণীশঙ্কর চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। বালির নীচে ঢেউ—আশাপূর্ণা দেবী

২। আদি আছে অন্ত নেই—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

৩। দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

৪। পুরনো মদ নতুন নেশা—সমেথনাথ ঘোষ

৫। ভাগীরথী বহে চলে—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৬। স্বর্গাদপি গরীয়সী—বিভূতি ভুষণ মুখোপাধ্যায়

মুকুল রায়চৌধুরী, ৮৬/এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪

১। শারদীয়া লোকসেবক, ১৩৮৮

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১০, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা-১, বাংলাদেশ

১। Traditional Culture in East Pakistan—Dr Muhmmad Shahi-

dullah

২। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত— Dr. Muhammad Shahidullah
৩। বিদ্যাপতি শতক— " "
৪। ইসলামের ঐতিহ্য ও খাজা—মঈনুদ্দিন বিশাতি (র) " "
৫। পদ্মাবতী— " "
৬। Buddhist mystic songs— " "
৭। বাংলা সাহিত্যের কথা—ঐ (১) এবং (২) " "

মোহাম্মদ আবু জাফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-বাংলাদেশ।
১। বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই—আবু জাফর
২। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই (১ম ও ২য় অংশ)-
২খণ্ড—মোহম্মদ আবু জাফর

মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, গ্রাঃ + ডাঃ মালঞ্চ, ২৪ পরগণা
১। নিষ্কাম—মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ২ কপি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, কলি-৩২
১। বাংলা লিটল ম্যাগাজিন (১৯৫০-১৯৮১) ২ কপি

যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি ২বি, রামমোহন রায় রোড, কলি-৯
১। মহর্ষি নগেন্দ্র স্মারক গ্রন্থ। ১৩৮৮

যুব প্রকাশনী. ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
১। প্রেমচন্দ—সোজে ওঅতন

রমেন্দ্র বর্মণ, বর্মণটীলা, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা
১। মহাবিদ্রোহ বিদ্রোহ ও বাংলা উপন্যাস—রমেন্দ্র বর্মণ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬৭ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১। স্বদেশ সাহিত্য ও মননশীলতা— রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত
২। সাহিত্যতীর্থ : বনফুল ১৩৮৬— " " "
৩। সাহিত্যতীর্থ : রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৩৮৫— " "
৪। " সপ্তবিংশবার্ষিকী, ১৩৮২— " " "
৫। শুধুই চঞ্চল—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

শ্রীরমেশ ঘোষাল, ৩৩এ রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৯
১। David Hare—Radharaman Mitra
২। চিত্রদর্শন—কানাই সামন্ত
৩। দেহ প্রাণ মন—অসিত সেন

শ্রীমতি লিলি বিশ্বাস, গৈরিক, ১০ কো-অপারেটিভ রোড, বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগণা
১। উদ্বেগ উপকূলে [১৯৪০-১৯৮০] —অনিল বিশ্বাস ২কপি

শংকর মিত্র, নিউ মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া
১। কিশোরদের কাগজ শংকর মিত্র, সম্পাদক

কুমার শঙ্কর সেনগুপ্ত
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—সুনীলচন্দ্র দত্ত

শিশির কুমার মাইতি, ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪

১। আশাবরী : ত্রৈমাসিক পত্রিকা জ্লাই ১৯৭৭-অক্টোবর ১৯৮১
২। চরৈবেতি ১৯৬৬—জানুয়ারী ১৯৬৮
৩। আশাবরী এপ্রিল ১৯৬৮—এপ্রিল ১৯৭৭

শ্রীকুমার রায়, পি. এফ. ১১৮ সল্ট লেক, কলিকাতা-৬৪
১। পেশাগত ব্যাধি-১৯৮২—শ্রীকুমার রায়

শ্রীশকুমার কুণ্ডু, জিজ্ঞাসা, ১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১। শ্রীমদ্ভাগবত - গণেদাচরণ সেন
২। বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রসার - নমিতা চক্রবর্তী
৩। শিক্ষার রূপরেখা—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য
৪। চারশ বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শন—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫। আকাশের কথা - শঙ্কর চক্রবর্তী
৬। টপ্পা সংগ্রহ—শিখা রায়চৌধুরী
৭। কবি অমিয় চক্রবর্তী—সুমিতা চক্রবর্তী

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১২৮/২৩, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬
১। উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র—ঝরা বসু
২। প্রচারকগণের সভার বা শ্রীদরবারের নির্ধারণ - সভাপতি আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

সন্তোষ কুমার দে, ১৪৬ কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা-২৮
১। রবিবাসর - ১ম—১৩শ খণ্ড।

সম্পর্ক প্রকাশন, ৮ বি, বসেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লেন, কলি-৭০০০১৪
১। সাপ নিয়ে কিংবদন্তী—অবনীভূষণ ঘোষ, ও অন্যান্য

সম্পাদক, যোগ সমীক্ষা, ১৪৪ এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
১। যোগ-সমীক্ষা—৪র্থ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা

সরোজমোহন মিত্র ২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-৫৪
১। শরৎ সাহিত্যে সমাজচেতনা - ডঃ সরোজমোহন মিত্র

সুকুমার মিত্র (উমেশ সৌদামিনী) কলিকাতা
১। মার্কিন যুক্তরাজ্য—সুকুমার মিত্র

সুনীল দাস, ৪৫/৫ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১। প্রথম বাংলা কিশোরউপন্যাস ভীমের কপাল—প্রমদাচরণ সেন, সুনীল দাস, স
২। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন পরিচয়ঃ ১৩২৮-১৩৮৭ ১৯২২-১৯৮০

সুবন্ধু ভট্টাচার্য, ১/৯ বি, রাজাবাগান লেন, কলিকাতা-৩০
রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন—সুবন্ধু ভট্টাচার্য

সুমন প্রকাশনী, ৩ কান্তমোহন মল্লিক রোড, কলিকাতা ৫৬
১। নগর কাব্য—গগন ফকির

শ্রীমতী স্বর্ণলতা সিংহ, ৯৩, আব্দুস সাত্তার রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
১। ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ—যোগেশচন্দ্র সিংহ
২। গীতা বোধিনী ২য়, ৪র্থ খণ্ড
৩। রাসলীলা

৪। দুর্গাপূজার নবপত্রিকাতত্ত্ব, যোগেশচন্দ্র সিংহ
৫। মাতৃবন্দনা " "
৬। মাতৃপ্রশস্তি " "
৮। ধর্মকথা " "
৯। পিতৃ-তর্পণ " "
১০। পিতৃ-পূজা " "
১০। সীতাকালী " "
১১। সরস্বতীতত্ত্ব " "
১২। পরমহংস অদ্বৈতানন্দ " "
১৩। নলয়ার কালী—খগেন্দ্রলাল সিংহ
১৩। শ্রী চন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য ও মেধসাশ্রম—দেবেন্দ্রবিজয় বসু

হরিসাধন ভট্টাচার্য, ৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা ৩৫
১। পথের আলো, ১৩৮৭—রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী সং

হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
১। আত্মকথা—নরেশচন্দ্র জানা, সং

হৃষীকেশ ঘোষ, ৩৯এ, ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া-২
১। শিক্ষা, সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতা হৃষীকেশ ঘোষ

A. R. Biswas, 10, Cooperative Road, P.o Bansdroni, 4Pgs.
1. A spiritual calculus—A. R. Biswas, 2 copies.

Biren Ray, Roy Mansions, Behala, cal-34
১। German-English-Hindi Dictionary—Biren Roy, ed

British Council Library, Calcutta
১। Anglo-American Cataloguing Rules, British text, 1967.

The Estates & Trust officer, Cal. University Calcutta-12,
১। Life & Philosophy of Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj
২। Arnold on Shakespeare—Srichandra Sen 2 copies.

Kanai Chandra Pal, 60/13A, Gauribari Lane, Calcutta-4.
১। Gems from the State Archives.

K. N. Mukharjee, 19A, Nepal Bhattacharjee 1st lane, Calcutta-26
১। Diagnostic survey of Rarh Bengal Pts. 1 & 2—K. N. Mukhopadhyay

Librarian, National Library, Cal-27.
1. Village India, 1963—Mckim Marriott, ed
2. Rural profiles, 1955—D. N. Majumdar, ed
3. Traditional cultures, 1965—G. M. Foster
4. Metropolis, 1965—J. C. Bollens & H. J. Schmaudt
5. The Ulster of India, 1936—Dunichand (of Ambala)
6. Letters to the people of India on responsible Govt, 1917—

Lionel Curtis

7. Differential fertility in Central India, 1963—E. D. Driver
8. An Englishman defends mother India, 1929—Ernest Wood
9. Uncle Sham. 1929—Kanhayalal gauba
10. Internationalism and Nationalism—Liu Shao Chi
11. Indian Politics, 1924—G. T. Gwynn
12. India, the most dangerous decades, 1960—S. S. Harrion
13. Towards struggle, 1945—Jayaprakas Narayan
14. Notes and extracts, 1891-1912—Devaprasad Sarvadhikari
15. Communism in India, 1960—G. D. overstreet & M. Windmiller
16. India : old and new, 1921—Sir Valentine Chiral
17. Mahatma Gandhi, 1948—E. Stanley Jones
18. Early history & growth of Calcutta, 1905—Binoy Kr. Deb.
19. Jawaharlal Nehru in the Soviet Union, 1955
20. The Charm of Kashmir, 1920—V. C. Scott o'connor
21. The slang dictionary, 1925
22. A Grammar of the Latin language—Henry John Roby
23. A writer's journal, 1961—H. D. Thoreau
24. Programme budgeting,1965—David Novick, ed
25. Technical progress in U. S.S. R 1959-1965—Y. Maksaryov
26. Socialist way of development in agriculture, 1966—V. Storzhev & Y. Rudakov
27. Socialist naturalisation of industry, 1966—V. Vinogradov
28. A short biography of S. N. Banerjee
29. Phonetics—Kenneth L. Pike
30. The Voice of Asia—James A. Michener.
31. Two lectures on linguistics, 1959—S. M. Katre
32. The loom of language, 1945—Frederick Bodmer
33. Treatise on economics—N. G. Pearson
34. A course in modern linguistics 1958—C. F. Hockett
35. The Testament of beauty, 1930—Robert Bribges
36. The old man & the sea, 1955—E. Hemingway
37. Tortilla fiat, 1935—J. steinbeck
38. The yearling, 1947—M. K. Rawlings
39. Essays in national idealism, 1909—A. K. Coomaraswami
40. Notes on the Bengal renaissance, 1957—Amit Sen.
41. History of Hindu civilisation during British rule Vol 1, 2,3

1894-96—Pramatha Nath Bose

42. For whom the bell tolls, 1954—E. Hemingway
43. History of the Indian nationlist movement, 1920—Sir V. Lovett.
44. Qiet crisis in India, 1962—J. P. Lewis
45. Planning a new India—M. N. Roy
46. Constitutional proposals of the sapru committee, 1945
47. Sino-Soviet dispute, 1961—G. F. Hudson & others
48. Grammar of the Latin language, 1874—H. J. Roby
49. Power & fuel, report, 1947—National Planning Committee
50. New India, 1956—India Planning Comm.
51. Transport Services, 1949—India Planning Comm.
52. National Planning, Principles & administration, 1948—K. T Shah
53. A century of conflict, 1953—S. T. Possony.
54. Policy towards nationalities of the people's Republic of China, 1953
55. Rules of the Communist Party of the Soviet Union, 1962.
56. Road to communism, 1961
57. Presidential address, Indian National Congress, 1955—U. N. Dhebar
58. Programme of the Communist Party of the Soviet Union
59. 23rd Congress of the C. P. S. U
60. Concise History of the Communist Party of the Soviet Union, 1960—J. S. Reshetar
61. Economic history of India 4th ed, 1906—R. C. Dutt.
62. Economic development of U. S. S. R 1959-65—N. S. Krushchov
63. Sonnets—Milton.
64. Shelly and his personality pt. 1&2 1963—Bhupendra Nath Roy
65. Development of self Govt. in Yogoslavia, 1961—Pavle Kovac
66. The State—V. I Lenin.
67. The April Thesis—V. I. Lenin
68. Study in the economic condition of ancient India, 1929—Pran Nath
69. The constitution of the Communist Party of China, 1956

70. Problems of building Socialism and Communism in the U. S. S. R—V. I. Lenin
71. From wooden plough to atomic power 1966—A. Khavin
72. A manual for writers, 1955—K. L. Turabian
73. Evolution of Indian industries 1939
74. Literary and historical atlas of Asia J. G. Bartholomew
75. The foundations of Indian Culture, 1959—Sri Aurabindo
76. European lecture tour, 1961—Swami Raganathananda
77. India
78. Handbook for travellers in India, Burma & Ceylon, 12thed 1926—Pierre Loti
79. Beyond the high Himalayan, 1952—W. O, Danglas
80. Tours in Sikim ; 1917
81. Kailas—Manassorovar, Swami Ranganathananda
82. Japan aud South-East Asia lecture tour, 1962—Do.
83. Lectures of the principles of political obligation, 1924—T. H. Green
84. Travels in India, VI, 1 & 2 1925—V. Ball
85. Kashmir, 1924—F. Younghusband
86. Travels in Ladak, Yratary and Kashmir, 1868
87. The human cycle, 1962—Sri Aurobindo
88. Portuguese discoveries dependencies 1893—Rev. Alexj. D. D'orsey
89. Progress of the Colombo Plan, 1960, 61
90. Capital and labour in the tea industry, 1954—Sanat Kr. Bose
91. History of economics, 1944—W. stark
92. Banking terms, 1931—Herbert Scott
93. On the unity of the International Communist Movement 1966—V. I. Lenin
94. Question of national policy, 1970—V. I. Lenin
95. Selected Works, Vol 2, pt. 2—V. I. Lenin
96. Polish scholars, 1959—M. Dobrowlski
97. Hand book of Colloquial Tebetan, 1894—G. Sandberg
98. Industrial Finance, 1948—National Planing Committee
99. A guide to communist jargon, 1957—R. N. Carew Hunt
100. Bengal in the sixteenth century, A D, 1914—J. N. Das-gupta
101. Shivaji and his times, 2nd ed 1920—Jadunath Sirkar

102. Mughal administration, 1924— " "
103. Indian speeches and documents on British rule, 1821-1918 1937—J. K. Majumder
104. For Socialist economic construction in our country, 1958 —Kim Il sung
105. Dragon harvest, 1945— Upton Sinclair
106. Presidential agent, 1945— " "
107. Wide in the gate, 1944— " "
108. The I. C. S, 1937—Sir Edward Blual
109. Some aspects of public administrotion in Bengal, 1945— Naresh Chandra Roy
110. Oil 1936—Upton Sinclair
111. The unfinished business of Civil Service reform, 1952— W. S. carpenter
112. Milton, 1914
113. Poetical works of Mrs. Browning ,Vol, I—S. A. Brooke
114. Poetical works of Robert Burns, 1898
115. History of Chemistry in ancient & mediaval India, 1956 —P, C. Roy
116. Nuclear explosions, 1959—A. M. Kuzin
117. Source book of an atomic energy— S. Glasstone
118. Indian cotton textile industry, 1958—S. D. Mehta
119. Structure of Cotton-Mill industry of India, 1949—M. M. Mehta
120. Urban Prospect, 196?—Lewis Mumford
121. India, 1889—H. B. W. Garrick
122. Tactics and strategy of revolution 1948—Saumyendranath Tagore
123. Pilgrimage of Fa Hian, 1848
124. Centenary book of Tagore, 19?1—Sookamal Ghosh, ed
125. Rabindranath Tagore, 193?—V. Lesny
126. A wandering in the Far East, Vol. I, 190?—Ranaldshay
127. Rabindranath Tagore in Germany, 1961—D. Rothermund
128. The first Indian war of Independence, 1857-59—Marx & Engels
129. Strangers in India, 1943—P. Menon
130. Gandhiism for millions, 1949—V. G. Krishnamurti
131. The last peshwa, 1818-51,1944—Pratul ch. Gupta

132. The national problem in India today, 1966—A. M. Dyakov
133. Why Pakistan ? And why not ? 1944—K. T. Shah
134. Revolution and Quit India 1946—Saumyendranath Tagore
135. Bengal under communal award and Poona Pact, 1933—N. N. Sirkar
136. Works of Lord Byron, 1837
137. Complete poetical works of Oliver Goldsmith, 1906—Austin Dobson, ed
138. On Marxism, 1969—V. I. Lenin
139. Judicial dictionary Vol. 1, 2, 3, 1903—F. strond
140. Population growth, 1958—A. J. Coale
141. Indian mining, 1943—J. A. Dunn
142. Sanskrit phonetics 1898—C. C. Uhlenbeck
143. Sanskrit Vocabulary, 1847—E. A. Prinsep
144. Snow balls of Garhwal, 1946—D. N. Majumdar
145. Joint Institute for nuclear Research—V. A. Biryukor
146. New class, 1957—Milovan Djilas
147. The development of Polish science, 1956—Bogdan suchodolski
148. Positive sciences of the ancient Hindus, 1958—Brajendranath Seal
149. Grammatical method in Panini, 1961—Betty shefts
150. Beginning chinese, 1963—John Defrancis
151. Smaller Latin-English Dictionary
152. Planning power and welfare, 1959—Daya Krishna
153. Socialism to sarvodaya, 1956—Joyprakash Narayan
154. Studies in the early political system of the East India Company in Bengal, 1939—D. N. Banerjee
155. Speeches of SurendraNath Banerjee, 1905
156. Studies in Indian Social Policy, 1944 Bhupendra Nath Dutta
157. Unhappy India, 1928—Lajpat Rai
158. Early administrative system of the East India Company, Vl. 1765—1774, 1943—D. N. Banerjee
159. Indian Cotton—Indian Central Comm.
160. Depreciation allowances—Employer's Association
161. Bengal Famine (1943), 1949—Tarak Ch Das

162. A hundred years of Indian Cotton, 1947-East India Cotton Assn.
163. Economic Consequences of divided India, 1950—C. N. Vakil
164. Administrative & Economic development in India, 1963—R. Bribanti
165. Rural marketing & Finance, 1947—National Planning Commission
166. Engeneering Industries, 1943 „ „
167. Linear programming, 1958—R. O. Ferguson
168. Land reform in China, 1953—B. N. Ganguly
169. Rural & Cottage industries—National Planning Comm.
170. Indian Nationalism 1914—Edwyn Bevan
171. Danger in India, 1932—G. Tyson
172. Amritsar Congress of the Communist Party, 1958—Ajoy Ghosh
173. Indian National Congress Report 1953-54
174. Handbook of Indian legislatures 1937—R. R. Saksena
175. Economic life of a Bengal Dist—J. C. Jack
176. Economic annals of Bengal, 1927—J. C. Sinha
177. Indian national demand, 1928—Nehru Reports
178. Consider Japan ,1963
179. Autocrat of the breakfast, 1798—O. W. Holmes
180. Romantic movement in English literature, 1920
181. Inter-racial problems, 1911—G. Spiller
182. Outline of coloquial Kannada, 1958—W. Bright
183. History of Tamil Language, 1965—T. P. Meenakshi Sundaran
184. Kharia Phonology, 1965—H. S. Biligiri
185. Introduction to Nepali 1963—T. W. Clark
186. Kashi, a language of Assam 1961—Lili Rabel
187. Garo Grammar, 1961—R. Burling
188. Introduction to Bengali pt I 1964—E.C. Dimock

N. C. Sen Majumder 18/2, Selimpur lane, Dhakuria, Cal-31

১। A quest of peace—N. C. Sen Majumder

N. N. Mukherjee 2. N. N. Mukherjee Road, Bally, Howrah.

১। রস কথ— উমানন্দ ভৈরব
২। জীবনরঙ্গ-দুটি তরঙ্গ— „ „ ২ কপি

৩। ভগবতী-গীতি পুষ্পাঞ্জলী— উমানন্দ ভৈরব ২ কপি
৪। মিলন-মধুর-মন্ত্র— " "
৫। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কীর্তিকাহিনী— " "
৬। মোগল সুন্দরী— " "
৭। ঝরাপালক— " "
৮। রাসলীলা অভরলীলা— " "
৯। ষোড়শী— " "
১০। পঞ্চদশী— " "
১১। বরেণ্যং-শরেণ্যং— " "
১২। সপ্তদশী— " "
১৩। রাস-রসামৃত-সুধা— " "
১৪। শ্রীবেদ এবং শ্রীশ্রী বেদময়ী চণ্ডিকা— " "
১৫। দিনের পর দিন (প্রথম তরঙ্গ)— " "
১৬। দিনের পর দিন (দ্বিতীয় তরঙ্গ)— " "
১৭। বর্ণবোধ ও ভাষাশিক্ষা প্রথম ভাগ— " "
১৮। বেদ প্রকাশ— " "
১৯। অষ্টাদশী— " "
২০। শ্রীনিমাই চরিতামৃত— " "

S. N. Ghosh Director of Census operations 20, British Indian St. Cal-69

১। Census of India, 1891 series-23 : W. B paper I of 1981 suppl. Provisional population totals

দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ৯বি, চণ্ডীবাড়ী স্ট্রীট কলিকাতা-৬

পুঁথি

১। রামায়ণ—২ খানি পুঁথি

আলোচনা

কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর পুঁথি এবং রামপ্রসাদ রায়ের কাল

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮৭ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়ালের আলোচনা পড়লাম। শ্রীযুক্ত কয়াল 'রাম' শব্দের স্থলে ৩ সংখ্যা গ্রহণ করে কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর রচনাকাল স্থির করেছেন ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি যথোচিত সমর্থন, অঙ্কভেদের ক্ষেত্রে, উপস্থাপিতও করেছেন, সেকথাও ঠিক। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর ক্ষেত্রে ঐ রচনাকালই চূড়ান্ত বলে মনে করতে পারছি না। কারণ রাম শব্দদ্বারা এতদঞ্চলে লোকব্যবহারে ব্যাপকভাবে ১ সংখ্যা বোঝায়। এখানকার ব্যাপারীরা দ্রব্যগণনা ইত্যাদির কালে রাম, দুই, তিন, ইত্যাদিক্রমে গণনা করে থাকেন। বিশেষভাবে চিন্তনীয় রামপ্রসাদের পরিবারমণ্ডলে রামের গুরুত্ব। রাম ছিলেন তাঁদের কুলদেবতা। কাজেই রাম বলতে ১ বা প্রথম সংখ্যা বোঝানই তাঁদের দ্বারা সম্ভবপর বলে মনে করি। উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমি একটি ব্যক্তিগত সমীক্ষা করে দেখেছি যে দশজনের মধ্যে অন্ততঃ নয়জন, কোথাও কোথাও দশজনই রাম বলতে শুধু ১ সংখ্যাই বোঝেন। লোকব্যবহারের এই গুরুত্বকে অঙ্কভেদের ক্ষেত্রে লঘু করে দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রথিতযশা পুঁথি-বিশারদ ড. সুকুমার সেনের সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত চণ্ডীমঙ্গলের (মুকুন্দের) রচনাকাল বিষয়ক আলোচনার ২৫ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট পাদটীকার কিছুটা উদ্ধৃত করি :—

"মুকুন্দরামের সময়ে সাধারণ ও পণ্ডিত সমাজে শকাঙ্ক হিসাবে 'রস' ছয় (৬) বুঝাইত। ···'নব রস' ও 'নব রসিক'—আসলে নূতন রস, নূতন রসিক—ছিল। পরে লোকব্যুৎপত্তিগত অর্থ আসিয়া গিয়াছে। 'রামপ্রসাদের রামভক্তির পারিবারিক বাতাবরণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই ব্যাপক লোকব্যুৎপত্তির কারণে রাম অর্থে ১ ধরে কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর রচনাকাল ১৭২১ শক, বা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ (মাঘ মাস সুবাদে) বলে মনে করা সমীচীন বোধ করি।"

এবার রামপ্রসাদের কাল-প্রসঙ্গ। রামপ্রসাদ জগদ্রামী অদ্ভুত রামায়ণের বিস্তার-সাধন যদি শেষ করে থাকেন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে এবং দুর্গাপঞ্চরাত্রির রচনাংশ সমাপ্ত করে থাকেন ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং একক কাব্য কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু যদি সমাপ্ত করে থাকেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, তবে রচনার বিচারে তিনি পুরোপুরি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিই হন। যদি কৃ. সি. এর রচনা-সমাপ্তিকাল ১৮০১-২ ই হয়ে থাকে তাহলেও ঐ কাব্য পরিকল্পিত এবং অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ রচিত হয়ে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাও মানতে হবে। এমতাবস্থায় রামপ্রসাদকে ভক্তি রসের বৈশিষ্ট্যেই শুধু নয়, পরন্তু কালের খাতিরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলাই উচিত। তাছাড়া ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কবির বয়স ২২ হলে তাঁর জন্মকাল ছিল ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাহলে রামপ্রসাদকে বড়জোর আঠারো উনিশ-দুই শতকের কবি বলা যায় (জীবৎকালানুযায়ী, সাহিত্যকর্মানুযায়ী নয়), কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের 'সন্ধিকালের কবি' কোনোমতেই বলা যায় না।

শেষকালে পুঁথি-প্রসঙ্গ। আমি এ পর্যন্ত রামপ্রসাদ রায়ের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর সর্বসমেত ৫ খানি পুঁথির কথা জেনেছি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন লাহার রচনা থেকে একটি পুঁথির কথা জেনেছি। তাঁর লেখাটি সা-প-প, ১৩৮৫, কার্তিক-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত

হয়েছিল। সেটি কয়েকটি পৃষ্ঠামাত্র, পুরো পুঁথির আখ্যাযোগ্য নয়। বাকী চারটি পুঁথি আমি নিজে দেখেছি। এইখানে জানাই যে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমার লেখাটি (৮৭ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) বেরোবার পরে আমি কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর আরেকটি নূতন পুঁথি সংগ্রহ করেছি ভুলুই থেকে। এটি চৈতন্যবন্দনা এবং প্রথম পাতাটি বাদে সম্পূর্ণ। এটির হাতের লেখাও সুন্দর, তবে অক্ষর একটু বড়। তাই পৃষ্ঠা-সংখ্যা বেশী—৪০৫ পৃষ্ঠা। লিখিতং শ্রীবনমালী চট্টোপাধ্যায়, লিখন সমাপ্তিকাল—বাংলা সন—১২৫৭। আমার দেখা ৪ খানি পুঁথির মধ্যে গ্রন্থেয় বসন্তরঞ্জন সংগৃহীত সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত কয়াল উল্লিখিত পুঁথিখানিও আছে। সেই পুঁথি শুধু আদিখণ্ডের এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট পুঁথি, প্রায়শঃ ভুলে ভরা। এক স্থানে লেখক যথাযথ পাদপূরণ করতে পারছেন না বলে নিজেই আশংকা প্রকাশ করেছেন। তাই ঐ পুঁথিটির উল্লেখ করি নি।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিষৎ-সংবাদ

শোক-সংবাদ

পত্রিকার আলোচিত কাল-সীমার মধ্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং শিশু-সাহিত্যিক বিমল ঘোষ (মৌমাছি)র প্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি যথোচিত শোকজ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিশেষ অধিবেশন

(ক) গত ৩রা মাঘ, ১৩৮৮ (১৭ই জানুয়ারি, ১৯৮২) রবিবার পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য প্রয়াত নীহাররঞ্জন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐতিহাসিক ডঃ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক শ্রী দিলীপকুমার বিশ্বাস সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে নীহাররঞ্জনের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁহার 'বাঙালীর ইতিহাস' সর্বপ্রথম বীজাকারে পরিষদ মন্দিরে অধর মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন নীহাররঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক এক পত্র প্রেরণ করেন। সভায় তাহা পঠিত হয়। শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু নীহাররঞ্জন সম্পর্কে দৈনিক উত্তরবঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করনে। পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, নীহাররঞ্জনের মৃত্যুতে একটি যুগের ছেদ ঘটিয়া গেল। সভার সভাপতি আচার্য যদুনাথ সরকারের সঙ্গে নীহাররঞ্জনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। ইতিহাসচর্চায় তিনি নীহাররঞ্জনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেন।

(খ) গত ৩০ ফাল্গুন, ৮৮ পরিষদ মন্দিরে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য। নগেন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী পরেশনাথ ভট্টাচার্য, শিবদাস চক্রবর্তী, নির্মলকান্তি বসু, অখিল নিয়োগী এবং ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ। সভাপতি নগেন্দ্রনাথের সাধনা ও সাহিত্যকীর্তির অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীমৎ অনন্তপ্রকাশ ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথের উপদেশামৃত হইতে পাঠ করিয়া শোনান। সহ-সম্পাদক শ্রী বন্দিরাম চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান।

সম্বর্ধনা

কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অশীতিপর সাহিত্যিক শ্রী বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার নিউ আলিপুরস্থ বাসভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পরিষদের নবইতম প্রতিষ্ঠাদিবসে (৮ই শ্রাবণ ১৩৮৯) পরিষদভবনে অন্যান্য অশীতিপর সাহিত্যিকগণকে সম্বর্ধনাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সাংগঠনিক সংবাদ

(ক) পরিষদের বিভিন্নপ্রকার উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিয়া আবেদন করা হইয়াছে।

(খ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম শতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

(গ) ফাল্গুন মাসের মাসিক সভায় কার্যনির্বাহক সমিতি ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সতের জন কর্মাধ্যক্ষের নাম সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত করিয়াছেন।

উক্ত সভায় বিশিষ্ট সদস্যপদে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীরাধারমণ মিত্রের নাম সাধারণ সদস্যদের অনুমোদনের জন্য গৃহীত হইয়াছে। পরিষদে মোট ১৫ জন বিশিষ্ট সদস্য হইতে পারেন। প্রস্তাবিত চারিজনকে লইয়া পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য হইবেন পনের জন।

(ঘ) কাগজ ও মুদ্রণের ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় পরিষৎ পত্রিকার বিক্রয়মূল্য তিন টাকার স্থলে চার টাকা করিবার সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ' ৮৮ বঙ্গাব্দের ২য় মাসিক অধিবেশনে ৮৯ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট পরীক্ষক হিসাবে ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, ডঃ বিষ্ণু বসু, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দত্ত নির্বাচিত হইয়াছেন।

শাখা-সংবাদ— মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন।

গত ১৩ এবং ১৪ই চৈত্র, ১৩৮৮ শনি ও রবিবার মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখার ৭০ তম বার্ষিক অধিবেশন, সাহিত্য সম্মেলন ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, মূল অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট বাগ্মী ও পণ্ডিত শ্রী মনোজচন্দ্র সর্বাধিকারী এবং সাহিত্য সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন মাইতি। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন যথাক্রমে কবি ডঃ সুধীর বেরা ও বেতারশিল্পী শ্রীমতী গীতা মাইতি।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন এবং দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথম প্রস্তাবে পরিষদের মুখপত্র 'মাধবী'র প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যার একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় অনুরোধ এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'আড়রাগড়ে' কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী'র একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণের অনুরোধ জানান। তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দে তাঁহার স্বাগত ভাষণে ঐতিহ্যমণ্ডিত মেদিনীপুর জেলার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক শ্রী গৌরীশংকর দাস বর্ষবিবরণী প্রদান করেন। তাহাতে জানা যায় মেদিনীপুর শাখার সাধারণ, আজীবন ইত্যাদি সদস্য সংখ্যা ৩০০, গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা (বাংলা ও ইংরাজী) মোট ১০,৫০০ ; বাংলা পুঁথির সংখ্যা-২০০, সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা-৬০০। প্রত্নতত্ত্বশালা বিভাগে শতবৎসরের অধিক পুরাতন প্রত্ন সামগ্রীর সংখ্যা-৩০, বিশেষতঃ রাজা শশাংকের আমলের ২টি তাম্রশাসন সুরক্ষিত আছে।

২৯ জন কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্যকে লইয়া ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস।

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশের

ন্যায়-পরিচয়

পরিষৎ সংস্করণ কেন্দ্রীয় সরকারের
অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইল।
সুলভ মূল্য : পনের টাকা

সাহিত্যসাধক চরিতমালা
প্রথম—দ্বাদশ খণ্ড একত্রে ১৮০'০০

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত
স্বপ্ন

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই

মূল্য : পনের টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : চার টাকা